টুনি মেম

সৈয়দ মুজতবা আলী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ
—সাড়ে সাত টাকা—

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত
মুদ্রন—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমতী ডাক্তার শ্রীলা ঘোষের

করকমলে—

সূচী

॥ টুনি মেম ॥

টুনি মেম

টুনি মেম

বেশী দিনের কথা নয়, হালের। পড়িমড়ি হয়ে শেয়ালদায় আসাম লিঙ্কে উঠেছি। বোলপুরে নাববো। কামরা ফাঁকা। এককোণে গলকম্বল মানমুনিয়া দাড়িওলা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক মাত্র। তিনি আমার দিকে আড়নয়নে তাকান, আম্মো।

এক সঙ্গেই একে অন্যকে চিনতে পারলুম।

আমি বললুম 'খান না রে?'

সে হাঁকলে 'মিতু না রে?'

যুগপৎ উল্লম্ফন, ঘনঘন আলিঙ্গন। পাঠশালে পাশাপাশি বসতুম। তারপর এই তিরিশটি বচ্ছর পরে দেখা। প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই এ-রকম বদ্খদ দাড়ি—দাড়া রেখেছিস কেন?'

খানটা ঐ পাঠশালার যুগেও ছিল হাড়ে টক শয়তান। প্রশ্ন শুধোলে ইহুদিদের মত পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যায়। শুধালে 'দাড়া কারে কয়?'

'হাঁড়ি বড় সাইজের হলে হাঁড়া হয়, গাড়ি গাড়া। দাড়ি হিন্দী উর্দুতে স্ত্রীলিঙ্গ!—কিন্তু দাড়া পুংলিঙ্গ। তোরটা দাড়ি নয়, দাড়া।'

অবশ্য অস্বীকার করিনে, তাঁকে দেখাচ্ছিল গত শতাব্দীর ফরাসী খানদানীদের মত। খানের রং প্যাটপেটে ফর্সা। গায়ে প্রচুর পাঠার রক্ত। শুধালুম, 'তা তোর পাকিস্তান ছেড়ে এই না-পাক্ দেশে এসেছিস কি করতে?'

'আজমীরের খাজা মুঈন উদ্-দীন চিশতীর কাছে মানত করেছিলুম, বাবার আশীর্বাদে আল্লা যদি আমাকে এস্ পি তে প্রোমশন করেন তবে বাবার দরগা-দর্শনে যাবো, ভালো-মন্দ যা আছে তাই দিয়ে

শীর্ণী চড়াবো। সেই সেরে ফিরছি। এই নে প্রসাদী-গোলাপের পাপড়ি।'

আমি মাথায় ছুঁয়ে বললুম, 'ও! তুই বুঝি পুলিসে ঢুকেছিলি?'

বললে, 'হ্যাঁ সাব-ইন্‌সপেকটর হয়ে।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'বলিস কিরে? আর এরই মধ্যে এস্ পি!'

প্রসাদীর পাপড়ি মাথায় ঠেকিয়ে বললে 'খাজা মুঈন উদ্-দীন চিশতীর দোওয়া আর হিন্দুদের কৃপায়।'

'হিন্দুদের কৃপায়!'

'হ্যাঁ, ভাই, তেনাদেরই কেরপায়। তেনারা যদি পূব বাঙলার পুলিসের ডাঙর ডাঙর নোকরি ছেড়ে ঝেঁটিয়ে পশ্চিম বাঙলা আর আসামে না চলে যেতেন তা হলে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় প্রোমশন পেতুম কি করে? তারা থাকলে হয়তো অবিচার করে আমাকে দু'একটা না-হক প্রমোশন দিত, কিন্তু একদম দিনকে রাত, রাতকে দিন তো করা যায় না। আর তুই তো বিশ্বাস করবিনে—তুই চিরকালই সন্দেহ-পিচাশ, যে কটি হিন্দু রয়ে গেল তারা গণ্ডায় গণ্ডায় না হোক জোড়ায় জোড়ায় প্রোমশন পেয়েছে। জানিস, মণ্ডল সিভিল সার্জন হয়েছে?'

আমি ভিরমি যাই আর কি। গাড়ল ফোঁড়াটি পর্যন্ত কাটতে জানতো না।

খান বললে, 'সবতো শুনলি। তোর বইও আমি দু'চার খানা পড়েছি। আচ্ছা বলতো, এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখিস, না কিছু কিছু দেখা-শোনার জিনিস, অভিজ্ঞতার বস্তু?'

'কিছুটা বানিয়ে, কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে।'

'তাজ্জব! আমি তো ভাই বিস্তর খুন-খারাবী দেখলুম। এক একটা এমন যে, আস্ত একখানা উপন্যাস হয়। কিন্তু তারই রিপোর্ট লিখতে গেলে আমার তালুর জল আর নিবের কালি শুকিয়ে যায়। কি করে যে তুই লিখিস!'

আমি বললুম, 'আমাকেও যদি শুদ্ধমাত্র ফ্যাক্টের ভিতর নিজকে সীমাবদ্ধ করে লিখতে হত তা হলে আমার রিপোর্টটা হ'ত তোর চেয়েও ওঁচা। কল্পনা এসে উৎপাত করতো। তা সে কথা যাক্‌গে। আমার দিনকাল বড্ডই খারাপ যাচ্ছে—প্লটের অপর্যাপ্ত অনটন। সম্পাদক মিশ্রা আবার গল্পই চান, 'ইলসট্রেট' করবেন। বল না একটা।'

দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে বললে, 'কোনটা বলি। কেসগুলো তো মাথার ভিতর আব-জাব করছে। আচ্ছা দাঁড়া, ভেবেনি।'

এমন সময় সিগনেল অভাবে ট্রেন খামোকা মাঝপথে দাঁড়ালো। খান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এরা কি জাত রে।'

তাকিয়ে দেখি, মিশকালো সাঁওতাল মেয়ে—তার উপর মেখেছে প্রচুর তেল। শাড়ির উপর বেঁধেছে গামছা, উত্তমাঙ্গে চোলিফোলি কিছু নেই, নিটোল দেহ, সুডোল—ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষেরটা বোঝা গেল পরিষ্কার, কারণ, হাত দুটি যতদূর সম্ভব উঁচু করে পলাশ ফুল পাড়বার চেষ্টা করছিল খোঁপায় গুঁজবে বলে। হলদে পলাশ। এ অঞ্চলে লালের তুলনায় ঢের কম। কি জানি, মেয়েটা হয়তো ভেবেছে, লাল কালোর চাইতে হলদে কালোর কনট্রাস্টে খোলতাই বেশী।

বললুম, 'সাঁওতাল। হ্যাঁ, আমাদের দেশে অতদূর ওরা পৌঁছয়নি। কিংবা হয়তো ছিল এককালে। কাল যে-রকম হিন্দু পূব বাঙলা ছেড়ে চলে এল, এরা হয়তো পরশু।'

খান দেখি, আমার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না। আপন মনে কি যেন ভাবছে। ওস্তাদ গাওয়াইয়া যে রকম গান শুরু করার পূর্বে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে যান। তখন বিরক্ত করতে নেই।

গাড়ি ছাড়লো। একটু কাছে এসে বললে, 'ঐ কালো মেয়ে আরেকটি মেয়ের কথা আমার স্মরণে এনে দিল। তার রঙ ছিল এর

চেয়েও কালো। কিন্তু সে কী কালো! সব রঙের অভাবে নাকি কালো হয়। হ্যাঁ তাই; কোন রঙই সাহস করে তার শরীর চড়াও করতে পারেনি। আমি তাকে দেখেছিলুম তার শারীরিক মানসিক চরম দুরবস্থায়। তবু চোখ ফেরাতে পারিনি। হিন্দুরা কেন যে "কালী" "কালী" করে তখন বুঝতে পেরেছিলুম।

'টুনি মেম।'

গাড়ি বর্ধমানে এসে থামলো। বর্ধমানে আমি গত সাত বছর ধরে অর্ডার দিয়ে কখনো কেলনারের কাছ থেকে চা-আণ্ডা পাইনি। কাজেই ফর সেফ্ টিস্ সেক প্রথমই ভাঁড়ের চা কিনে রাখলুম। বিস্তর ছুটোছুটি করে কিছু-কিঞ্চিতের জোগাড় হল। স্থির করলুম, বোলপুরে খানকে একটা পুরা-পাক্কা খানা তুলে দেব। সেখানকার গোঁসাই আমাকে নেক-নজরে দেখে।

গাড়ি ছাড়তে খান বললে,

'আমি তখন আক্রুগড়ে। এস্ আই—আমরা বাঙলায় লিখি এছাই। রোজ থানায় বসে ভাবি, ইয়া আল্লা, চাকরির এ দুস্তর দরিয়া পেরিয়ে কবে গিয়ে এমন মোকামে পৌঁছব যেখানে হরহামেশা পয়সাটা আধলাটার হিসেব না করতে হয়। ঘুষ খেতে তখনও শিখিনি—'

আমি শুধালুম, 'এখন শিখেছিস? তা—'

বললে, 'হ্যাঁ তবে সে অন্য ধরনের। পরে তোকে বুঝিয়ে বলবো।

আক্রুগড় বড় মনোরম জায়গা। অনেকটা শিলঙের মত উঁচু-নিচুতে ভর্তি, টিলাটালার টক্কর। কোন্ এক সায়েব নাকি মালয় না কোথা থেকে কৃষ্ণচূড়া এনে এখানে পুঁতে দেয়। এখন শহরটা আগাপাস্তলা তাই দিয়ে ভর্তি। শহরটা এমনিতেই সবুজ, তার উপর এল গোলমো'রের কালো সবুজ আর তার মাঝখানে ফুটে ওঠে বাড়িগুলোর পোড়া লালের টাইলের ছাদ।

চতুর্দিকে অজস্র চা-বাগান আর তেলের খনি। সাহেব-সুবো, বেহারী মারওয়াড়ীতে শহরটা গিসগিস করছে। আর খাস আসামীদের তো কথাই নেই—তারা বড় নম্র, বড় সরল। আক্রুগড়ের বটতলাতে চার আনা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী পাওয়া যেত না—আমাদের দেশে আকছারই যা যায়। এখন কি অবস্থা তা অবশ্য জানিনে।

বড় কর্তা বলেছিলেন, কিছু একটা জবরদস্ত নূতন না করতে পারলে কুইক প্রোমশন হয় না। জবরদস্ত নূতন করবোটাই বা কি? এখানে খুন-খারাবী হয় অত্যল্প। উঠোনই নেই, তো আমি নাচি কি করে।

তাই থানায় বসে বসে পুরনো দিনের খাতাপত্র দেখি, ফাইল পড়ি। সেইটেই একদিন লেগে গেল কাজে। পরে বলছি।

আমার চেনা এক রাজমিস্ত্রি আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একদিন বললে, মোল্লাবাজারের পিছনে উঁচু টিলার উপর যে খালি বাঙলো আছে তার বাবুর্চীখানার ভিত মেরামত করতে গিয়ে সে একটা লাশ আবিষ্কার করেছে—ঠিক লাশ নয়, কঙ্কালই বলা যেতে পারে—পচাছেঁড়া কম্বলে জড়ানো।

রক্তের সন্ধান পেয়ে বললুম, 'তুমি ওখানে যাও। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছ এই ভাব করে আমাকে খবর পাঠাও।'

তা না হলে পরে প্রমাণ করতে হবে, ওটা সত্যই সেখানে ছিল, বাইরের থেকে এনে কেউ চাপায় নি।

'জিনিসটা যে খারাবী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবুর্চীখানার নিচে কম্বলে জড়ানো পোতা কঙ্কাল! এখানে কস্মিনকালেও কোনো গোরস্তান ছিল না—টিলার ঢালুর দিকে কতটুকু জায়গা যে, ওখানে মানুষ গোরস্তান বানাতে যাবে। তা হলে এটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপার। শুধু খারাবী নয়, খুন-খারাবী।'

আমি বললুম, 'সাক্ষাৎ শার্লক হোমস।'

শুধোলে, 'সে আবার কে?'

আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি এগোও ; আমি আর রসভঙ্গ করবো না।'

বললে, 'প্রথম রক্তের সন্ধান পেয়ে আমি যেন হন্যে হয়ে উঠলুম। সমস্ত রাত ঘুম হল না। মাথার ভিতর ঘুরছে, কত রকম নর-হত্যার ছবি, যেন স্বয়ং পাঁচকড়ি দে সেগুলো এঁকে যাচ্ছেন, আর দীনেন্দ্র কুমার রায় আপন হাতে রঙ গুলে দিচ্ছেন। বেবাক লালে লাল।'

আমি বললুম, 'রসভঙ্গ করতে হল। অপরাধ নিসনি। হোমস হল বিলিতী অরিন্দম।'

খান বললে, 'তাই বল। কিন্তু তুই ভাবিসনে, তোকে একটা রগরগে খুনের কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা। বড় বিষাদ বেদনা। স্বর্গ আমি দেখিনি, কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি। সে-দৃশ্য আর কারো দেখবার দরকার নেই।

কি বলছিলুম, ? হ্যাঁ। ভোর হতে-না-হতেই আমি থানায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মূর্খের মত আমি রাজমিস্ত্রীকে বলে রাখিনি, সে কখন আসবে। সে যদি এসে ফিরে যায় ; কিংবা কেসটা হাতছাড়া হয়ে যায়।

আজ হাসি পায়। রাত দুপুরে এখন যদি জমাদার এসে খবর দেয়, পদ্মার চরে ডাকাতিতে পাঁচটা চরুয়া আর তিনটে ডাকাত মারা গিয়েছে, আমি তা হলে পাশবালিশ জাবড়ে ধরে বলি, "যা-যা, দিক্ করিসনি !"

রাজমিস্ত্রী হেলে দুলে বেলা প্রায় বারোটায় এলেন—আমাকে আষ্ট ঘণ্টা দগ্ধানোর পর।

যেন সদ্য এইমাত্র ফার্স্ট ইনফর্মেশন পেয়েছি, এরকমধারা মুখের ভাব করে দুটি 'কষ্টস্বল' সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলুম। গিয়ে দেখি অত্যন্ত কুস্থান, অর্থাৎ অকুস্থানই বটে।'

আমি বললুম, 'ঐ ম'লো। অকুস্থান হয়েছে আরবী 'ওয়াকেয়া', অর্থাৎ 'ঘটনা' আর 'স্থান' নিয়ে।'

খান বললে, 'থাক্ থাক্ আর বিত্তে ফলাতে হবে না। অকুস্থলের হালটা ভালো করে শোন।

তিন বছর ধরে বাঙলোটায় বসতি ছিল না বলে বাবুর্চীখানার দোর-জানলা চুরি গিয়েছে, ঘরটা পড়ো-পড়ো। কে এক নূতন সাহেব আসবে বলে ওটার ভিত মেরামত করতে গিয়ে বেরিয়েছে একটা কঙ্কাল, পচা কম্বলে জড়ানো। মাথার চুল ছাড়া আর সব পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি নয়া শিকারীর মত সন্তর্পণে এগলুম বলে খুলির ভিতর মাটির মধ্যে পেয়ে গেলুম একটা বুলেট—তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খুলির পিছনের দিকে একটা ঐ সাইজের গর্ত।

আক্রুগড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় স্পেশ্যালিস্ট নেই যে, আমায় তদ্দণ্ডেই বাৎলে দেবে, ব্যাপারটা কি, অন্তত এই যে কঙ্কাল, এর লাশটা কবে মাটিতে পোতা হয়েছিল। শহরের অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন আমাদেরই জেলার ধীরেন সেন। তাঁকে ধরে এনে শুধালুম। বললেন, অন্তত তিন বছর। বিচক্ষণ লোক। রায়টা দিলেন কঙ্কাল উপেক্ষা করে, কম্বলটা উত্তমরূপে পরখ করে।

তা হলে প্রশ্ন, তিন বছর পূর্বে ঐ বাঙ্গলোয় থাকতো কে—যার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল ?

খবর পাওয়া গেল, আইরিশম্যান পেট্রিক ও'হারা সাহেব। সে এখন কোথায় ? জেলে। কেন ? সে-কথা জেনে কি পুলি-পিঠের নেজ গজাবে

আমার মন খনে এদিকে ধায়, খনে ওদিকে ধায়। বন্ধ ঘরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন মতিচ্ছন্ন হয়ে খনে এ-দরজায়, খনে ও-জানালায় ধাক্কা দেয়—কোনো একটাও ভালো করে একাগ্রমনে খোলবার চেষ্টা করে না—আমার হ'ল তাই। কোনো

একটা ক্লু. পাঁচ মিনিটের তরেও ঠিকমত ফলো আপ করতে পারিনে।

এখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে ঢের। এখন বুদ্ধি হয়েছে বলে বুঝেছি যে, এসব রহস্য সমাধান বুদ্ধির কর্ম নয়। রুটিনের ঘানিতে সব-কিছু ফেলে দিতে হয়। তেল বেরিয়ে আসবেই আসবে, সমস্যা সমাধান হবেই হবে।

যে-কাজ আজ পাঁচ মিনিটে করতে পারি, তখন লেগেছিল এক হপ্তা। ততদিনে প্রশ্নগুলো মোটামুটি সামনে খাড়া করে নিয়েছি ঃ

(১) লোকটা কে ?

(২) এটা খুন তো ?

(৩) কে খুন করলে ?

(৪) কার বন্দুকের গুলি ?

কঙ্কাল থেকে মানুষ সনাক্ত অসম্ভব না হলেও বড়ই কঠিন। তন্ন তন্ন করেও আঙটি-টাঙটি, বাঁধানো দাঁত, ডেন্টিস্টের কোনো প্রকারের কেরদানী কিছুই পাওয়া গেল না। ব্লাঙ্কো।

আমি তো এ-শহরে এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল, কিন্তু পুরনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানে, কিন্তু অহমিয়ারা সরল হলেও এ-তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানে যে, পুলিসের ঝামেলাতে খোদার খামোখা জড়িয়ে পড়তে নেই। ব্লাঙ্কো।

'ইতিমধ্যে রিপোর্ট পৌঁছল, খুলির ভিতর যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুলেটই খুলির ফুটোটার জন্য দায়ী।'

আমি বাঁকা হাসি হেসে বললুম, 'মারাত্মক আবিষ্কার! এ তো কানাও বলতে পারে। আর ঐ দেখ, তোর কৃষ্ণসুন্দরী আর একপাল সাঁওতালী। ওদের বসতির দিকে এগোচ্ছি এখন।'

গাড়ি তখন খানা জংশনে 'লুপ্ত' লাইনে ঢুকবে বলে ধীরে ধীরে চলছিল।

খান অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'নাঃ, টুনি মেমের পায়ের নখের কণাও এরা হতে পারে না।'

আমার অভিমান হল। সাঁওতালী আমার প্রতিবেশী মেয়ে।

লক্ষ্য না করেই খান বললে, 'বুলেটে যে খুলি ফুটো করেছে, সে তো তুই বুঝিস, আমিও বুঝি, কিন্তু আদালত কি বুঝবে? তারা প্রমাণ চায়। হুঁঃ, আদালত তো আদালত। অডিটের বেলা জানো না কি হয়? পেনসন্ নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, 'কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কি? না হলে যে মার্চ মাসের পেনসন্টা পাবেন না।'

আমি বললুম, 'সেটা কিন্তু ঠিক। দিল্লির যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বিদেশী ভিজিটরকে ছোট্ট একটি শিশুর খুলি দেখিয়ে বললেন, "ইটি শঙ্করাচার্যের খুলি।" ভিজিটর অবাক হয়ে শুধালে, "তাঁর খুলি এত ছোট ছিল?" মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এটা তাঁর শিশু বয়সের খুলি।" দু'টো কিংবা ছ'টা খুলি যখন হতে পারে, তখন দু'টো কিংবা ছ'টা জীবন হবে না কেন? তা হলে একটা মার্চ মাসে গ্যাপ পড়াটাই বা বিচিত্র কি? ওসব কথা থাক্; "তারপর কি হল বল্।"

'তখন অনুসন্ধান করতে লাগলুম খুনটা হয়েছে ও'হারা সাহেব এই বাঙলোয় থাকাকালীন, না তার পরে কেউ খুন করে লোকটাকে নির্জন পোড়ো বাড়িতে পুঁতে গেছে?

ও'হারা জেলে। দীর্ঘ মেয়াদে।

থানার পুরনো ফাইল কাগজপত্র ঘেঁটে যা আবিষ্কার করলুম, সেও বিচিত্র। সাহেব ছটা ইংরেজ পরিবারকে চকোলেটের ভিতর বিষ ঠেসে তাই খাইয়ে মারবার চেষ্টা করছিল। প্রমাণের অভাব হয়নি। আক্রুগড় থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের এক ছোট্ট ডাকঘর

থেকে ও'হারা পাঠিয়েছিল ছটি রেজেস্ট্রি পার্শেল ছ'জন ইংরেজের নামে—পোস্ট মাস্টার সেই মর্মে সাক্ষী দিয়েছিল।

এ'দের দুজন থাকতো আক্রুগড়ে, বাকিরা কাছেপিঠের চা-বাগানে। একই সঙ্গে একই জিনিস খেয়ে সবাই মরমর হয়েছিল বলে সিভিল সার্জন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে যে, চকোলেটের মধ্যে গড়বড় সড়বড় আছে। তাই তারা সে-যাত্রা রক্ষা পায়। কেউ মরেনি।

কিন্তু ছ'টা কেন, একটা পরিবার—একটা পরিবারই বা কেন—একজন লোককেও খুন করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শ্রীঘর। ও'হারা আলীপুর।

ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে, 'এদেশের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনো মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুক্ষ শুষ্ক একটা কঠোর সৌন্দর্য আছে। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ কি যেন বলছিলুম। মনে পড়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নূতন বুদ্ধির উদয় হল। ও'হারা যখন আইরিশম্যান তখন তার বন্দুক থাকাটা অসম্ভব নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, ছিল। আমি জানতুম কারো দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলে তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞেরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেট পাওয়া গেছে, সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হয়েছে।

যাক্। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুয্যে একবার জর্নালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা কওয়ার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনো জ্ঞান যে-কোনো খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, কোনো না কোনো দিন জর্নালিজমের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিসের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাসুন্দি ঘাঁটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একখানা খাতাতে লেখা থাকে কে কবে নিরুদ্দেশ হ'ল—অবশ্য যদি আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—কত লোক কত রকমে 'কপ্পুর' হয়ে যায়, কেবা রাখে তার খবর। তবু মনে পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কঙ্কালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কম্বলে, এ-ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার।

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জোর অনুসন্ধান চালালুম। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশ কথা পাশ কথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শুধোই, সেই বিহারী রামভজনের কি হল?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরো কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস :—

রামভজনের বউ টুনি মেম—'

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, 'বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে?'

খান বললে 'সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ও'হারা সাহেবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সায়েবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় 'টুনি মেম'।

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে; যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারো বাড়া আরেকটা কারণ ছিল। সামনাসামনি না হোক আড়ালে আবড়ালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্কিরি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে রামভজনকে বাদ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনকে ও'হারার বাংলোয় গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শুধালুম, 'তারপর?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, 'ব্লাঙ্কো। মাস তিনেক পর যখন রামভজনের পরিচিত নূতন মজুররা আক্রুগড়ে এল—ওরা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছে যাচ্ছে হামেশাই—তখন তারা বললে, রামভজন আদপেই দেশে পৌঁছয়নি। আক্রুগড়ের কেউ বললে, টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিতিবিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বললে দার্জিলিং না কোথায় যেন চা বাগানে কাজ নিয়েছে।'

'আর টুনি মেম?'

'সে তখন ও'হারার রক্ষিতা। কিন্তু 'রক্ষিতা' বললে হয়তো ও'হারা ও টুনি মেম দুইজনারই প্রতি অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনি মেমকে রেখেছিল রাণীর সন্মান দিয়ে আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালোবেসেছিল লায়লী যে-রকম মজনূনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ও'হারার বাংলোয় নিয়ে যায়। শীতকাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তার পর যে-কোনো কারণেই হোক ও'হারা তাকে গুলি করে মেরে বাবুর্চিখানার ভিতের ভিতর পুঁতে ফেলে। যে-লোক ছ'টা পরিবারকে খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধূলো-খেলা।

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারী রূপে চায়ের দোকানে যে সব চেয়ে বেশী ওকীবহাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে বললে কসম খেয়ে কোন কিছু তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই, ও'হারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায় ?

খবর পেলুম ও'হারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দুরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোন পথ না পেয়ে ও'হারা সায়েবের বাবুর্চির সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবারে সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পাঁচিল খাড়া হল। বহু অনুসন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়।

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সাহেবদের এই যে বাবুর্চি ক্লাসের লোক এরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং পাডিং রোস্টো-মোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রাঁধে, শুয়ার গোরুর ঘ্যাঁট এরা যেসব বানায় সেগুলো দূর থেকে দেখেই শেষ-বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খায় কোন্ বঙ্গ সন্তানের সাধ্যি। অতএব এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ও'হারার বাবুর্চি নিশ্চয়ই অন্য কোন সায়েবের চাকরি নিয়েছে।

তোকে পূর্বেই বলেছি, আক্রুগড়ের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান আব-জাব করছে। আমি প্রতি উইক-এণ্ডে আজ এটা কাল সেটায় তদন্ত করতে লাগলুম। পরনে খানসামা বাবুর্চির পোশাক। সবাইকে শুধোই, বাবুর্চির চাকুরি কোথাও খালি আছে কি না। আরো শুধোই, আমার এক ভাই নাম ভাঁড়িয়ে এক কুলী রমণীর সঙ্গে বসবাস করছে—আসল কারণ অবশ্য আমি ও'হারার খানসামাটার নাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি—আমাদের মা তার জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে,—তার খবর কেউ জানে কি না ?

বাগানের পর বাগান ব্লাঙ্কো ড্র করেই যাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী, আর মুর্শীদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল।

এক চা-বাগিচার কম্পাউণ্ডার শুধু যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, 'ও! টুনি মেম! দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সুখেই না আছেন।' আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম, ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে। সেখানে গিয়ে শুনি, বাবুর্চি পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলী লাইনের একটা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

পড়ি পড়ি এই পড়ি ত্রিভঙ্গ মুরারী-গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর। ঝাপের তৈরী দরজাখানা পাশের মাটিতে পচচ্ছে।

ভিতরের দৃশ্য আরো মারাত্মক। স্যাঁতসেঁতে নয়, রীতিমত ভেজা মাটির ভিত। হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত। আল্লার মালুম গর্তে সাপ না ইঁদুর আছে। এক কোণে একটা ভাঙা উনুন। কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না। তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'একটা ভাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে। তারই পাশে মলমূত্র। নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম ম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাড্ডিসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধুঁকচ্ছে। ছেলেটি কিন্তু তবুও যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। কেউ না বললেও আমি চট্ করে বলে দিতে পারতুম ইটি ও'হারার সন্তান। শুনেছি স্বর্গের দেব শিশুরা অমর, কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা এরকমই দেখাতো।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একবারের তরে চোখও খুলল না। সে শক্তিটুকুও তার গেছে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, 'বহু বৎসর পুলিসে কাজ করে করে আমি এখন সঙ্গ-দিল—পাষাণ হৃদয়। তখন সবে পুলিসে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।

সে আরো নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের সায়া ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙরানো—থেকে থেকে হঠাৎ অনাহারের দুর্বলতা যেন তার গলা চেপে ধরছে আর কক্ করে গোঙরানো বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরো বীভৎস।

চ্যাটাইয়ের উপরে শুয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতছিন্ন বুক ঢেকে একখানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে—চোখ বন্ধ করে কি জানি, কি জানি জীবন-মরণ অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পুলিসের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কণ্ঠরোধ করে পুলিসের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পুলিস। ও'হারার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম, "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে?"

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমরা সিলেটিরা যদি কুলী রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানকি-নটীর বেলেল্লাপনা, কুলী-রমণীকে স্ত্রীর সম্মান সেও দেয় না, আর পাঁচজনের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরও বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখে মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, "কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই। আচ্ছা আমার খবর নিসনে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কেঁদে কেঁদে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না। এদিকে আবার বউ বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।"

আমার চেঁচামেচি শুনে কুঁড়ে ঘরের সামনে এক পাল কুলী মেয়েমদ্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দোরে দাঁড়িয়ে বললুম, "তোমাদের মধ্যে কেউ রাজী আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফসুৎরো করতে, আর বেচারী বউটার সেবা-টেবা করতে? এখ্খুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরো দু'টাকা হাঁড়ি কুড়ি চাল ডালের জন্য।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে "মুন্নি, মুন্নি!"

মুন্নি এগিয়ে এল। পুরনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পারলুম, এই গরীব বিধবা একমাত্র মুন্নিই যতখানি পারে টুনি মেমেদের দেখ-ভাল্ করেছে। সেও নিঃস্বম্বল, কীই বা করতে পেরেছে। কিন্তু জানিস, মিতু, দুর্দিনে দুটি দরদের কথাই বলে কটা লোক!

আর জানিস্, সেই মুন্নি আমাকে মৃদুকণ্ঠে কি বললে? বললে, "আমাকে মাইনে দিতে হবে না সাহেব। ওদের জন্যে যা রান্না করবো তার থেকে দু'মুঠো আমাকে খেতে দিলেই হবে।"

এর পরও যে খুদাতালায় বিশ্বাস করে না তাকে চড় মারতে ইচ্ছে করে।

মুন্নিকে বললুম, "এই নাও আট আনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মুড়ি-মুড়কি যা পাও নিয়ে এসো।"

চায়ের কথা বললুম না। ঐ একটি মাত্র জিনিস চা-বাগানে ফ্রী। বিস্তর কুলী বিন্ দুধ-চিনি স্রেফমাত্র চায়ের লিকার খেয়ে ক্ষিদে মারে।

পাঁচজন সাধারণ মানুষের স্বভাব, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে

এসে সাহায্য না করার, কিন্তু তখন যদি এরই একজন বুকে হিম্মত বেঁধে সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

একজন ইতিমধ্যে বসবার জন্য আমাকে একটা মোড়া এনে দিয়েছে। আমি বল্লুম, "আমি একটা চারপাই কিনতে চাই। কেউ বেচবে?"

চারপাই বলতে না বলতে এসে গেল। ভিজে ভিত থেকে উদ্ধার পেয়েও কিন্তু টুনি মেমের মুখের ভাব বদলালো না।

তোকে বলেছি- হার্ড-বয়েল্ড্ পুলিসম্যান আমি তখনো হইনি, এমন কি অতিশয় সফ্ট্ বয়েল্ড্ও না, তাই এই পুলিসের ভণ্ডামি করতে আমার বাধো বাধো—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এইবারে তুই আরম্ভ করলি সত্যি সত্যি মিথ্যে ভণ্ডামি। ভুলে গেছিস নাকি, ইস্কুলে আসবার সময় কাঁধে করে মা-হারা একটা কাঠবেড়ালিকে সঙ্গে নিয়ে আসতিস? মাস্টারমশাই সেটার জন্য চোটপাট করাতে 'গফ্ট্' ইস্কুল ছেড়ে নবাবী তালাবের ওপারে 'রাজার ইস্কুলে' ট্রেনস্ফার নিলি?'

খান যেন আদৌ শুনতে পায়নি। বললে, 'আসন্নাপ্রসবা রমণী পুরুষের চিত্তহারিণী হয় না। কিন্তু তোকে কি বলবো, মিতু, ওরকম সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

অনাদর, অবহেলা এবং সর্বোপরি অনাহার তাকে ম্লান করে দিয়েছে সত্য কিন্তু খাঁটি সোনার উপরকার ময়লা কতক্ষণ থাকবে। একে দুদিন খেতে দিলে দুটি মিষ্টি কথা বললে এ তো চোখের সামনে কদম গাছের মত বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ফুল ফোটাবে। এই তো এখ্খুনি যখন মুড়ি এল আর ছেলেটি এই প্রথমবার প্রসন্ন নয়নে তার দিকে তাকালো তখন তার মায়ের সৌন্দর্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো।

গয়ার কালোপাথরে কোঁদা মূর্তিটি যেন টুনি মেম। হিন্দুদের যে

সুন্দর সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি আছে সেগুলো সুন্দর আমি জানি, কিন্তু কালো বলে আমার মন কখনো সাড়া দেয়নি। টুনি মেমকে দেখে বুঝলুম, মরা কাল পাথর জ্যান্ত টুনির রঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কী মারই না খেয়েছে।

আমি তো তেমন ফর্সা নই, আমিই মজেছিলুম টুনির রঙ দেখে। আর ও'হারা তো আইরিশম্যান। সে যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। গৌরী শ্রীরাধা কেন কৃষ্ণে লীন হয়েছিলেন টুনি মেমকে দেখে বুঝতে পারলুম। তা সে যাক্‌গে, তোকে আর কি বোঝাব? দেখাবার হলে দেখাতাম। ঐ একটি মেয়ে এ-রঙ নিয়ে জন্মেছিল। তার আগেও না, পরেও না।

ইতি মধ্যে মুন্নি খিচুড়ি চড়িয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা টেমি টিম টিম করে জ্বলছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলুম।

বাগানের ছোটবাবু মুসলমান। তাঁকে সার্টিফিকেট দেখবার ছল করে আমার পুলিসের পরিচয় দিলুম। খাওয়া-দাওয়া করলুম কিন্তু তাঁর বাবুর্চির সঙ্গে, পাছে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রাত ন'টার সময় টুনি মেমের ঘরে ফিরে দেখি মুন্নি তাকে আরো চারটি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে বললে, "ক'দিন ধরে কিছুই জোটেনি, সাহেব; আজ হঠাৎ খাবেই বা কি করে। তবু বলছি, পেটের বাচ্চার জন্য দুটি খেতে।"

টুনির পরনে শাড়ি। সেদিকে তাকাতে মুন্নি বললে, "আট আনা পয়সা দিয়ে মুদীর দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।" আমি বল্লুম "খুব ভালো করেছ।"

মুন্নি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চেটাইয়ের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। টুনি সেই আগের মত শুয়ে আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর।

আমি উঠি-উঠি করছি এমন সময় টুনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে বললে, "আপনি সব কিছু জানতে চান—না ?"

আমি হকচকিয়ে উঠলুম। কিন্তু তার পরের কথাতেই আশ্বস্ত হলুম। বললে, "কি করে এ-অবস্থায় পৌঁছলুম ?"

খান বললে, উত্তেজনা ঔৎসুক্যে আমি তখন অর্ধমৃত। "না, না, না, তোমার এখন শরীর দুর্বল তুমি—" ঐ ধরনের কিছু একটা বলা-না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।

টুনি বললে, "আমি আপনাদের ভাষায় কুলী। আপনারা আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করেন না, অথচ জানেন, আমি একদিন রাজরানীর সম্মান পেয়েছিলুম।"

খান বললে, 'বিশ্বাস করবিনে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মার্জিত ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাক।'

আমি বললুম, 'আম্মো।'

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, টুনি মেম যা বলেছিল।

বললে, "অনেক অপমান নির্যাতন সয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমায় সইতে হয়নি—মুখ বুজে। নূতন অপমান আর কি হতে পারে ? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুন্নির নাক অল্প-অল্প ডাকছে। টিমেটা বাতাসে এদিক-ওদিক নাচছে।

টুনি বললে, "ও'হারা সায়েবের বোন এসেছিল বিলেত থেকে এ দেশের হাতী-গণ্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ওবাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

"আপনি মুরুব্বি, আপনাকে সব-কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার ত্রাণ-কর্তা, আমার বন্ধু রূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে ? আর

এ যে আমার বুকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহাপাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমায় দেবেন তার জন্য আমি তৈরী।

কিন্তু ভাবো দিকিনি ভাই সাহেব, আমি কুলী-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতিবেশীনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চুম্বক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায় সেটা আমি আরো ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক্, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সায়েব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরাজী পড়াতে শুরু করলে, বললে 'তোমাকে আমি আমার মনের মতো করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোন পাঠশালা-মক্তবের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলুম বলে এ জন্মে তারই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়বেই অবাক।"

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফ্‌টার অল্, সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই-ভাবেই।

বললে, "বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি হয়েছিল বলতে পারিনে, কিন্তু একটা

জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলী-মজুররা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছিনে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নূতনভাবে তাকে ভালো-বাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।”

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপন মনে যেন কথা বলছে। আবার কখনো বা সংবিতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

“সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে, আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুঁশের মতো। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি সে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—” ’

খান বললে ‘আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এই বারে জানতে পারবো. সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেত খামারের প্ল্যান করছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ও'হারা ডবল ক্রসিং করেছিল! রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানিনে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিল। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম, টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সান্ত্বনা দিলুম এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলী-কামিন্ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাদাদ্ (বিধিদত্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশী তুফান-ঝড় এত বেশী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেতে কুঁড়ে ঘরে এসে পৌঁচেছে যে এখন সে নির্ভয়—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশি দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দুব্‌লা পাতলা মেয়ে, পুলিসের এক ফুঁয়ে সে কঁহা কঁহা মুল্লুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এ-তত্ত্বটাও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দার্ঢ্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, "কিন্তু সাহেব ছিল পাগল। আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি, সাহেব ছিল পাগল। ছুটো জিনিসে যে তার পাগলামী কত বিকটরূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।"

তারই স্মরণে টুনি মেম যেন আঁতকে উঠলো। বললো, "বেশ ভালমানুষের মত দিব্য দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে আদর-সোহাগ করার অন্ত নেই, সারা সকালটা হয়তো কাটালো ক্যাটলেগ দেখে দেখে বিলেত থেকে আমার জন্য কি সব আনাবে বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজকর্ম তো বন্ধ বটেই, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুস্থাবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, 'দুটি মুখে দাও', তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, 'নেশা কেটে যাবে', নয় বলতো 'মুখ দিয়ে কিছুই নামবে না'। ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম! আমার জাত ভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ওজিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু ওরকম বেহদ মদ

কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি, কতবার—তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায় থাকলে সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনও খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার এই মদের বান কমতির দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন?" '

খান দম নিয়ে বলল, 'দেখ্ মিতু, এর পর বহুকাল চা অঞ্চলে কাজ করার ফলে বিস্তর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি, কাচ্চা বাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে,—এসব ওদের ডাল ভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।'

আমি বললুম, 'সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। বোলপুর আর বেশী দূরে নয়।'

খান বললে, 'টুনির কাহিনীও শেষ হতে চললো। শোন্। টুনি বললে "আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসি খুশির মানুষ সায়েব। হঠাৎ কোনো আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত তাকে বন্দুক হাতে নিয়ে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বুঝতুম, যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায়। আমার নিজের কোনো ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর

কোনো সন্দেহ ছিল না যে সে আর আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকর বাকরকে নিয়ে হত মুশকিল। আমার স্বামীকে—"'

খান থামলো। আমি তেড়ে বললুম, 'ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল না কি?'

খান বললে, 'ভাই এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরালো। আমি নাচার। আবার মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এই নিয়ে দু'বার হল; তিন বারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে, "ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।" তার পর আমাকে শুধালে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না? আমি বললুম, না ভাইয়ের সন্ধানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, "তাহলে জানতে, যা সবাই জানে। ঐ নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

সায়েব ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বদ্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শুধু চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস। আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি।' আমি চেষ্টা করেছিলুম সায়েবকে ঠাণ্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনো দুঃখ করিনি। আমার সায়েবকে পেয়েই আমি খুশি ছিলুম, আমি সুখী ছিলুম, কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়েব ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। এর পূর্বে সায়েব আমাকে কখনো একা ফেলে যায়নি। একা থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সে রাত্রে কেমন

যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাত্রিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

পর দিন সায়েব সন্ধ্যের দিকে ফিরে এল। আমি তাকে হাতে ধরে নিয়ে যেতে চাইলুম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে দুহাতে শূন্যে তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নিচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টে আমার দিকে। সায়েব এ-ভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি?

ভাই সাহেব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

ঠিক তার চারদিন পর পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল।

কুকুর বেড়ালকেও মানুষ এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েবের রক্ষিতা, আমার তো কোনো হক্ক নেই। পুলিস বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলতলায় এসে বসে রইলুম। সেখানে সায়েব আমার জন্য একটা সীমেন্টের বেদী বানিয়েছিল।

যে চাকর-নফর সেদিন সকাল বেলা পর্যন্ত আমার পা চেটেছে তারাই এখন আমাকে লাথি ঝাঁটা মারলো। চাকরী গেছে যাক্ কিন্তু ঐ 'কুলী মেমটাকে' যতখানি পারি অত্যাচার-অপমান করে তার দাদ তুলে নিয়ে যাই।

আমি একটি কথাও বলিনি।

মোকদ্দমাতে সব কথা বেরল। সবাই জানে। সেই যেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মুরুব্বী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে

খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

আমি জানতুম, আমার সায়েব এ-সব চা বাগিচার সায়েবদের ঘেন্না করতো। কতবার তাকে বলতে শুনেছি, যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডাণ্ডা মেরে বেড়ায় তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনো সুযোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজুর, আর সায়েবরা আপন দেশে সব সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকুও এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।

তোমাকে বলেছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করলে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কসিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলেছে, 'আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই। আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।' এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আক্রুগড়ের পাদ্রী সাহেব আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।'

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'তিন বারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শুধালুম, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনো খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেন ওটা অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন। আজও বুঝতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কি না। টুনি শুধু বললে, সায়েব নাকি তাকে বলেছিল, সে কলকাতার উকিলদের

কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে তবে সেটা নাকি খুব পরিষ্কার নয়। চুলোয় যাক্‌গে, সে-সব কথা, আমার ইচ্ছে শুধু জানবার তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে সে কি জানে কিন্তু সেই যে ও'হারার বদমেজাজীর কথা বলার সময় সে তার স্বামীর কথার আভাস দিয়েছিল, এবারে সেটুকুও না।'

আমি বললুম, 'ঐ কথাটুকু আমিও তো জানতে চাই।'

খান বললে, 'টুনি জল খেয়ে নিয়ে খেই তুলে বললে, "সায়েবকে ক্লাব বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। সেদিন বাড়ি ফিরে সায়েব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—সে তো বলেছি —তারপর মোকদ্দমায় বেরল সায়েব পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরের একটা ছোট্ট পোস্টআফিসে গিয়ে যে ছ'জন সায়েব তার গায়ে হাত তুলেছিল তাদের নামে ছ'প্যাকেট বিষ মাখানো চকলেট বিজ্ঞাপন হিসেবে পাঠায়। আচ্ছা, বলতো, ভাইয়া, আমি যে বলেছিলুম সায়েবের মাথায় ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? এটা কি ধরা পড়তো না? পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সায়েবলোগের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি তার মূল ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট আফিস থেকে সেগুলো এসেছিল তার খেই ধরে পুলিস ছু দিনের ভিতর ধরে ফেলল সে সে-ই পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করলে।" '

খান মন্তব্য করে বললে, 'টুনি মেমের নরম আর শক্ত ছুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে "মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দিকিন ঐ সব পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট কাচ্চাবাচ্চাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘুণাক্ষরেও সায়েবের এই ছুর্বুদ্ধির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দা দিতুম।

আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি।

শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার 'স্ত্রীর' ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানিনে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।

সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।

আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করনেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি গলায় ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—"

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে?"

খান বললে, 'এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নমের রদ্দি কুঁড়ে ঘরে এসে পৌঁছল তার বর্ণনা দেয়নি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।'

আমি বললুম, 'আমি স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাইনে। তারপর কি হল তুই বলে যা।'

খান বললে, 'টুনি সে রাত্রে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাঁকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাঁকে রিসীভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পুলিসের য়ুনিফর্ম পরে। আমি অবাক হয়ে বললুম, "স্যর, করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পুলিসকে

সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।"

খেলুম উৎকট ধমক। বললেন, "রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোষাল-বান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির 'কির্‌মি' বের করেছে একশ' সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোঁটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলুম গণ্ডা তিনেক ধাঁতানি। কীই বা করি আমি? তিনি হুঁদে আফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুন কবুল করাতে পেরেছেন বলে তাঁর খুশ-নাম ছিল—পাঠানকে "বেইমান" বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি জানতেন বলে। আমি চুপ করে গেলুম।

গট্ গট্ করে মিলিটারি বুটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়ে ঘরে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম

তারপর, মশাই, আরম্ভ হল হুঁদে পুলিশের যত রকম কায়দা-কেতা ফন্দি-ফিকির সন্ধি-সুড়ুক তার নির্মম প্রয়োগ। দুনিয়ার ভয় প্রলোভন, মৃদু ইঙ্গিত, কটু সম্ভাষণ সব-কুচ্ চালালেন ঘড়েল পুলিস-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পুলিস দেখে টুনি মেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুললে না। ঝাড়া ছ'টিঘণ্টা পুলিস সাহেব তাঁর শেষ চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরলেন সেই কুঁড়ে ঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হ্যাঁ না পর্যন্ত বলেনি।

আমার লজ্জাটুকু পর্যন্ত পুলিসকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব-কিছু জানতে পেরে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাইই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পুলিসকর্তা ঘায়েল হয়ে

গিয়ে সে কথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে হল—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।'

খান বললে, 'তার পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।'

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি ?'

'হুঁ।'

আমি শুধালুম, 'তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোন হিল্যে হল না।'

খান অনেকক্ষণ কোন উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে যাক্‌গে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পারিনি—সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনো টুনি মেমের শেষ চাউনির কথা ভাবি। সে চাউনিতে কি ছিল ?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম। টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টি-কর্তাকে তার সর্ব দেহ মন দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল—তিনি যে তার ডুবুডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দূত রূপে, তাঁরই ফিরিশতারূপে। তারপর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দিনে যেসব চাকর-বাকর তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। 'আমার মতলব ছিল তার বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে দাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার 'স্বামীকে' ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনো কথা হয়নি। গাড়ি বোলপুরে এসে থামল।

চেল্লাচেল্লিতে ম্যানেজার গোঁসাই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালুম, 'ওদের কি হল?' খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে।

এক পুরুষ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক।

বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের যুদ্ধে যাকে ইংরাজিতে বলে 'মপিং অপ্', যেন স্পঞ্জ দিয়ে মেঝের এখান ওখান থেকে জল শুষে নেওয়া—তাই চলেছে। আজ এখানে ধরা পড়ল জন দশেক সেপাই, কাল ওখানে জন বিশেক। কাছাকাছি কামান থাকলে পত্র-পাঠ বিদ্রোহীগুলোকে তাদের মুখের সঙ্গে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিম্বা ফাঁসী। গাছে গাছে লাশ ঝুলছে যেন বাবুই পাখীর বাসা।

পাঁচ শ' দু-আস্পা (দ্বি-অশ্বা) অর্থাৎ এক হাজার ঘোড়া রাখার অধিকারী বা মনসবদার গুল বাহাদুর খান বর্ধমানের কাছে এসে মনস্থির করলেন, এখন আর সোজা শাহী সরকারী রাস্তায় চলা নিরাপদ নয়।. তিনি অবশ্য আপদ কাটাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন নি। তিনি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন গদর (মিউটিনি) শেষ হয়ে গিয়েছে—তাঁরা হেরে গিয়েছেন। তিনি কেন, তাঁর সেপাইরা আশা ছেড়ে দিয়েছিল, তিনি নিজে নিরাশ হওয়ার বহু পূর্বেই। সলাহ্-পরামর্শ করার জন্য তিন রাত্রি পূর্বে যে জলসা বসেছিল তাতে তারা অনুমতি চায়, অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে গরীব-গুরবো, ফকীর-ফুকরো সেজে যূথভঙ্গ হয়ে যে যার আপন শহরের দিকে রওয়ানা হবে। এলাহাবাদ, কন্নৌজ, ফর্রুখাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মলীহাবাদ, মীরট—যার যেখানে ঘর।

গুল্ বাহাদুর খান বলেছিলেন, সেটা আত্মহত্যার শামিল। পথে ধরা পড়বে, আর না পড়লেও বাড়ীতে পৌঁছনোর পর নিশ্চয়ই। তাঁর মনের কোণে, হয়তো তাঁর অজানাতে, অবশ্য গোপন আশা ছিল বেঁচে থাকবার। শুদ্ধ মাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নয়,—তার বয়স বেশী

হয় নি, হয়তো আবার নূতন গদর করার সুযোগ তিনি এ জীবনে পাবেন। কিন্তু যখন দেখলেন, সেপাইদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে—আজকের দিনের ভাষায় যাকে বলে 'মরাল' টুটে গিয়েছে তখন তিনি তাদের প্রস্তাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। শেষ রাত্রে আধোঘুমে অনুভব করলেন, সেপাইরা একে একে তাঁর পায়ে চুমো খেয়ে বিদায় নিলে—তিনি আগের দিন মগরিবের নামাজের পর অনুরোধ করেছিলেন, বিদায় নেওয়া-নেওয়ির থেকে তাঁকে যেন রেহাই দেওয়া হয়।

শুনলেন, সেপাইরা চাপা গলায় একে অন্যকে শুধোচ্ছে, কাজটা কি ঠিক হল, বাড়ি পৌঁছানর আশা কতখানি, সেখানে পৌঁছেই বা কিস্মতে আছে কি, এ রকম সর তাজ্ (মাথার মুকুট) সর্দার পাবো কোথায় ?

গুল বাহাদুর খানের কিন্তু কোনো চিত্তবৈকল্য হয়নি। তাঁর কাছে এরা সব নিমিত্ত মাত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁর প্রাণের একমাত্র গভীর ক্ষুধা—জাহান্নমী শয়তান ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে শাহানশাহ বাদশা সরকার-ই-আলা বাহাদুর শাহের প্রাচীন মুগলবংশগত শান্‌শৌকৎ, তখ্‌ৎদৌলৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। আজ যদি এই সেপাইদের দিল্ দেউলে হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে। এরা তো আর কিছু কাপুরুষ নয়। কিন্তু এরা কাকের মত একবারই বাচ্চা দিতে জানে। একবার তারা চেষ্টা দিয়েছিল। সফল হতে পারেনি। দু'বার চেষ্টা দেওয়া তো এদের কর্ম নয়। তাই নিয়ে আফসোস্ করে কি ফায়দা! খুদা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, আল্লার যদি মেহেরবাণী হয় তবে আবার নয়া সেপাই জুটবে, নয়া গদর দামামা পিটিয়ে জেগে উঠবে—তার আশা তিনিই করতে পারেন, এরা করবে কি করে ?

গদর আরম্ভ হয়েছিল এলোপাতাড়ি কিন্তু পরে দিল্লীতে লালকেল্লার তসবী খানাতে যে মন্ত্রণাসভা বসেছিল সেখানে স্থির হয়, গুল্

বাহাদুরকে পাঠানো হবে বাঙলা দেশে। সেখানকার বাগ্দীরা এককালে ছিল বাদশাহের সেপাহী। ইংরেজ তাদের বিশ্বাস করতো না বলে ইংরেজ ফৌজে তাদের স্থান হয় নি। শুধু তাই নয়, ইংরেজ তাদের অন্য কোনো রকম কাজ তো দিলই না, উল্টে হুকুম করলে তারা যদি আপন জমি নিজে চাষ না করে তবে সে জমি কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করবে। বাগ্দীদের আত্মসম্মানে লাগে জোর ঘা। যে তলোয়ার দিয়ে সে দুশমনের কলিজা দু'টুকরো করে দেয়, তাই দিয়ে সে খুঁড়বে মাটি? তার চেয়ে সে তলোয়ার আপন গলায় বসিয়ে দিলেই হয়, কিম্বা মোকা পেলে দুশমনের গলায়—

গুল বাহাদুরকে বাঙলাদেশে পাঠানো হয়, এই বাগ্দী ডোমদের জমায়েৎ করে এক ঝাণ্ডার নিচে খাড়া করবার জন্য।

আফসোস্, আফসোস্! হাজার আফসোস্! একটু, আর একটু আগে আরম্ভ করলেই তো—গুল মুহম্মদ নিজের মনেই বললেন, 'থাক্ সে আফসোস্। এখন বর্তমানের চিন্তা করা যাক্।'

বাগ্দীদের সাহায্যেই তিনি জোগাড় করলেন ধুতী নামাবলী। তিনি এখন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব। বাঙলা জানেন না, জানেন হিন্দী। আসলে সেটাও ঠিক জানেন না। তিনি ছেলে বেলা থেকে বাড়িতে বলেছেন দিল্লীর উর্দু, মকতবে শিখেছেন ফার্সী, আর বলতে পারতেন দিল্লীর আশপাশের হিন্দীর অপভ্রংশ হরিয়ানা। কিন্তু তাই নিয়ে অত্যধিক শিরঃপীড়ায় কাতর হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই রাঢ় দেশে কে ফারাক করতে যাবে, দিল্লীর হরিয়ানা থেকে বৃন্দাবনের ব্রজভাখা।

দাড়ি গোঁফ কামাতে গিয়ে একটুখানি খটকা বেধেছিল, এক লহমার তরে। তারপর মনে মনে কান্নার হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তা কামাবো বইকি, নিশ্চয়ই কামাবো। লড়াই হেরেছি, তলওয়ার ফেলে দিয়েছি, পালাচ্ছি মেয়েছেলের মত—এখন তো আমাকে মেয়েমানুষ সাজেই মানায় ভালো।'

শেষটায় হঠাৎ অট্টকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'ইয়াল্লা, আমি কি গুনা করেছিলাম যে এ সাজা দিলে ?'

ক্রুশবিদ্ধ যাশুখৃষ্টও মৃত্যুর পূর্বে চিৎকার করে বলেছিলেন,

'হে প্রভু, তুমি আমাকে বর্জন করলে কেন ?'

বাগ্দীরা তাঁর হাহাকার হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। তেঁতুল তলায় শুইয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

তুপুর রাতে চাঁদের আলো মুখে পড়াতে ঘুম ভাঙলো। দেখলেন, ঘুমিয়েও ঘুমননি। ঘুমন্ত মগজও তাঁর জাগ্রত অবস্থার শেষ হাহাকারের খেই ধরে মাথা চাপড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সান্ত্বনাও খুঁজে পেয়েছে। কি সান্ত্বনা ? গুল বাহাতুর, এ কি তোমার ফাটা কিস্মৎ, না তোমার বাপ-ঠাকুর্দার ভাঙা কপাল ? মনে নেই, দেওয়ান-ই-খাসের যেখানে লেখা,

"অগর ফিরদৌস বররূয়ে জমীন অস্ত
হমীন অস্ত, হমীন অস্ত, হমীন অস্ত"
"ভূস্বর্গ যেখানে খুশী বলো, মোর মন জানে
এখানে, এখানে দেখো তারে, এই তো এখানে।"

তারই সামনে নাদির কর্তৃক হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত, পদদলিত বাদশা মুহম্মদ শাহ কপালে করাঘাত করে কেঁদে উঠেছিলেন,

'শামাতে আমাল ই-মা সূরতে নাদির গিরিফ্‌ৎ।'
'কপাল ভেঙেছে, আমারই কর্মফল
নাদির মূর্তিতে দেখা দিল।'

তখন কি তোমার পিতামহ তাঁর নুন-নিমকের মালিক শাহিনাশার সে তুর্দৈব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন নি। বাদশার খাস আমীর, সর্‌-বুলন্দ-খান্‌, হাজার তু-আস্‌পা মনসবের মালিক তোমার পিতামহ তখন কি করতে পেরেছিলেন ? আলবত্তা, হাঁ, হাবেলীতে ফিরে এলে তাঁর জননী তাঁকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'দাড়িগোঁফ

কামিয়ে ফেল, আর তলওয়ারখানা শাহিনশাহকে ফেরৎ দিয়ে এসো।'

তারপর দীন-দুনিয়ার মালিক আকবর-ই-সানী (দ্বিতীয় আকবর) যখন ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাতের বাদশার কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তাঁর তনখাহ্ বাড়িয়ে দেবার জন্য—মেথর যে-রকম জমাদারের কাছে তন্‌খা বাড়াবার জন্য আর্জী পেশ করে—তখন সে বেইজ্জতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তোমার বাপ। শোনোনি যে বাঙালীন্ বাবু (১) সে দরখাস্ত নিয়ে বিলায়েত গিয়েছিলেন তিনি পর্যন্ত নাকি তার জবান্, ঢং আর শৈলী দেখে শরম বোধ করেছিলেন।

তাই বলি তুমি এত বুক চাপড়াচ্ছো কেন?

তাঁদের তুলনায় তোমার মনসবই (পদমর্যাদা) বা কি, বাদশাহ তোমাকে চেনেনই বা কতটুকু? নানা সায়েব, লছমীবাঈ এঁরা সব গায়েব হয়েছেন, আর তুমি তাঁতী এখন ফার্সী পড়বে! হয়েছে, হয়েছে, বেহদ্ হয়েছে। গিদড়ের গর্দানে লোম গজালেই সে শের-বাবর হয় না।

আল্লা জানেন, এসব তত্ত্ব কথা চিন্তা করে গুল বাহাদুর খান কতখানি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে অনুমান করা যেত না, তিনি তাঁর কপালের গর্দিশ কতখানি বরদাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বড় রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকে মোড় নিয়ে, ফের বাঁ দিকে পূরো পাক খেয়ে তিনি পেরলেন অজয় নদ। উঁচু পাড়ি বেয়ে উঠেই দেখলেন, সমুখে দিক দিগন্ত প্রসারিত খরদাহে দগ্ধ সবিতার অগ্নি-দৃষ্টিতে অভিশপ্ত চিতানল ভস্মীভূত প্রান্তর।

অবাঙালীর তো কথাই নাই, এ দেশের আপন সন্তানও এই তেপান্তরী মাঠের সামনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। এর নাম 'বাঙলা' রেখেছে কোন্ কাষ্ঠরসিক!

কিন্তু গুল বাহাদুর শিউরে ওঠেন নি; তাঁর জীবন কেটেছে দিল্লী

(১) রাজা রামমোহন রায়

আগ্রার চারদিকের খাকছার দেশ দেখে দেখে। সেরেফ উনিশ বিশের ফারাক।

তাবৎ তেপান্তরের ওপারেও লোকালয় থাকে। সাহারার মত মরুভূমি পেরিয়েও বেতুয়িন যখন ওপারে ডেরা পাততে পারে তখন এই তেপান্তরের পরেও নিশ্চয়ই বসতি আছে। কিন্তু সেখানে থাকে কী সর্বহারা লক্ষ্মীছাড়ারাই। যাদের প্রাণ ছাড়া আর কিচ্ছু দেবার নেই শুধু তারাই তো পারে এ রকম ডাক-ডাকিনীর মাঠে পা ফেলতে।

ভালোই। ভালোই হল। এই তেপান্তরই তাঁর ও ইংরেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইবে অচল অভেদ্য দুর্গবহ। সেই হতভাগাদের সঙ্গেও তাঁর বনবে ভালো, hail fellow well-met, 'এক বাথানের গরু'।

গুল বাহাদুর বললেন, 'শুক্‌র্, অলহমদুলিল্লা।'

মাঠে ফেললেন পা।

॥ দুই ॥

সংসারের অধিকাংশ লোক না গোলাম না বাদশাহ। বাদবাকীর কেউ সর্দার কেউ চেলা। ওদের কেউ কেউ জন্মায় হুকুম দেবার জন্য, আর কেউ কেউ সে হুকুম তামিল করার জন্য। ভাগ্যচক্রে অবশ্য কখনো কখনো হুকুম-দেনেওলাও জন্মায় হুকুম লেনেওলা হয়ে। তখনো কিন্তু তার গোত্র বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে তখন বাদশা হয়ে জন্মালে উজীরের হুকুম মত ওঠ-বস করে, উজীর হলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকে কোটালের দিকে—তার আদেশ কি। আবার উল্টোটাও হয় ঠিক ঐ রকমই। সে পাইক হয়ে জন্ম নিয়েও ফৌজদারকে হামেহাল বাৎলে দেয় তার কর্তব্য কোন্ পথে।

তুঁদে জমিদারের জেল হলে সে তিন দিনের মধ্যেই চোর-ডাকাত নিয়ে কয়েদী খানায় দল খাড়া করে, সপ্তাহের মধ্যেই জেল সুপরিন্-

টেন্‌ডেণ্ট তার কথায় হাঁচে, তার হুকুমে কাশে। মোকা পাওয়া মাত্রই উপর-ওলাকে জানায়, 'অমুক কয়েদীর কণ্ডাক্‌ট্‌ ভেরি ভেরি গুড; অ্যামনেস্টির সময় একে অনায়াসে খালাস দেওয়া যেতে পারে।' জমিদার বেরিয়ে গেলেই সে তখন খালাসী পায়।

গুল বাহাদুরের জন্ম হয়েছিল হুকুম দেবার জন্য। নামাবলী গায়ে দিয়েই আসুন আর রাইডিং বুট পরেই আসুন, ডোমের দল তাকে চট করে চিনে ফেলল। পিঠে থাবড়া খেয়েই ঘোড়া চিনতে পারে ভালো সোওয়ার কে?

তেপান্তরের মাঠের প্রত্যন্ত প্রদেশে, গ্রাম যেখানে শুরু, সেখানে এক পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন গুল বাহাদুর। চালের ভিতর দিয়ে আসমান দেখা যায়। রাতে আকাশের তারা তাঁর দিকে মিটমিটিয়ে তাকায়, দিনে কাঠবেরালী। ঘরের কোণের গর্ত থেকে একটা সাপ মাথা তুলে তাঁর দিকে জুল জুল করে তাকিয়েছিল। গুল বাহাদুর বলেছিলেন, 'তশরীফ নিকালিয়ে' 'আত্মপ্রকাশ করতে আজ্ঞা হোক।' গদরের সময় তিনি নিমকহারামী দেখেছেন প্রচুর। সাপ তো তার নুন-নিমক খায়নি যে তাকে কামড়াতে যাবে।

ডোমরা তার ঘর মেরামত না করে দিলে গুল বাহাদুর কদাচ এই গর্ত বন্ধ করতেন না।

চিকনকালা গ্রামে আসার পরদিন গুল বাহাদুর গিয়েছিলেন গ্রামের ভিতর একটা রোঁদ মারতে—দিল্লীর চাঁদনীচৌকে যাওয়ার মত। এক জায়গায় দেখেন ভিড়। তিনি ভিতরে যাওয়ার উপক্রম করতেই ডোমরা তড়িঘড়ি পথ করে দিলে। একটা ছেলে গাছ থেকে পড়ে পা মচকিয়েছে। তার মা হাঁউমাউ করে আসমান ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে জমিনের উপর ফেলছে।

গুল বাহাদুর বরিশাল গান্‌ ফাটিয়ে বললেন,

'চোপ!'

মা'র কথা দূরে থাক সুবে ডোমিস্থান সে হুঙ্কারে কে কার ঘাড়ে

পড়বে ঠিক নেই। এই যে খুদাতালার এত বড় হুনিয়া, তার আধেক-খানাই তো ঐ তেপান্তরী মাঠ, সেখানেও যেন তারা পালাবার পথ পাচ্ছে না। হুঙ্কার তারা বিস্তর শুনেছে, নামাবলীও বিস্তর দেখেছে কিন্তু নামাবলীর তলা থেকে এ রকম অট্টরব! নিরীহ গোপীযন্ত্র থেকে গদরের কামান ফাটে নাকি!

'চোপ্' বলে গুল বাহাহুরের হাত গোঁপের দিকে উঠেছিল। তখন মনে পড়ল তিনি গোঁপ কামিয়ে ফেলেছেন।

গুল বাহাহুর ছেলেটার পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

কে এক ওলন্দাজ না অন্য জাতের আর্টিসট্ বলেছেন, 'যারা এচিং কিংবা অন্য কোনো প্রিন্টিঙের কাজ করে তাদের হাতের তেলো হবে রাজকুমারীর মত কোমল, পেশী হবে কামারের মত কট্টর। প্লেট থেকে ফালতো রঙ তোলার সময় রাজকুমারীর মখমলী তেলো দিয়ে আলতো আলতো করে তুলবে রঙ, আর প্রিন্ট করার সময় দেবে কামারের পেশীর জোরে মোক্ষম দাবাওট্!

গুল বাহাহুর তাঁর মোলায়েম তেলো দিয়ে ছোঁড়াটার গোড়ালি বুলোতে বুলোতে হঠাৎ পা'টা পাকড়ে ধরে কামারের পেশী দিয়ে দিলেন হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি। ছেলেটা আৎকে উঠে রব ছাড়লে,

'কক্'

তিনি বললেন, 'ঠীক্ হৈ, বেটা, আরাম হো জায়েগা। ফির বন্দর জৈসা কুদেগা।'

এতক্ষণ ছেলেটার পা'টা উরু থেকে কাঠের মত শক্ত হয়ে উপর নিচ করছিল না; এবারে গুল বাহাহুর সেটাকে কব্জা-ওলা বাক্সের ডালার মত উপর নিচু করলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তীন্ দন্ সোলাকে রাখবে।'

'রাখবে' শব্দটা বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর বাঙলা শেখার প্রচেষ্টার ফল। তোমরা বুঝলে। 'সোলাকে'ও বুঝলে—'শুইয়ে', 'তীন' তো সোজা 'তিন' কিন্তু 'দন্'-টা কি চীজ্?

গুল বাহাদুরকে গদরের সময় জাত-বেজাতের সেপাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে হয়েছিল। তিনি তাই শিখে গিয়েছিলেন, বিদেশী কোনো শব্দ না বুঝতে পারলে তাকে শোনাতে হয় ঐ শব্দের সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় প্রতিশব্দ। যেমন 'ইনসান' বললে যদি না বোঝে তবে বলতে হবে, 'আদমী' তারপর 'মানস' 'লোগ' 'বেটা' 'বাচ্চা' ইত্যাদি। একটা না একটা বুঝে যাবেই।

গুল বাহাদুর বললেন, 'তীন্ দন্, তীন্ শাম, তীন্ রোজ—'

এক ডোম চিৎকার করে বললে, 'বুঝেছি, গো, বুঝেছি। 'তিন দিন', 'তে রাত্তির'।

জীবনের দীর্ঘতর অংশ চিকনকালা গ্রামে কাটিয়ে গুল বাহাদুর বীরভূমী ডোমী ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত তাঁর হিন্দুস্থানী হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান নি। তাঁর 'দিন' শোনাতো 'দন', কিতাব, কতাব', 'হিন্দূ হন্দু',' বিলকুল, বল্‌কল্'— বাগ্দীদের কানে।

অঙ্গারখার দামন্ (চাপকানের নিম্নাঞ্চল) ওঠাতে গিয়ে গোঁপে তা দিতে যাবার মত তাঁর খেয়াল হল, তিনি ধুতী উত্তরীয়ধারী!

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আঙ্গিনায় পলাশতলায় চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে। আসমানে দেখছেন মীজান্ (দাঁড়ীপাল্লা, মধ্যিখানে তিনটে তারা, কাঁটার মত, দু'দিকে ভার—আমাদের কালপুরুষ)। তখন খেয়াল গেল, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, সবই আগের থেকে উদয় হয়েছেন। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মীজান্, অকরব, কওস, সম্বুলা জদী, দলো, হূৎ !

দিল্লীতেও তিনি ছাতের উপরই থাকতেন বেশীর ভাগ।

ঠাকুরদা শখ করে বানিয়েছিলেন যমুনার উপর একখানি চক-মেলানো বাড়ি। বাড়িখানি ছোট কিন্তু উচ্চতায় সে বাড়ি ও-পাড়ার সব বাড়ি ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজকের দিনের ভাষায় একেই বলে বাড়ী হাঁকানো। বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুরদার চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে

যায় নি। নাতিকে কোলে বসিয়ে বলতেন, 'ঐ দেখো, ঐ দূরে, যমুনার ওপারে শাহদারা, গজীয়াবাদ'। নাতি দেখতো ওপারে শুকনো মাঠ খা খা করছে, আর তার মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। কুৎবউদ্দীন আইবক থেকে আরম্ভ করে বাবুর, হুমায়ুন, রফীউদ্দৌলা মুহম্মদ শাহ সবাই গিয়েছেন ওপারে হরিণ শিকার করতে। বুড়ো বাদশাহের হরিণ-শিকারের বয়স গেছে—তিনি এখন লাল কেল্লার ছাতের উপর থেকে ওড়ান ঘুড়ি। শাহজাহাদারা এখনো যান, তিনিও বহুবার গিয়েছেন।

বাহাদুর শাহ ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। অবশ্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জওক ও গালিবের তুলনায় তাঁর রচনা নিম্নাঙ্গের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন একটা সরল সহৃদয়তার গুঞ্জন থাকতো যেটা কারো কান এড়িয়ে যেত না। এবং তাঁর মধ্যে ছিল এমন একটা সদগুণ যেটা জওক কিম্বা গালিব কারোরই ছিল না। জওক গালিবের মধ্যে হামেশাই হ'ত লড়াই। তৎসত্ত্বেও একে অন্যের প্রশংসা করতেও তারা কুণ্ঠিত হতেন না। শোনা যায় শ্রেষ্ঠতর কবি গালিব নাকি এক মুশায়েরাতে (কবি সম্মেলনে) জওকের কোন কবিতার দু'ছত্র শুনে তাঁকে সর্বসমক্ষে বারবার কুর্নিশ করতে করতে বলেছিলেন, 'আপনার এ দুটি ছত্র আমাকে বখশিস্ দিন; আমি তার বদলে আমার সমস্ত কাব্য আপনাকে দিয়ে দেবো।' কিন্তু এঁদের কাব্যের চিকন কাজ বাদশাহ বাহাদুর শাহ যতখানি অনুভব করতে পারতেন এঁরা একে অন্যের ততখানি পারতেন না। বাহাদুর শাহ ছিলেন সে যুগের—সে যুগের কেন তাবৎ উর্দু যুগের—সবসে বঢ়িয়া সমজদার।

গদর আমলের ইংরেজরা তাঁর কাব্যপ্রেমকে নিয়ে কত যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-মস্করা করেছে তার অন্ত নেই। তাদের রাজদরবারেও পোইট লরিয়েট নামক একটি প্রাণী পোষা হয়। তাদের কুরান-পুরাণে আছে, গ্রেট ন্যাশনাল অকেশনে তিনি টপ্পা-ফপ্পাভী লিখতে

পারেন, ঐ সব অকেশনে দর্জী-ওস্তাদরা যে রকম রাজা রাণীর পাতলুন-ব্রুমার্জ বানায়, কিম্বা বলতে পারেন হটেন্টট্দের রাজদরবারে পালপরবে যে রকম পোষা বাঁদর হুচক্কর 'নাচভী লেচে ল্যায়'।

আসলে তাদের রাজারা দেবসেনাপতি, অসুরমর্দন, রুদ্রাত্মজ কার্তিকের বংশাবতংশ। তাঁরা তীব্রতম চীৎকারে আকাশ বাতাস সসাগরা পৃথিবী (যে রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হন না) প্রকম্পিত করে শিকার করেন খ্যাঁকশ্যালী। দি লর্ড বি থ্যান্‌ক্‌ট—তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান আছে।

তাবৎ ইংরেজই অগা ও-কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে। কারণ পরবর্তী যুগের এক ইংরেজই দুঃখ করে বলেছেন, 'যে সব গাড়লরা গদরের সময় ভারতবর্ষ শাসন করতো তাদের সামনে শেলি কিম্বা কীটস এলে যে সম্মান বা অসম্মান পেতেন, কবি বাহাদুর শাহ সেই সব গবেটদের কাছে সেই মূল্যই পেয়েছেন। এবং সেই সব সম্বন্ধীরা এই মামুলী-খবরটুকুও জানতো না যে, তাদের দুই নম্বরের মাথার মণি ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন এবং ইংরেজ লেখক জোর গলায় বলেছেন সে কবিতা বাহাদুর শাহের কাব্যের তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট এবং ওচা।

গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, গদর শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকমাস আগে নওরোজের রাতে যে মুশায়েরা বসেছিল তাতে সভাপতির আসন নিয়েছিলেন বাদশা সালামৎ বাহাদুর শাহ। সেই শেষ মুশায়েরা!

থাক্ থাক্ কি হবে ভেবে?

ভাববোই না কেন? আমার অতীতকে আমি আঁকড়ে ধরে থাকবো না, আর ভবিষ্যৎকেও আমি আলিঙ্গন করতে ভয় পাবো না।

রাজত্ব বধূরে যেই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন।

কি ভয় তাতে? আমার রথ চলবে এগিয়ে, রথের পতাকা

পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁপবে অতীতের স্মরণে। তাই বলে কি আমার এগিয়ে চলা বন্ধ হবে?

বরঞ্চ বলবো, নবজন্ম লাভ, অবশ্য আমি জাতিস্মর।

এই তো সেই আকাশ। এ-আকাশ আর দিল্লীর আকাশে তো কণামাত্র তফাৎ নেই। এ-আকাশ তো আমার। হেসে মনে পড়লো, ফিরদৌসীর একটি দোঁহা। সম্পত্তির ভাগাভাগির সময় একজন অন্য বখরাদারকে বললে,

> আজ্ ফর্শ্-ই-খানা তা ব্ লব্-ই-বাম্ আজ্ আন্-ই-মন্
> আজ্ বাম্-ই-খানা তা ব্ সুর্‌ইয়া আজ্ আন্-ই-তো।
> মেঝের থেকে ছাতটুকু তাই নিলেম কুল্লে আমি
> ছাতের থেকে আকাশ তোমার সেইটে তো ভাই দামী।

প্রথম যখন দোঁহাটি পড়েছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ কি কাষ্ঠ রসিকতা। আজ হৃদয়ঙ্গম হল, এ শ্লেষ নয়, বিদ্রূপ নয়—ছাত থেকে আকাশই মূল্যবান—সেখানেই মুক্তি, সেখানেই নির্বাণ।

ঐ তো আকাশের তারা। তাঁর পেয়ারা ঘোড়ার জিনের সামনের উঁচু দিকটা ঠিক এই রকমই পেতলের ষ্টাড দিয়ে তারার মত সাজানো ছিল। এ তো কিছু অজানা সম্পদ নয়। দার্শনিক গজ্জালী ও তাঁর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (কিমিয়া সাদৎ) গ্রন্থে বলেছেন, 'আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে দেখো, আর আপন অন্তরের দিকে তাকাও—বুঝতে পারবে সৃষ্টির মাহাত্ম্য।'

দুইই অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে চলে। শুধু হৃদয়ের আইন বোঝা কঠিন। স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে ভাবি, স্বেচ্ছায় করছি—তারারাও হয়তো তাই ভাবে।

তরল অন্ধকার। এ অন্ধকার বুকের উপর দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে না। এর চেয়ে অনেক বেশী মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে পলাশের ডালগুলো। তারা আঁকাবাঁকা শাখা দিয়ে অন্ধকারের গায়ে এঁকেছে

বিচিত্র অলিম্পন। গাছের শক্ত ডাল, অশরীরী অন্ধকার, দূরদূরান্তের তারার দেয়ালি সবাই এক সঙ্গে মিলে গিয়ে পেলব মধুর স্পর্শ দিয়ে শান্তি এনে দিচ্ছে গুল বাহাদুরের দগ্ধ ভালে। এইটুকু তাঁর চোখের মণিতে ধরা দিয়েছে সে সন্ধ্যার অনন্ত আকাশ থেকে পলাশের ডগাটুকু পর্যন্ত। যমুনার পারে প্রাসাদের উপরে এরা তাঁকে যেমন করে সোহাগ জানাতো ঠিক তেমনি তারা এসে ধরা দিল ছেঁড়া চ্যাটাইয়ের উপর শায়িত ফকীর গুল বাহাদুরের কাছে।

কৃতজ্ঞ গুল বাহাদুর তাঁর দীর্ঘ দুই হাত তাদের দীর্ঘতম প্রসারণে উচ্চ বিস্তার করে আসমানের দিকে তুলে মোনাজাৎ করলেন,

তোমার আমার মাঝখানে, বিভু, নাই কোনো বাঁধা আর
তোমার আশিস বহিয়া আনিল তরল অন্ধকার।

॥ তিন ॥

আরব্য রজনীর গল্পে আছে, কোথায় যেন দমস্কস্ না বাগদাদ শহরে, এক ঝুড়ি আণ্ডা সামনে নিয়ে বসে অন্-নশ্‌শার স্বপ্ন দেখছিল। হুবহু স্বপ্ন না, দিবা স্বপ্ন। ঐ ডিমগুলোই তার সাকুল্য সম্পত্তি। এই ডিম বিক্রী করে মুনাফা দিয়ে সে কিনবে আরো ডিম। তারই লাভে পুষবে মুর্গী। তারই লাভে সে যাবে হিন্দুস্থান, সদাগরী করতে। তারই লাভে সে হয়ে যাবে শেষটায় শহরের সবচেয়ে মাতব্বর আমীর। তখন প্রধানমন্ত্রী—ওজীর-ই-আলা—যেচে-সেধে তাঁর মেয়েকে দেবেন তার সঙ্গে বিয়ে। তারপর আরো অনেক কিছু হবে। হয়ে হয়ে একদিন এই এমনি খামোখা তার রাগ হয়েছে বেগম সায়েবার উপরে। তিনি অনেক সাধাসাধি করেছেন তার মান ভাঙাবার জন্য। অন্-নশ্‌শার মানিনী শ্রীরাধার মত অচল অটল। বরঞ্চ হঠাৎ আরো বেশী ক্ষেপে গিয়ে মারলেন বেগম সায়েবাকে এক লাথ। হায়রে, হায়! এতক্ষণ ছিল শুদ্ধমাত্র খেয়ালের পোলাও খাওয়া,—দিবা-স্বপ্ন—এখন অন্-নশ্‌শার মেরে দিয়েছে সত্যিকার

লাথি। সেটা পড়ল সামনে-রাখা ডিমের ঝুড়ির উপর। কুল্লে আণ্ডা ভেঙে ঠাণ্ডা।

এ-গল্প কখনো ফ্রক্ পরে ইংলণ্ডে কখনো দাড়ি রেখে আফগানিস্থানে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। এবং সর্বযুগের সর্বদেশের প্র্যাকটিকেল পাণ্ডারা বেচারী অন্-নশ্ শারকে নিয়ে কতই না ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। সেও লজ্জায় রা'টি কাড়ে না।

কিন্তু এ-কথাটা কেউ ভেবে দেখে না এ-সংসারে অহরহই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে যাঁরা বৃহত্তর ভুবনে চলে যেতে জানে তাঁদের সবাই অন্-নশ্ শার—ঐ শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। যারা আপন নাকের ডগার বাইরে তাকাতে জানে না তারাই দৈনন্দিন দৈন্যে শেষদিন পর্যন্ত নাকানি-চুবোনি খায়। দিবা-স্বপ্ন আলবৎ দেখতে হয়—কিন্তু শেষ লাথিটুকু বাদ দিয়ে। গুল বাহাদুর ঠেকে শিখেছেন। গদরের আণ্ডা বিক্রী হওয়ার পূর্বেই তাঁরা স্বাধীনতার উজীর-কুমারীকে লাথি মেরে বসিয়েছিলেন। তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন। এখন আর কুঁড়ে ঘরে বসে বালাখানা-রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন নয়, গদরের খেয়ালি পোলাও নয়। এখন দেখতে হবে নাকের ডগা ছাড়িয়ে ত্রিশ গজ দূরের স্বপ্ন মাত্র—সাংসারিক স্বচ্ছলতার স্বপ্ন।

তার প্রথম আণ্ডা এল অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে।

ডোমেরা এসে সভয়ে তাঁকে নিবেদন জানালে, শিবু মোড়ল যায় যায়। মরার আগে বাবাজীর চরণ ধূলি-চায়।

গুল বাহাদুর পড়লেন বিপদে। ওপারে যাওয়ার সময় মুসলমান যে সব তওবা-তিল্লা করে থাকে—অনেকটা হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত কিংবা জৈনদের পর্যুসনের মত—সেগুলো তিনি কোনো মতে সামলে নিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের তিনি জানেনই বা কতটুকু? তাঁর আমলে দিল্লীর হিন্দুরা তো শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতি-সভ্যতায় পূরো-পাক্কা মুসলমান বনে গিয়েছে। তারা পরে চোফ্ৎ চুড়িদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী,

মাথায় তুকল্লী কিস্তি টুপী আর মুশাইরায় হাঁটু গেড়ে বসে বয়েৎ আওড়ায় —'মক্কা-মদীনার মালিক, ইয়া আল্লা, আমাকে ডেকে নাও নবীর নূর হজরৎ মুহম্মদের পদপ্রান্তে।'

বরন্দাবন্—(বৃন্দাবন) কে কুন্জ্-গলিয়াঁমে (কুঞ্জ গলিতে) কিসন্জী (শ্রীকৃষ্ণ) কভি কভি বান্সরী (বাঁশরী) বজাওৎ (বাজান), এই তো হিন্দুধর্ম বাবদে তাঁর এলেম ! ঐটুকু জ্ঞানের ন্যাজ তিনি শিবু মোড়লের হাতে তুলে দিয়ে তাকে নির্ভয়ে বৈতরণীতে নাবতে ভরসা দেবেন কি প্রকারে ?

ধরা পড়ার ভয় আছে, অথচ না গিয়েও উপায় নেই। গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'চুলোয় যাক্গে ! এ রকম ভয়ে ভয়ে কাটাবো আর কতদিন।' মৃত্যু যে অহরহ মানুষের চুলের ঝুঁটি পাকড়ে ধরে আছে সেটা স্মরণ করে কটা লোক ? কিম্বা বলা যায়, গুল বাহাদুর ভাবলেন, গায়ে গু মেখে বসে থাকলেই কি আর যম ছেড়ে দেবে ?

শিবু মোড়লের ইঙ্গিতে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল—মায় তার ছ' বচ্ছরের ছেলেটাও। আরেক ইশারায় গুল বাহাদুরকে তক্তপোষের একদম কাছে ডেকে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আমার ছেলেটাকে তুমি মানুষ করো। সব তোমাকেই দিলুম।'

গুল বাহাদুর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। ছেলেটার ভার কাঁধে তুলতে তার কণামাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে আসলে মুসলমান।

মোড়ল বললে, 'আমার অনেক শত্রু ; ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।'

দুশ্চিন্তার ভিতরও গুল বাহাদুরের মনে পড়লো, হজরৎ মুহম্মদের পূর্বেও আরবরা ছিল বর্বর। তারাও নির্ভয়ে অনাথকে মেরে ফেলে তার টাকাকড়ি, উট তাম্বু কেড়ে নিত। তাই হজরতের নবধর্ম স্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল অনাথের রক্ষা। মনে পড়ল,

স্বয়ং আল্লা হজরতকে 'মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই, ওরে' ব'লে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনিও অনাথ রূপেই জন্ম নিয়েছিলেন,—

'অসহায় যবে আসিলি জগতে তিনি দিয়েছেন ঠাঁই,
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা আছিল যা সব মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি, তিনিই সুপথ দেখায়ে দেছেন তোরে
সে-কৃপার কথা স্মরণ রাখিস্। অসহায় শিশু, ওরে,
দলিস্নে কভু। ভিখারী-আতুর বিমুখ যেন না হয়
তাঁর করুণার বারতা যেন রে ঘোষিস জগৎময়।'

এতো আল্লার হুকুম, রসূলের আদেশ। মানা-না-মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তোমার ঘাড় মানবে।

কিন্তু তিনি যে মুসলমান। ডোম হোক আর মেথরই হোক, মোড়লের ছাবালের মুখে তিনি জল তুলে দেবেন কি প্রকারে? গুল বাহাদুর চুপ।

শিবু তার লাল ঘোলাটে চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকালে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'গোসাঁই, তুমি গোসাঁই নও, সে-কথা আমি জানি। তুমি কি, তাও আমি জানি। কিন্তু আর কেউ জানে না। জানার দরকারও নেই।'

'কি করে জানলে?' এ প্রশ্ন গুল বাহাদুর শুধালেন না। তিনি পলটনের লোক; বললেন, 'আমি মুসলমান, জানো?'

শিবুর শুকনো মুখ খুশীতে তামাটে হয়ে উঠলো। গুল বহাদুরের হাতখানা আপন হাড্ডি-সার দু'হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'বাঁচালে, গোঁসাই, তরালে আমাকে।' তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,

'মুসলমানেরই এক দর্গায় মানত করে মা পেয়েছিল আমাকে। আমি পেয়েছি আনন্দীকে। পীর সৈয়দ মরতুজার ভৈরবীর নাম ছিল আনন্দী।'

মুসলমান পীরের দরগায় যে হিন্দু বন্ধ্যা সন্তানের আশায় যায়,

এ দৃশ্য গুল বাহাদুর বহুবার দেখেছেন দিল্লীতে নিজাম উদ্-দীন আউলিয়ার দরগায় কিন্তু পীরের আবার ভৈরবী হয় কি করে, আর ভৈরবীই বা কি চীজ, আনন্দী শব্দটাও তো হিঁদু-হিঁদু শোনায়, এ সব গুল বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে জানে মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে এসে কি রূপ নিয়েছে।

'বাচ্চাকা ভালা বোলনা-চোলনা, বহুড়ীকা ভালা চুপ'—বাচ্চার ভালো বক্‌বকানো, কনের ভালো চুপ—ভালো সেপাইও বহুড়ীর মত চুপ করে শুনে যায়; গুল বাহাদুর চুপ করে শুনে যেতে লাগলেন।

মোড়লের দম ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। তাই আশকথা-পাশকথা সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধু তার ইচ্ছাগুলো বলে যাচ্ছিল, 'বিষয়-আশয় বোঝবার বয়স হলেই তাকে মামার বাড়ী বিষ্টুপুরে পাঠিয়ে দিয়ো। সেখানে তার জমিজমা এখানকার চেয়ে ঢের বেশী।'

গুল বাহাদুর পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে শুধালেন, 'তোমার ছেলে আমার সঙ্গে থাকলে মুসলমান হয়ে যাবে না?'

মোড়ল বললে, 'না। আমরা জাতে ডোম। মুসলমানের হাতে খেলেও আমাদের জাত যায় না, আমরা মুসলমানও হইনে। থাক্ অতশত কথা। তুমি নিজেই জেনে যাবে। শোনো, আর যা করতে হয় করো, ছেলেটাকে কিন্তু লেখা পড়া শিখিয়ো না, ওকে ভদ্রলোক বানিয়ো না।'

'সে কি!'

'না, ভদ্রলোক বানিয়ো না। আর শোনো, জলের কলসীর তলায় মাটির নিচে কিছু টাকা আছে। তোমাকে দিলুম।'

গুল বাহাদুরের আবার মনে পড়ল, হজরৎ তাঁর যৌবন আরম্ভ করেছিলেন, এক বিধবার ব্যবসায়ের কর্মচারীরূপে। বললেন, 'টাকা ব্যবসাতে খাটাবো। তোমার ছেলে পাবে মুনাফার আট আনা।'

মোড়ল বললে, 'যা খুশী করো, কিন্তু লগ্নীর ব্যবসা করো না।'

গুল বাহাদুরের মুখ লাল হয়ে উঠল। ভদ্র মুসলমান সুদের ব্যবসা করে না।

মোড়ল বললে, 'আর শোনো, খুশ বিরামপুরের ঘোষালদের মেজোবাবুর সঙ্গে আলাপ করো। তোমারই মত। কিন্তু সাবধানে। আর শোনো, তোমারই মত আরেকজন আশ্রয় নিয়েছে বর্ধমানের কাছে, দামোদরের ওপারে—'

এবারে গুল বাহাদুর আর চুপ করে থাকতে পারলেন না! তবু উত্তেজনা চেপে রেখেই তাড়াতাড়ি শুধালেন, 'কোন্ গ্রামে?'

মোড়ল তখন হঠাৎ চলে গিয়েছে ওপারে. যেখানে খুব সম্ভব গ্রামও নেই, শহরও নেই।

গুল বাহাদুর দু'হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মোড়লের চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে আবৃত্তি করলেন,

'ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

আল্লার কাছ থেকে এসেছি, আর তাঁর কাছে ফিরে যাবো।'

কাফেরের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে কট-মোল্লারা উল্লাসভরে এ-মন্ত্র উচ্চারণ না করে বলে ওঠে ভিন্ন মন্ত্র—

ফী নারি জহান্নামা।

একমাত্র ইংরেজের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে গুল বাহাদুর দ্বিতীয় মন্ত্রটি একশবার আবৃত্তি করতেন। আল্লার একশ'নাম—মানুষ তার নিরনব্বুইটি জানে—সেই নিরনব্বুই নামের উদ্দেশ্যে নিরনব্বুই বার আর শয়তানের উদ্দেশ্যে একবার!

দাহ-কর্ম শ্রাদ্ধ, তাও আবার ডোমের, এসব কোনো-কিছুই গুল বাহাদুর জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখলেন। তবে তাঁর গম্ভীর আট-সাট মূর্তি আনন্দীর হাত ধরে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো ঝগড়া-ঝাটি হতে পারতো। মোড়লের মরে যাওয়ার পর বাড়ীর সামনে যে-ভিড় জমেছিল তার দিকে একবার

তাকিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন, শাহ্-ইন্-শাহ্ বাহাদুর শা'র দরবারে যদি দৈবপাকে চিকনকালা গ্রামের মাতব্বরদের কুর্নিশ জানাবার অনুমতি লাভ হ'ত তবে তাতে দুই নম্বর হত কে ? পয়লা নম্বর তো চলে গিয়েছেন, দুই নম্বর হতেন ঝিঙে সর্দার। ভিড়ের মধ্যে ঝিঙের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ভারী গলায় হুকুম দিলেন, 'ইধর আও।'

ঝিঙে ভয়ে ভয়ে, লোকলজ্জায় কিছুটা বুক ফুলিয়ে, এগিয়ে এল—ভিড় রাস্তা করে দিলে। ঝিঙের সঙ্গে শিবুর সদ্ভাব ছিল না।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব-কিছু চালাও।'

ঝিঙে গলে গেল। তার মনে কোনো সন্দ ছিল না, শিবু গত হলেই সে হবে গাঁয়ের মোড়ল। মধ্যিখানে বাদ সাধলে এই লক্ষ্মীছাড়া বাবাজী। শিবু নিশ্চয়ই মরার সময় এ-ব্যাটাকে বিষিয়ে গেছে। তা হলে এটা হ'ল কি করে ? থাক্ এখন, পরে জানা যাবে।

ঝিঙে ডবল উৎসাহে সব-কিছু সামলালে। বেশীর ভাগ ব্যবস্থা শিবু মরার আগেই করে গিয়েছিল।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে ঝিঙে সর্দার শিবু মোড়লের দাওয়ায় গুল বাহাদুরের কাছে এসে বসলো। গাঁয়ের দু'চারজন তাদের কথাবার্তা শোনবার জন্য এগিয়ে এলে ঝিঙে দিলে তাদের জোর ধমক। তারা গুল বাহাদুরের দিকে আপিল-নয়নে তাকালে কিন্তু তাঁর কোনো ভাব-পরিবর্তন না দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

তখন তিনি অতি শান্ত কণ্ঠে, ধীরে ধীরে বললেন, 'মোড়ল, ধমক না দিয়েই যেখানে কাজ চলে সেখানে ধমকের কি দরকার! কিন্তু সে তুমি বোঝো। আমি বলবার কে ? আমি তো এদের চিনিনে। এদের কি করে সামলাতে হয় তার খবর রাখো তুমি।'

'মোড়ল' সম্বোধনে ঝিঙে একেবারে পানি হয়ে গেল—জল তো হয়ে গিয়েছিল আগেই। হাতজোড় করে বললে, 'দেবতা, অপরাধ হয়েছে। কিন্তু তুমি ওদের থাকতে বললে না কেন ?'

গুল বাহাদুর প্রথমেই লক্ষ্য করলেন ঝিঙে তোতলা। তোতলাকে মোড়ল বানানো কি ঠিক? তখন মনে পড়লো, একাধিক পেগম্বরও ছিলেন তোতলা।

ঝিঙের কথার উত্তরে বললেন, 'তুমি মুরুব্বী, একটা হুকুম দিয়েছ। আমি উল্টো কথা বললে তোমার মুখ থাকতো কি?'

ঝিঙে কিন্তু শিবুর মত বিচক্ষণ লোক নয়। ভ্যাবাচাকা খেয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধালে, 'শিবু তোমাকে বলে যায় নি, আমাকে মোড়ল না করতে?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'না।'

শিবুর মত বিচক্ষণ নয় ঝিঙে, কিন্তু সে শিবুর চেয়ে অনেক বেশী ঘড়েল। ভাবখানা করলে, 'ওঃ! শিবু যদি বলতো তবে তুমি আমায় ডাকতে না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'শোনো সদ্দার, শিবু সব-কথা বলে যাবার ফুর্সৎ পায়নি। পেলেও যে তোমার কথা বলতো, তাও তো জানিনে। আর ওর বলাতে না-বলাতে কিছু আসে যায় না। সে গেছে, এখন গাঁ চালাবো আমরা। ওর ইচ্ছে বড়, না, গাঁ-চালানো বড়? ও যদি বলে যেত, আনন্দী গাঁ চালাবে, তাহলে তোমরা কি সেটা মানতে?'

গুল বাহাদুরের মনে পড়লো হজরত মুহম্মদও ইহলোক ত্যাগ করার সময় মুসলমানদের জন্য কোন খলীফা নিয়োগ করে যান নি। গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন তবে কি অনুন্নত সম্প্রদায়ে এই ব্যবস্থাই বেশী কার্যকরী? তবে কি বংশগত রাজ্যাধিকার পরবর্তী যুগের সৃষ্টি? তারপর মনে পড়ল, ঐতিহাসিক ইবনে খলদূন তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে এই নিয়ে কি যেন এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভাবলেন, দেখতে হবে। তারপর মনে পড়লো, এখানে তো বই-পত্র কিছুই নেই। যাকৃগে, এসব-কথা।

ঝিঙেকে বললেন, 'কানাবুড়ী বাতাসীকে বলো সে এ-ভিটেয় থাকবে।'

ঝিঙে অবাক। বাতাসীর মত অথর্ব-অচল ঝগড়াটে সাড়ে ষোল

আনা অন্ধ এ তল্লাটে দুটি নেই। তার গলাবাজির চোটে দুঁদে মোড়ল শিবুও তার তল্লাট মাড়াতো না।

ঝিঙে গুল বাহাদুরের মতলব আদপেই বুঝতে পারে নি। তিনি জানতেন, শিবুর যে কিছু লুকনো টাকা আছে সেটা সকলের অজানা নাও হতে পারে। রাত্রে ভিটে খোঁড়ার জন্য চোর আসতে পারে। বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে না আসতে বুড়ী চিৎকার করে করে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জড়ো করে ফেলবে। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি চক্ষুষ্মানের চেয়ে বেশী। দিল্লীর জামি মসজিদের দেউড়িতে এক অন্ধ শুধু গলা শুনে হাজার লোকের জুতো সামলায়। মাদ্রাসার ছোঁড়াদের কেউ মজা দেখবার জন্য অন্যের গলা নকল করলে অন্ধ দু'জোড়া জুতো বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার জোড়া, আর এই নাও যার নকল করছিলে।' লোকে বলতো, আগ্রাতে শুকনো পাতা ঝরে পড়লে এ অন্ধ দিল্লীর চাঁদনি চৌকে বসে শুনতে পায়। বাতাসী অতখানি কেরদানী হয়তো দেখাতে পারবে না, কিন্তু দু'টি বেগুন বাঁচাবার জন্য যে বেটি সমস্তরাত দাওয়ায় বসে কাটায় তার চেয়ে ভালো পাহারাওলা পাওয়া যাবে কোথায়? এখন কয়েক রাত তো পাড়া-প্রতিবেশীরা কান খাড়া রেখে ঘুমুবে—শিবুর ভিটেতে খোঁড়া-খুঁড়ির শব্দ হচ্ছে কি না শোনবার জন্য। কয়েকটা রাত যাক্, তারপর তিনি সুবিধেমত তার ব্যবস্থা করবেন।

কিছুক্ষণের ভিতরই শোনা গেল পাড়ার শেষপ্রান্ত থেকে বাতাসীর চীৎকার। চিকনকালা গ্রামটাকে সে বেতারকেন্দ্র বানিয়ে বিশ্বভুবনকে জনাচ্ছে, শিবু গেছে, বেশ হয়েছে, আগে গেলেও কেউ মানা করতো না, বাতাসী তো নয়ই, কিন্তু এ কি গেরো, সে কেন সামলাতে যাবে শিবুর গোয়াল খামার, ঐ দিকধিড়িঙে মিনশে বাবাজীটা আছে কি করতে, তাকেই তো শিবু ঘটিবাটি চুলো-হাড়ি সব-কিছু দিয়ে গিয়েছে, মরে যাই, আর লোক পেল না, কোথাকার হাড় হাভাতে শতেক খোয়ারী—আরো কত কি!

গলার শব্দ কিন্তু এগিয়ে আসছে শিবুর বাড়ীর দিকেই।

মোগল শাসনেও চার্জ দেওয়া-নেওয়া নামক মস্করাটা চলতো। গুল বাহাদুর সে-মস্করাটা বাতাসীর সঙ্গে করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর ঘাড়েও তো মাথা মাত্র একটা। সেটা তো চায় ইংরেজ। বুড়ীকে দিলে চলবে কেন?

আনন্দীকে হাতে ধরে নিয়ে বললেন, 'চলো।'

যেতে যেতে আনন্দী বললে, 'দাদু, বাবা আমাকে বলেছিল, বাতাসী পিসিকে বাড়ী নিয়ে আসতে। সে তো বলছে, আসবে না।'

গুল বাহাদুর ভারি খুশী হলেন। প্রথমত শিবু যে আহাম্মুখ ছিল না, তার শেষ প্রমাণ পাওয়া গেল বলে এবং তারচেয়েও বড় কথা, ছ'বছরের আনন্দীর বুঝ-সমঝ আছে দেখে। বাপকা ব্যাটা না হলেও তার ঘোড়া তো নিশ্চয়ই। জোর গলায় হেসে বললেন, 'কুছ পরোয়া নহী, দাদু, ও-বেটি সব-কুছ সম্‌হালেগী' তারপর বললেন, 'সমহালেগা'। মনে মনে বললেন, 'তুচ্ছাই ভাষা, স্ত্রী লিঙ্গ, পুংলিঙ্গে ফারাক নেই।' তারপর বললেন, 'সেই তো ভালো। এরা তো তো আর দিল্লী দরবারে মুশায়েরা করতে যাবে না যে ভাষাতে পয়ষট্টি রকমের বয়নাক্কার প্রয়োজন। ঐ করেই তো আমাদের সব গেল।' তারপর মনে পড়লো, কই, তাই বা কেন? মাহমুদ বাদশা তো তাঁর সভাপণ্ডিত ফিরদৌসীর সঙ্গে বয়েৎ-বাজী করতেন। তাঁর রাজত্ব তো যায়নি। বাহাদুর শা গালিবের সঙ্গে করলেই বা কি দোষ! ফার্সীর কথাতে তখন মনে পড়লো, সে ভাষাতেও তো পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের তফাৎ নেই। বিরক্ত হয়ে তখন বললেন, 'কী আশ্চর্য! চলছি ডোম বস্তির মধ্যিখান দিয়ে, আর স্বপ্ন দেখছি, গজনীর। অন্‌-নশ্‌শার ও এর চেয়ে ভালো। আমাকে এখন দেখতে হবে, ছেলেটার পেটে ক্রিমি।'

গুল বাহাদুর পড়েছেন এ বাবদে বিপদে। ক্রিমির নুস্‌খা (প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন) তিনি দু'মিনিটেই লিখে দিতে পারেন। কিন্তু

সেটা লিখতে পারেন উর্দু কিম্বা ফার্সীতে। এবং তার জন্য যেতে হবে ইউনানী দাওয়াখানায় হেকিমের কাছে। এ তল্লাটে তো এসব জিনিস থাকার কথা নয়। আর বোষ্টম বাবাজী লিখবেন ফার্সী নুস্‌খা!—যদিও গুল বাহাদুর জানতেন, বৃন্দাবন অঞ্চলের বাবাজীরা ফার্সীতে ইউনানী নুস্‌খা বিলক্ষণ লিখতে জানেন।

গুল বাহাদুরের ভুল নয়। চৈতন্যদেব ইসলামী শাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একাধিকবার ইসলামী শাস্ত্র দিয়েই মোল্লাদের কাছে প্রমাণ করেন যে তাঁর প্রচলিত ধর্ম ইসলামের মৌলিক সিদ্ধান্তের সম্মতি পায়।

আনন্দী বললে, 'দাদু, ঐ দেখো হলদে পলাশ।'

ততক্ষণে তাঁরা গ্রামের বাইরে চলে এসেছেন। আর একটু দূরেই গুল বাহাদুরের 'রাজ-প্রাসাদ'।

দূরদূরান্তে চলে গেছে লাল খোয়াই। বাঁ দিকের উঁচু ডাঙা ভেঙে ভেঙে চলেছে খোয়াইয়ের অগ্রগতি। গুল বাহাদুরের আপন দেশ দোয়াবে প্রকৃতির হাত থেকে মানুষ অহরহ অনুর্বর জমি সওগাত পাচ্ছে চাষের জন্য, আর এখানে খোয়াইয়ের খাঁই আধা-বাঁজা আধা-ফসলের জমির উপর। খোয়াইটা চলে গিয়েছে কতদূরে প্রকাণ্ড একটা লাল সাপের মত একে-বেঁকে। মাঝে মাঝে ডাঙার ফালিটুকরো এসে যেন সাপের খানিকটে গতিরোধ করেছে। ফের যেন অজগরের গ্রাসটা আরো বড় হয়ে আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুও যেন এ খোয়াই শুষে নিতে জানে। খোয়াইয়ের শুরু থেকে সূর্যাস্তের মোকাম পর্যন্ত গাছপালার কোনো বালাই নেই। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের আলোটুকু এখানে এসে কোনো কালো কেশে পড়ে না। সাঁওতালিনীরাও সন্ধ্যের পরে ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।

কিন্তু মাধুর্য আছে—সে মাধুর্য রুদ্রের।

কিয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) যে বর্ণনা কুরান শরীফে আছে সেটিও

রুদ্রমধুর। আশ্চর্য! আল্লাতালা মানুষের মনে ভয় জাগাবার জন্য কিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন কুরানে, কিন্তু তার প্রকাশ দিয়েছেন কাব্যরসের মারফতে। কেন? সোজা কথা। ঐতিহাসিক যখন লড়াইয়ের খবর লিপিবদ্ধ করে কত হাজার লোক মরলো তার বর্ণনা দেয়, তাতে তো মানুষ ভয় পায় না। কারণ তাতে কাব্যরস নেই। ভয় অনুভূতি বিশেষ। সেটা জাগাতে হলে কাব্যরসের প্রয়োজন। ইতিহাসের শুকনো ফিরিস্তি থেকে মন করে জ্ঞান সঞ্চয়, তাতে ভয় সঞ্চার হয় না।

এই রুদ্র-রসই এখন গুল বাহাদুরের জন্য প্রশস্ত।

ভাগ্যিস, তাঁকে পূব বাঙলার ঘনশ্যাম, কচিসবুজ, শিউলিভরা, শিশিরভেজা, পানাঢাকা, বেতেসাজা পূব-বাঙলায় আশ্রয় নিতে হয় নি!

গাঁয়ের শেষ গাছ পেরিয়ে এসে তাঁর খেয়াল গেল আনন্দী যেন কি একটা বলেছে। শুধালেন, 'কি বল্‌লে, দাদু?'

পিছনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'ঐ যে, হলদে পলাশ!'

পলাশ হলদে হতে পারে, বেগ্‌নী হতে পারে, সবুজও হতে পারে, এই হল গুল বাহাদুরের ধারণা। কিন্তু তার মনে তবু ধোঁকা লাগলো। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আসবার সময় দু'চারটে ফুল গাছ তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু আনন্দী কিছু বলেনি। এখনই বা বলছে কেন? এ-গাছটার তেমন তো কিছু জৌলুসও নয়। মাত্র গোটা পাঁচ গুচ্ছা ফুল ফুটেছে। গাছটাও বেঁটে। যেন থাবড়া-মেরে চেপটে-দেওয়া। এর তুলনায় গাঁয়ের ভিতরকার শিমূলে তো ডালে ডালে ফুল ছিল অনেক বেশী। বল্‌লেন,

'পলাশ - উয়ো তো ফুল। হলদে—পিলা। তো ক্যা হ'ল?'

আনন্দী কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললো, 'সব পলাশ লাল, এটা হলদে।' বলে সে আঙুল দিয়ে গাঁয়ের ভিতরকার উঁচু উঁচু গাছের লাল পলাশ দেখিয়ে দিলে।

এতক্ষণে বীরভূমের বৃক্ষ-বৃত্তান্ত বাবদে আকাট অগা গুল বাহাদুরের খেয়াল হ'ল, 'তাই তো, আর সব পলাশ লাল, এটা হলদে।'

উদ্ভিদতত্ত্বে এই তাঁর প্রথম পাঠ। আনন্দীর কাছে! বললেন, 'চলো দুটি ফুল পেড়েনি।'

ছ' বছরের ছেলে আনন্দীর উল্লাসের অন্ত নেই। বাপ যদিও বলেছিল, 'বাবাজীকে ডরাসনি' তবু তার মন থেকে ওঁর সম্বন্ধে ভয় কাটেনি। একে তো গম্ভীর লোক, তার উপর ঐ যে দুশমনের মত বদ্‌মেজাজী ঝিঙেও যার পায়ের কাছে বসে ভয়ে কাচুমাচু তার সঙ্গে সাহস করে কথা কওয়া যায় কি প্রকারে। তবে তার শিশুবুদ্ধি শিশুযুক্তিতে একটা ভরসা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল। সেটা কি? বাবাজীও বাতাসী বুড়ীকে ডরায়। দ্বিতীয় ভরসা পেল এখন। যখন বললে, 'চলো দুটো ফুল পাড়ি।' তার বাপ তাকে ভালোবাসত। তার সম্বন্ধে আনন্দীর কোনো ভয় ছিল না, কিন্তু তাকেও ফুল কুড়তে বললে ঘাড় বাঁকিয়ে বলতো, 'যা যা, খেলা করগে যা।'

ফুল পাড়তে পাড়তে গুল বাহাদুরের মনে পড়ল, 'গুল' অর্থাৎ 'ফুল' আর প্রাচীন ফার্সীতে 'অপ্' অর্থ 'জল'। 'গোলাপ' আর 'জোলাব' একই শব্দ। আরবী ভাষার 'গ' আর 'প' নেই বলে আরবীতে 'গোলাপ' লেখা হয় 'জোলাপ'। বিরেচক অর্থে। ছেলেটাকে তাই খাওয়ালেই হবে। কিন্তু এই অজ জায়গায় গোলাপ পাওয়া যাবে কি?

আনন্দীকে শুধালে বহুদূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝালে ওখানে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-ভাবে ইশারা করলে তাতে সে দূরের গ্রাম হতে পারে, বেহেশ্‌তের গুল-ই-স্থান, ফুলের বাগানও হতে পারে।

॥ চার ॥

এতক্ষণে গুল বাহাদুর আসল ভাবনা নিয়ে চিন্তা করার ফুর্সৎ পেলেন। ছেলেটা নিশ্চিন্ত চেহারায় ঘুমুচ্ছে দেখে তিনি ফিরে গেলেন সকাল বেলাকার ঠেলে-রাখা সমস্যাগুলোতে।

শিবু মোড়ল বুঝতে পেরেছে তিনি বৈরাগী নন, তিনি যে মুসলমান সেটা জানতো না। কিন্তু আর কেউ বুঝতে পেরেছে কি? আর ঐ ঘোষালই বা কে? সেই বর্ধমানের ওপারের লোকটাই বা ওখানে এল কোথা থেকে? তাকেই বা খুঁজে পাওয়া যায় কি করে?

অনেক চিন্তা করেও তিনি কোনো হদীস পেলেন না। এমন কি ঘোষাল পদবী যে ডোমের হয় না, ওটা ব্রাহ্মণের পদবী এবং এতএব কাছে-পিঠে ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, অর্থাৎ শিক্ষা-সভ্যতার পত্তনও আছে এইটুকু পর্যন্ত গুল বাহাদুর বিচার করে ধরতে পারলেন না।

তবে শিবু যখন বলেছে সাবধান, তখন তার অর্থ তাড়াহুড়ো করলে বিপদের সম্ভাবনা। আর এখন তো বর্ধমান যাওয়ার কোনো কথাই ওঠে না। এদেশের আচার-ব্যবহার এ ক'মাসে শিখেছেন কতটুকুই বা? ডোমদের ভালো করে চিনে নিতে পারলে পরে ডোম সেজে চলা-ফেরা করা যাবে। তার আগে শিখতে হবে ওদের ভাষা। এ যাবৎ তাতেও তো খুব বেশী উন্নতি হয় নি।

আর এই ডোমদের নিয়ে তিনি করবেন নূতন গদর! দেশ কি, রাজা কারে কয়, ইংরেজ যে শয়তান ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণী নয়—এ-সব খবর তো এরা কিছুই রাখে না। পেটের ধান্দায় এদের কাটে সুবো-শাম। খুব যে তারা শান্ত এ-কথা বলা চলে না, কিন্তু জীবনমরণ পণ করে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে যাবার মত ধাতু কি এদের শরীরে আছে?

কিন্তু থাকবেই না কেন? গজনীর মাহমুদ, ঘোরের মুহম্মদের আমলে গ্রামাঞ্চলের পাঠানরা কি এদের চেয়ে বেশী সঙ্গীন জঙ্গীলাট ছিল? কিম্বা বাবুরের আমলে ফরগনা বদখশানের আশপাশের গামড়িয়ারা? কিম্বা হাতের কাছের মারাঠারা? একবার কি একটা সামান্য গুজোব রটাতে এই দিল্লী-বিজয়ী বীরের দল দিল্লী থেকে যেন পালাবার পথ পায় নি। ঐতিহাসিক খাফী খান ব্যঙ্গ করে লিখেছেন তখন দিল্লীর এক বুড়ী নাকি একাই তিনজন মারাঠাকে

নিরস্ত্র করেছিল। ঐতিহাসিক খুশ-হাল চন্দ্ ও বলেছেন, তারা নাকি তখন হাতিয়ার তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছোট বাচ্চার মত 'মাগো, ওমা' বলে শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু এসব কাহিনীর বিশ্বাস করা যায় কতটুকু? দিল্লী একদিন এদের হাতে খেয়েছিল মার? সেই বেইজ্জতী ঢাকবার জন্য পরবর্তী যুগে হয়তো তিলকে তাল বানিয়েছে।

তা বানাক, আর নাই বানাক, এরাই তো একদিন সাহস করে আবদালীর মুকাবেলা করেছিল। অবশ্য লড়াইয়ের আগের রাত্রে মারাঠা সেনাপতি ভাবসাহেব আপন রোজ-নামচায় লিখেছিলেন, 'আমাদের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে। কাল আমরা অবশ্য-মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। আমরা মারাঠারা তো কখনো সম্মুখ যুদ্ধ লড়িনি; আমাদের রণকৌশল, শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তার যথাসম্ভব ক্ষতি করে পালিয়ে যাওয়া—বারবার। সর্বশেষে তার সর্বস্ব লুট করা।'

এ সব-কিছু ভাবসাহেব সত্যই লিখেছিলেন কিনা, সে-কথা গুল বাহাদুর জানতেন না। তবে এ কথা জানতেন, মারাঠারা সম্মুখ সংগ্রাম সব-সময়ই এড়িয়ে চলে।

কিন্তু একথাও অতি অবশ্য ঠিক, ভাবসাহেব অবশ্য-মৃত্যু জেনেও আবদালীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধই লড়েছিলেন। কেন লড়েছিলেন? পেশওয়ার হুকুমে। তাঁর প্রতি আনুগত্য বশ্যতার দরুণ। তাঁর নূন-নেমক খেয়েছি। সে নুনের শেষ কড়ি শোধ না করে দেশের লোকের সামনে মুখ বের করবো কি করে? কিন্তু দিল্লীর বাদশার প্রতি বাঙালী ডোমের কি আনুগত্য, কি বশ্যতা?

তবে কি এদের তাতাতে হবে বাবুর কিম্বা মাহমূদের মত লুট-তরাজের লোভ দেখিয়ে? তার সরল অর্থ, দিল্লীর বাদশার খেদমৎ করতে গিয়ে তারা করবে দিল্লী লুট! এতো চমৎকার ব্যবস্থা!

তখন বড় দুঃখে তার মনে পড়লো, গদরের সিপাহীরাও বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র লুট-তরাজ করেছে। যাদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়েছে, লুট করেছে তাদেরই। কি মূল্য সে স্বাধীনতার!

গুল বাহাদুরের মাথা গরম হয়ে উঠলো। সুরাহীর জল ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলেন, 'যারা গদর ইন্‌কিলাব করে তারা অতশত ভাবনা-চিন্তা করে না। তিমুর নাদির বিজয় অভিযান আরম্ভ করার পূর্বে বূ আলী সিনা কিম্বা আবূ রুশদের দর্শন আর তর্ক শাস্ত্রের কেতাব-পুঁথি নিয়ে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেন না।'

ইংরেজ এ-দেশের দুশমন, এদেশের বাদশা'র দুশমন। তাকে খেদাতে হবে। কি ভাবে তাড়াতে হবে তার জন্য মোল্লা-মৌলবীর কাছ থেকে ফতোয়া আনবার প্রয়োজন নেই। তাহলে পাড়ার পদী পিসির কাছেও যেতে হয়। তিনি ইতু ঘেঁচুর পূজো-পাটা করে দিনক্ষ্যাণ বাৎলে দেবেন—তবে হবে অভিযান শুরু! তওবা, তওবা!! শয়তানের খুন পিনেওলা তলোয়ারকে পয়মন্ত করতে হবে চড়ুই পাখীর হ্যাজের পালক দিয়ে!

কিন্তু একটা জিনিস সর্বক্ষণ গুল বাহাদুরের মনকে পীড়া দিচ্ছিল। এই যে ছদ্মবেশ পরে আত্মগোপন করে থাকাটা এ ভাবে কাপুরুষের মত কতদিন প্রাণ বাঁচিয়ে থাকতে হবে? দেশ স্বাধীন করার জন্য একটা বড় আদর্শ সামনে ধরেছি বলে এই নীচ আচরণ সর্বক্ষণ হজম করে করে চলতে হবে? ডোমকে তাতানোর জন্য লুট-তরাজের লোভ কেউ দেখালে সেটা না হয় বরদাস্ত করে নিলুম কিন্তু নিজে একটা নীচ আচরণ করবো—এ-ঢেঁকি ঢোঁক গিলে হজম করি কি করে? তাও একদিন নয়, দু'দিন নয়—কত বছর ধরে কে জানে?

চুলোয় যাক্‌গে অত ভয়। চুলোয় যাক্‌গে শিবুর হুশিয়ারীর পরামর্শ। আমি বেরবো ঘোষালের সন্ধানে।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজে ডুব না মারলে চিন্তা করে করে পাগল হয়ে যাবো যে।

কাজও এসে হুড়মুড়িয়ে পড়লো তার ঘাড়ে।

শিবুর খেতখামার ছিল সামান্যই কিন্তু গুল বাহাদুরের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সে সব সামলাতে গিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন এক নূতন

ভুবনে। এটা ধরলে ওটা হাতছাড়া হয়ে যায়, ছাগল ছুটোকে সামলে গাইটা না-পাত্তা হয়ে যায়। মরাইয়ের ইঁদুর মারতে হলে বেরাল পুষতে হয়, বেরালকে পেট ভরে খেতে দিলে সে আবার ইঁদুর মারার প্রয়োজন বোধ করে না। পচা গোবরের গন্ধে মাথা তাজ্জিম তাজ্জিম করে, অথচ সে গোবর বরবাদ হবে তাও প্রাণ সইতে পারে না।

ইতিমধ্যে ঝিঙে এসে খবর দিলে একপাল সাঁওতাল কোশ-খানেক দূর নদীপারে আস্তানা গেড়েছে। ওদের দিয়ে একটা নূতন আবাদ করানো যায় কি না।

গুল বাহাদুর লম্ফ দিয়ে উঠিলেন। এ একটা কাজের মত কাজ বটে। এ-বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও আছে। ভাওলপুর না পাটিয়ালা কোথা থেকে একপাল মেয়ো এসে আশ্রয় নিয়েছিল পালমে যেখান বাবুর শাহের পাথরের তৈরী সরাঈ তারই পিছনে। তাঁরই চাচা দানিশ্‌মন্দ খান তাদের দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটা সুন্দর আবাদ। চাচার সঙ্গে থেকে থেকে তিনি তখন শিখেছিলেন অনেক কিছু। আজ দেখা যাবে চাচাকা ভাতিজা সে এলেমের কিছুটা স্মরণ রেখেছে কি না।

কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। শিবুর কলসীর তলায় পাওয়া গিয়েছে, শ' আড়াই টাকা। এত টাকা শিবু পেল কোথায়? তবে কি গুপ্তী ডাকাতি করতো? তা আসুক সে টাকা জহান্নম থেকে। ঐ দিয়ে আবাদ আরম্ভ করা যাবে অক্লেশে। তারপর বরাৎ। আল্লা ভরোসা।

প্রথম দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গুল বাহাদুর আনন্দীকে সেলাম করে বললেন, 'হুজুর, আজ থেকে আপনি জমিদার। আপনাকে সমঝে চলতে হবে।'

জমিদার হওয়ার রৌদ্ররস আনন্দী জানে না কিন্তু সে চালাক ছেলে। গুল বাহাদুরের মেজাজ আজ খুশ দেখে সে কোলের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, 'দাদু, আমাকে কেঁদুলির মেলায় নিয়ে যাবে?'

গুল বাহাদুরের প্রাণ যমুনায় তখন আনন্দের উজান তরঙ্গ লেগেছে। আনন্দী তখন শয়তানের জন্মভূমি বিলেত যেতে চাইলেও তিনি তখন ঘিনপিত বাদ দিয়ে সেখানে তাকে নিয়ে যেতেন। শুধালেন, 'সে কোথায় ?'

বললে, 'অন্নেক দূরে। ঐ হোথা অজয় দিয়ে।'

শীতের শেষে অজয়ের পারে কেঁদুলির মেলা। বাঙাদেশের হাজার হাজার বাউল সেখানে জমায়েৎ হয়ে তিনরাত ধরে আউল-বাউল-কেত্তন গান গায়। কেনা কাটাও হয় প্রচুর।

সেখানে গুলবাহুরের আরেক অভিজ্ঞতা।

এই যে হাজার হাজার ষণ্ডামার্কা লোক দিনরাত্তির ধেই ধেই করে নৃত্য করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে, কোনো কিছু করছে কম্মাচ্ছে না, সমাজের তোয়াক্কা করে না, ধর্মের নামে অকাতরে গরীব-দুঃখীর অন্নে ভাগ বসাচ্ছে, দরকারে অদরকারে একে অন্যে কামড়াকামড়ি পর্যন্ত করছে এ তামাশা তৈরী করলো কোন্ মহাজন? কার আদেশে এরা এসব করে, কার হুকুমে গৃহী এদের সব-কিছু জোগায়? এর কি অর্থ, কি মূল্য ?

অথচ গুলবাহাদুরের চট করে মনে পড়া উচিত ছিল যে মুসলমান পীর-দরবেশরাও ঠিক এই কর্মই করে থাকে, তাঁরই হীরের টুকরো দিল্লী শহরে—নিজামউদ্দীনের দরগায়, মেহেরৌলীর কুৎব্ সাহেবে, নাসির-উদ্দীন চিরাগ-দিল্লীর আস্তানায়। সেখানেও তো বাউণ্ডুলে খোদার খাসীরা ঠিক এদেরই মত ধেই ধেই করে নৃত্য করে। যীশুখৃষ্টের ভাষায় 'তারাও সুতো কাটে না, মেহন্নতও করে না।' এবং তাই শুধু নয়, এখানকার এই বাউলদের ভিতর আছে মুসলমানও।

ছেলেবেলা থেকে আপন ধর্মে যে সব জিনিস গা-সওয়া হয়ে

গিয়েছে, সেগুলো একটু ভিন্ন বেশে দেখা দিলেই মানুষ চমকে উঠে। তারপর হুশ হয়, দুটোই হুবহু এক বস্তু। এ-ও যা, ও-ও তা। কালীঘাটের পাঁঠা কাটাতে আর ইদগার পাশে গোরু জবায়ে তফাৎ কি? গুরুকে মাথায় তুলে তাকে অবতার বলা, আর পীরের পায়ে চুমো খেয়ে তাকে আল্লার নূর বলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া একই, একই, সম্পূর্ণ একই জিনিস।

গুল বাহাদুরের মনে যখন এ চৈতন্যের উদয় হল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাজ্জব মুল্লুক হিন্দুস্তান। এই এদের আমরা যুগ যুগ ধরে শির-তাজ, মাথার মুকুট করে পরে আসছি আর এদের মনের কোণে কণামাত্র উদ্বেগ নেই এদেশের লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে। এদের কাছে আমরা সব মায়াবদ্ধজীব (ফানী দুনিয়ার ক্রিমি) আমরা মরলেই কি, বাঁচলেই কি! ইয়া আল্লা মেহেরবান! তোমার কেরামতী বুঝে ওঠা ভার। এ-সংসার থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি মানব-জীবনের চরম আদর্শ হয় তবে এ-সংসারে তুমি তাকে পাঠালে কেন?'

হঠাৎ খেয়াল গেল, আনন্দী বাউলদের অনুকরণে ধুতীটাকে লুঙ্গীর মত কোমরে বেঁধে এক হাত উপরের দিকে তুলে অদৃশ্য এক-তারা ধরে নাচছে। দিলেন এক ধমক। শিবুর কথা মতো একে 'ভদ্রলোক' না হয় নাই বানালুম, কিন্তু—একে কখনো বৈরাগী হতে দেব না।

'কি রে আনন্দী, কি রকম আছিস্?'

গলা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখেন—বাঙালী বাবু। লম্বা লিকলিকে চেহারা, গৌরবর্ণ, সরু বাঁকা নাক, বাদামী—প্রায় নীলরঙের দুটি হাসি-হাসি চোখ, উপরের ঠোঁটটি চাপা—নিচেরটি ডপকী ছুঁড়িদের মত একটু পুরুষ্টু এবং রস-ভর-ভর, পানের লাল না এমনিতেই লাল ঠিক বোঝা গেল না, এক মাথা কোঁকড়া বাবরী চুল কিন্তু একেবারে রুক্ষশুষ্ক, পরণে কটকি জুতো, ধুতি, মেরজাই আর কাঁধের উপর বীরভূমী কেটের চাদর।

বললেন, 'এই যে বাবাজী, ঝিঙের মুখে তোমার কথা শুনলুম।'

গুল বাহাদুর অচেনার আগমনে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'বসুন।' মনে মনে ভাবলেন, 'ঝিঙের মুখে? তবে কি শিবু কিছু বলেনি!'

গদরের সেপাইদের মধ্যে একে অন্যকে পরিচয় দেবার জন্য গোপন সঙ্কেত ছিল হাতের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শরীরের কোন এক জায়গায়, কেমন যেন আনমনে আস্তে আস্তে চক্কর কেটে যাওয়া —তারা যে গোল চাপাটি দিয়ে খবর পাঠাতো তারই অনুকরণে। গুল বাহাদুর মাটিতে বসে তার আপন হাঁটুর উপর যেন বেখেয়ালে চক্কর আঁকতে লাগলেন।

বাবুটি চমকে উঠে আপনি হাঁটুতে একটা চক্কর এঁকেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চল।'

দুজনা নদীপাড়ের বটগাছ তলায় বসলেন।

পূর্ণিমা রাত্রি। সামনে, উঁচু পাড়ির অনেক নিচে অজয়ের ক্ষাণধারা। তার গতিবেগ প্রায় নেই। যেন মরা অজগর সাপ শুয়ে আছে। চাঁদের আলোতে তার আঁশ যেন চিক্‌চিক্ করছে। দু'একটি মেয়ে-ছেলে সেই আঁশ যেন আঁজলা-আঁজলা করে মাথায় মাখছে। তাদের কালো চুল থেকে ছোট ছোট ঝরণা চিক চিক করে ঝরে পড়ছে। জলের ওপারে বিরাট বালুচরের আরম্ভ। তারপর কাশের ঝোপ, নিচু পাড়, যাত্রীদের আস্তানা সব-কিছু চাঁদের আলোতে, ম্লান কুয়াশার হিমিকার গ্লানিতে মিশে গিয়েছে। মেলার কোলাহলকে শান্ত নদীর নৈস্তব্ধ্য এখানে গ্রাস করে ফেলেছে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ!'

'জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ! জিন্দাবাদ কুমার সিং!'

কুমার সিং?

॥ পাঁচ ॥

অনেকক্ষণ ধরে দুজনাই চুপ। একে অন্যের সঙ্গে এই তাদের প্রথম পরিচয়, কিন্তু বাহাদুর শাহ আর কুমার সিং যেন তাদের হাতে হাত, বুকে বুক মিলিয়ে দিলেন, যেন কত দিনকার পরিচয়। দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হলে মানুষ যেমন এক অন্যের নিঃশব্দ সঙ্গসুখ প্রথমটায় শুষে নেয়, এদের বেলা তাই হল।

একবার কথা আরম্ভ হলে সে-সুখ যেন ক্ষীণ হয়ে আসে।

গুল বাহাদুর বললেন, 'সব খতম!'

'সব খতম! কিন্তু আবার সব শুরু।'

দুজনায় আবার চুপ।

গুল বাহাদুর বললেন, 'আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আমার নাম—'

'থাক! নামের প্রয়োজন হলে পরে শুধিয়ে নেব। আমি ঘোষাল।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'বুঝেছি।'

আশ্চর্য হয়ে ঘোষাল শুধালে, 'কি করে?'

'শিবু বলেছিল। আমার কথা আপনাকে বলেনি?'

'না। বোধহয় সময় পায়নি।'

গুল বাহাদুর আপসোস্ করে মনে মনে ভাবলেন, 'এ রকম একটা বিচক্ষণ লোক চলে গেল। বেঁচে থাকে শুধু গাধা-খচ্চরগুলো।'

ঘোষাল বললেন, 'শোনো, আমার কথা সব বলি।'

এবারে ঘোষাল অতি বিশুদ্ধ উর্দুতে আপন বক্তব্য আরম্ভ করলেন।

'আমি ছেলেবেলায় পালিয়ে যাই বেহারে। সেখানে অনেক জায়গায় কাজকর্ম করি—এমন কি ইংরেজের সঙ্গেও। শিউরে ওঠো না। পরে বুঝবে। ওদের সঙ্গে কাজ না করলে আমি কখনো

এ-রকম গভীরভাবে বুঝতে পারতুম না, এরা কি বজ্জাৎ, কি ধড়িবাজ। কিন্তু সে-কথা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার দরকার এখন নেই। তুমি ফার্সীতে যে-সব বই পড়েছ, আমিও পড়েছি সেগুলোই। আমরা ব্রাহ্মণ কিন্তু আমাদের বংশে বহুকাল ধরে চলে আসছে ফার্সীর চর্চা। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম ইতিহাস চর্চার ফলে নয়। আমার পূর্বপুরুষেরা পাঠানদের হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন পূব বাঙলায়। হেরে গিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নেন, বীরভূমে। জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরঙ্গজেব—ব্যস্—মাত্র এই তিন বাদশার আমলে বাঙলা পরাধীন ছিল, অর্থাৎ দিল্লীর হুকুম মাফিক চলেছে। তারপর আমরা আবার সরকারী কাজ করেছি। তারপর এল ইংরেজ। পলাশী থেকে এই এক'শ বছর আবার আমরা বাড়ী থেকে বেরই নি।'

গুল বাহাদুর অনেক কিছুই জানতেন না। এই ন'মাস ধরে তিনি চিনেছেন শুধু ডোম আর সাঁওতালদের। এদেশেও ব্রাহ্মণ আছে, এ-কথা তিনি মোটামুটি জানতেন। কিন্তু তারা যে গদরে লড়ে এ-খবর তাঁর জানা ছিল না—দিল্লীর ব্রাহ্মণেরা পরে চুড়ীদার পাজামা, লম্বা শেরওয়ানী, আর মাথায় কিস্তিটুপি। তারা করে পুরুতের কাজ। বিয়ে-শাদীতে এসে মন্ত্রফন্ত্র পড়ায়—তাও সে-মন্ত্র কাগজে লিখে আনে ফার্সী হরফে! তারা আবার লড়াই করে কি করে? লড়াই তো করে রাজপুতরা, মারাঠারা, ক্ষত্রিরা · তা সে যাক্‌গে। তার মনে তখন লেগেছে আর এক ধোঁকা। শোধালেন,

'তোমরা কি শুধু বাঙলার স্বাধীনতা চাও? বাহাদুর শাহকে শাহ-ইন-শাহ বলে মানো না?'

ঘোষাল বললেন, 'ঐ তো আরম্ভ হয়ে গেল, হিন্দুস্থানবাসীদের ঝগড়া-কাজিয়া। এ-সব কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের ভিতরে মিল বেশী, অমিল কম। যদি খুশী হও, তবে না হয় মেনেই নিলুম তোমার বাহাদুর শাহকে। কুমার সিংকে তো

মেনেছিলুম। তোমাকেও মানছি। সবাইকে মেনে নেব—দরকার হলে, এবং হবেও। তুমি কি মনে করো, আমরা জিতলে সেই পুরনো মোগলাই রাজত্ব আসবে—বাহাদুর শাহকে বাদশা করতে পারলেও? না, বাবাজী, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে। বাবুর বাদশার মত রাজত্ব বাহাদুর কখনো করেন নি, আর কখনো কেউ পারবে না।'

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'আপনারা হেরে গেলেন কেন?

ঘোষাল হাতজোড় করে বললেন, 'ঐ একটি প্রশ্ন শুধিয়ো না। এর উত্তর দিতে গেলে আবার নূতন করে সেই মর্মন্তুদ পীড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, যা ভুলতে পারা একটা জীবনের কর্ম নয়। কোন্ কোন্ ভুল না করলে আমরা জিতে যেতুম সে প্রশ্নও তোলো না। আমি নিশ্চয় জানি, সে ভুলগুলো না করলে পরে অন্য ভুল করতুম। না, বাবাজী, গলদের মূল উৎস কোথায় ছিল তখনো বুঝতে পারিনি, এখনো পারিনি। আমরা এখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো ওদিক দিয়ে জল বেরিয়েছে, সেখানে পাথর চাপা দিয়েছি তো অন্য দিক দিয়ে বেরিয়েছে। সর্বাঙ্গে ঘা, মলম লাগাই কোথায়?'

'এখন তবে কর্তব্য কি?'

ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'বিলকুল কোনো ধারণা নেই। এখনো মনে মনে জমা-খরচ মিলোচ্ছি। তুমি এসেছো, ভালই হয়েছে। দিল্লী ফিরে যাচ্ছো না তো?'

প্রশ্নটা যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করা হল। ঘোষালই জানতেন এর উত্তর কি? গুল বাহাদুরও কোনো কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ঘোষাল বললেন, 'ছদ্মবেশটা মন্দ ধরনি। বাঙলাটাও খুব যে মন্দ শিখছো তাও নয় কিন্তু ডাহা ডোম-ডুমে। এই বেলা ওটাতে লেখা পড়াও আরম্ভ করে দাও। নিজেই করে নিতে পারবে। কোন ভাবনা নেই। ওতে সাহিত্য বলে কোনো বালাই নেই। আশ্চর্য, সাত শ' না আটশ বছর ধরে বাঙলাতে বই লেখা আরম্ভ

হয়েছে অথচ এক গণ্ডা কবি বেরোয় নি যাদের ইরানী কবিদের সামনে দাঁড় করানো যায়। ফার্সীতে তিন শ বছর যেতে না যেতেই ফিরদৌসী, হাফিজ, সাদী, রূমী, আত্তার, নিজামী, আরো কত কে?'

গুল বাহাদুর মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'বাঙালীরা হয়তো মনে করে, তাদের কবি হাফিজ সাদীর চেয়ে বড়।'

ঘোষাল তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তা করতে পারে। সাঁওতালরা হয়তো মনে করে, তাদের তীর ধনুক নিয়ে বন্দুক কামানের সঙ্গে লড়া যায়।'

তুলনাটার ঢপ দেখে গুল বাহাদুর একটু হাসলেন।

ঘোষাল বললেন, 'হাসলে? তা হাসো। আমারও বলার বিশেষ হক্ক নেই। আমিও তেমন কোনো চর্চাও করিনি। কিন্তু জানো, সাত শ বছর বাঙলা চর্চা করার পর তারা গদ্য লিখতে আরম্ভ করেছে এইমাত্র সেদিন। পঞ্চাশ বছরও হয় নি। ঐ যে রাজা রামমোহন রায়—'

গুল বাহাদুর চমকে উঠে বললেন, 'কে?'

'রাজা রামমোহন রায়। চেন না কি?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পিতার কাছে শুনেছি, বাদশা দুসরা আকবরের চিঠি নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। আমি তো শুনেছি, উনি জানতেন অতি উত্তম ফার্সী এবং আরবী।'

ঘোষাল বললেন, 'তা তিনি জানতেন। এদেশের মুসলমান পণ্ডিতরা তাঁকে নাম দিয়েছেন "জবরদস্ত মৌলবী"।' তারপর একটু অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'লোকটা মৌলবীই বটে। ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখে। ফার্সীতে একটা লিখেছে। আমার কাছে বোধ হয় এখনো আছে। কিন্তু ধর্মে আমার রুচি নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তাজ্জব কী বাৎ, লোকটা দেশের সবাইকে ইংরিজি শেখাতে চায়। 'সে কি?'

'আশ্চর্য! আরবী ফারসীর রস চেখেছে, শুনেছি ইবরানী সুরয়ানী

ইস্তেক(হিব্রু, সিরিয়াক্) জানে—তারপর এই রুচি ! ইংরেজ ব্যাটারা তো পায়খানা ফিরে জল পর্যন্ত—থাক্‌গে। জানো, বাবাজী, এক ব্যাটা ইংরেজের সঙ্গে আমাকে একদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত নাড়ানাড়ি করতে হয়েছিল। হাতে যেন এখনো গন্ধ লেগে আছে। বেসন দিয়ে কত মেজেছি, ঝামা দিয়ে তার চেয়েও বেশী ঘষেছি।'

বলে ডান হাতখানা অতি সন্তর্পণে নাকের ইঞ্চি তিনেক সামনে ধরে দু'বার শুঁকে বলে উঠলেন, 'তৌবা, তৌবা ! এখনো গন্ধ বেরুচ্ছে।'

গুল বাহাদুর সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আমিও পাচ্ছি। তা ঐ অপকর্ম করতে গেলেন কেন ?

'সাধে ? ঐ করে তো সম্বন্ধীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আর পাঁচজনের চোখের আড়াল করলুম।' ঘোষাল চুপ করে গেলেন।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'তারপর ?'

ঘোষাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস সুরে বললেন, 'তারপর কে কোথায় যায় সে তো আল্লাই জানেন। কেউ যায় বেহেস্তে, কেউ যায় দোজখে, কেউ যায় বৈকুণ্ঠে, কেউ যায় কৈলাসে ?'

'সে আবার কোথায় ?'

'বাবাজী, ধরা পড়া যাবে। বৈকুণ্ঠটা কোথায় সেটা অন্তত তোমার জানা উচিত। বাবাজীরা মরে গেলে বৈকুণ্ঠে যায়—নামাবলীর কার্পেট পেতে তারি উপরে বসে। আরব্য রজনীতে যে-রকম আছে। কিন্তু থাক ওসব। ধর্মে আমার রুচি নাই—তোমাকে তো বলেছি।'

অনেকক্ষণ পর গুল বাহাদুর শোধালেন, 'ইংরেজ মেরেছেন ; ইংরেজ আপনাকে তালাশ করছে না ?'

'তা করছে, কিন্তু আমি ইংরেজ মারলুম কখন ?'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এই যে বললেন।'

'তাজ্জব বাৎ শোনালে ! আমি বেটাকে নিয়ে গেলুম যেখানে

তার বরাতে লেখা ছিল যাবার। তারপর আমাদের সেপাইরা তাদের কাজ করলে। আমি কি জল্লাদ ?'

'আপনি তবে কি করতেন ?'

'আমি ? আমার কাজ ছিল তাপ্পা, রিপুকর্ম। আজ বন্দুক নেই, জোগাড় করো। কাল বারুদ নেই, ঠ্যালা সামলাও। পরশু খোরাক নেই, আমার নাভীশ্বাস। আরো কত কি ? লুঠের মাল বখরা করা, গাঁয়ের লোককে মিথ্যে দিব্যি-দিলাশা দিয়ে তাতানো, চিঠি জাল করা—'

'সে আবার কি ?'

'ইংরেজের গুপ্তচর আমাদের সেপাইদের ভিতর জাল চিঠি পাচার করালে, যেন সে-চিঠি কুমার সিং ইংরেজকে লিখেছেন আত্ম-সমর্পণ করে, অবশ্য তাঁর ধনপ্রাণ যেন রক্ষা হয় এই শর্তে। আমি তখন পাল্টা চিঠি জাল করাতুম, ইংরেজ আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে। সেটা চালিয়ে দিতুম আমাদের সেপাইদের ভিতর। কিন্তু ইংরেজ সেপাইদের ভিতর ভিতর এরকম জালিয়াতি আমরা করতে পারিনি। অতখানি বাড়িয়া ইংরিজি লেখা জাল করনেওলা আমাদের ভিতর কেউ ছিল না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তাই বোধহয় রাজা রামমোহন আমাদের ইংরিজি শেখাতে চান।'

ঘোষাল গোস্‌সাভরে বললেন, 'কচু হবে ইংরিজি শিখে। যেন ইংরিজি চিঠি জাল করতে পারলেই আমরা গদর জিতে যেতুম। যেন কাঠবেরালির ধূলো, না হলে—থাক্‌গে—ওসব কেচ্ছা তুমি জানো না।'

চাঁদ অনেকখানি ঢলে পড়েছে। বাউলদের গীতও ঝিমিয়ে এসেছে। নদীর জলের রূপোলি ঝিকিমিকি লোপ পেয়েছে, কিম্বা সরে গিয়েছে। ওপার থেকে পাড়ি দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস তুজনার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কিম্বা হয়তো গদরেরই দীর্ঘনিঃশ্বাস, হায়হায়, আপসোস্‌।

গুল বাহাদুর বললেন, 'যাক্। তবু ভালো। আমি তো শুনেছিলুম, কুমার সিং সত্যি আত্মসমর্পণ করে ইংরাজকে চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো তাহলে জাল।'

ঘোষাল হেসে বললেন, 'সব-কটা জাল হতে যাবে কেন? কিছু সত্যিও ছিল।'

গুল বাহাদুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি?'

'নিশ্চয়। যখন দেখলুম, ইংরেজ জাল চিঠি চালাচ্ছেই তখন আমরাও ইংরেজকে দুচারখানা লিখে পাঠালুম। নানা রকম ভুল খবর দিয়ে। নিছক ধাপ্পা মারার জন্য। ঝাঁসীও তাই করেছিলেন।'

'কিন্তু এতে করে যে পরে দেশের লোকের মনে ভুল ধারণা হল, কুমার সিং সত্যি সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে ভুল ধারণা সরাবে কে?'

'দেখ, বাবাজী, গদর জিতলে এ ভুল ধারণা থাকতো না। আর হারলে তো গাল খাবই। তখন কাজ ছিল লড়াই জেতা। তার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেছি। হেরে গিয়েছি সেইটে হ'ল সবচেয়ে বড় গাল। তার উপর এ-বদনাম তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। এবং তারচেয়েও বড় কথা, "পকড়ে তলওয়ার দামনকো সম্‌হালে কোঈ"? তলোয়ার নিয়ে হামলা করার সময় রক্তের ছিঁটে পড়ার ভয়ে কেউ তো কূর্তার অঞ্চল সামলায় না—অর্থাৎ একবার মন স্থির করবার পর ছোট-খাটো চিন্তা করতে নেই।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সে তো বিলকুল ঠিক। কিন্তু, ইংরেজ আপনার সন্ধান পাবে কি না, সেও কি ঐ পর্যায়ের?'

ঘোষাল বললেন, 'প্রায় তাই। কিন্তু আসলে কি জানো, বাবাজী, বেঁচে থাকার উপর আমি খুব বেশী দাম দিইনে। এই গদরে চলে গেল মানুষগুলো, আর বেঁচে রইল যারা, তাদের আমি দোষ দিইনে, কিন্তু তাদের নিয়ে আমি করবো কি? ঝড়ে মোটা আমগুলো ঝরে পড়ে সে তো জানা কথা। আমি নিজে অত্যন্ত সামান্য প্রাণী কিন্তু

ঐ মহাজনদের সম্পর্কে এসে আমি কয়েক দিনের জন্য কি যে হয়ে গিয়েছিলুম তোমাকে বোঝাই কি প্রকারে? আমি যেন রোগা-পটকা হাড্ডিসার গঙ্গাযাত্রায় জ্যান্ত মড়া হয়ে যাচ্ছিলুম উদ্ধারণপুরের ঘাটে। আমার ঘাড়ে এসে করলে ভর এক উড়োনচণ্ডী দানো। আমি উঠলুম লম্ফ দিয়ে, মড়ার খাটিয়া ছেড়ে, আর তারপর সে কি তিড়িং বিড়িং ভূতের নৃত্য করলুম ক'দিন। তখন আমি সব জানি, সব পারি। ঐ আনন্দী ছোঁড়াটা তখন যদি আমাকে আব্দার করতো, 'দাদু বেহেস্ত থেকে এনে দাও না আমাকে খুদা তালার কুর্সী-খানা,' আমি তা হলে একগাল হেসে বলতুম, 'রঃ! ডাঁড়া! এনে দিচ্ছি, এ আর এমন কি চাইলি?' তারপর দিতুম এক আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ। স্বপ্নে যে-রকম মানুষ মিন-পাখনায় পায়ের কড়ে আঙ্গুলে অল্প একটু ভর দিলেই হুশ করে উড়ে গিয়ে ঠুকে যায় তার মাথা চাঁদের বুড়ীর চরকাতে।

জানো, বাবাজী, এ যেন স্বপ্নের মাঝে সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে আল্লার পায়ের কাছে ফেরেশ্‌তা বনে যাওয়া। আর আমার চতুর্দিকে কুমার সিং আর তার সঙ্গী-সাথী। কী সব বাঘ, কী সব সিংহ! আমার যেন সবাই অন্ধ-প্রদীপ আপন আপন সেজে পলতের মতো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলুম। এল কুমার সিঙের দীপ্ত দীক্ষা। তাঁর আলো আমাদের—এক একজনকে স্পর্শ করে, আর আমরা প্রদীপ-শিখার মত জ্বলে উঠি। আবার আমাদের শিখা জ্বালিয়ে দেয় অন্য প্রদীপ। তাই বলছিলুম, এ তো দীপ্ত-দীক্ষা—এতে স্পর্শদীক্ষা নয়, সে তো সামান্য জিনিস। পরশ পাথরের স্পর্শ লেগে লোহা হয় সোনা, কিন্তু সে সোনা তার পরশ দিয়ে অন্য লোহাকে সোনা করতে পারে না,—তাই তার নাম স্পর্শ-দীক্ষা, তার মূল্য আর কি?

সে কী দেয়ালি জ্বালিয়েছিলুম আমরা!

আর আজ, অন্ধকার অন্ধকার সব অন্ধকার।'

হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই ঘোষাল দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

গুল বাহাদুর স্তম্ভিত। বয়স্ক লোক, বিশেষ করে ঘোষালের মত কট্টর গদর-প্রাণ লোক যে এ রকম বে-এক্তেয়ার হয়ে যেতে পারে, তিনি তার জন্য তৈরী ছিলেন না। গুল বাহাদুর তখনো জানতেন না, বাঙালী কতখানি দরদী, ভাবালু, অনুভূতিপ্রবণ। তিনি চুপ।

ঠিক যে রকম হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন সেই রকমই হঠাৎ মাথা তুলে হেসে বললেন, 'কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দেবে সেই ইংরেজেরই ভূত।' বলে ডান হাতখানা নাকের কাছে এনে বার দুই শুঁকে বললেন, 'তৌবা, তৌবা, এখনও গন্ধ বেরুচ্ছে।'

পূর্বের মত গুল বাহাদুর মমতামাখা সুরে বললেন, 'আমিও পাচ্ছি।'

ঘোষাল উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তবেই বোঝো ঠ্যালা। ঐ ইংরেজ ব্যাটার ভূত এসে ভর করেছে আমার পাঁচ আঙুলে। তারই বোটকা গন্ধ ডেকে আনবে আর পাঁচটা ইংরেজকে, ধরিয়ে দেবে আমাকে। না হলে কে জানবে বীরভূমের ঘোষাল আরা জেলার মহব্বৎ খান! ভূতই শুধু সব-কিছু জানতে পারে।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'ইংরেজ মাত্রই জ্যান্ত ভূত। মরে গিয়ে তার আর হের-ফের হয় না।'

ঘোষাল একেবারে ছেলে মানুষের মত আরো যেন উৎসাহ পেয়ে বললেন, 'যা বলেছ, গোঁসাই। হিন্দু মরে গিয়ে হয় ভূত, মুসলমান মরে গিয়ে হয় মামদো। তাই কথায় কয়, 'ভূতের উপর মামদোবাজী।' অর্থাৎ হিন্দুর উপর মুসলমানের কেরদানী। কিন্তু মামদোর উপর অন্য ভূত কই? সে রকম কোন প্রবাদ তো এখনো হ'ল না। তাহলে বাহাদুর শা'র উপর শেষ পর্যন্ত উপর-চাল মারতে পারবে না তো ইংরেজ। বাবাজী, তোমারই জিৎ। জিন্দাবাদ বাহাদুর শাহ্!'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি যে বলেছিলে বাঙলাতে কিছুই নেই। কিন্তু 'ভূতের উপর মামদোবাজী' তো খাসা প্রবাদ।'

ঘোষাল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'একেবারে কিছু নেই সে-কথা বলবো

কে ? একটা জিনিস আছে সেটি মহা মোক্ষম। বাঙলার কেত্তন। 'হরিবোল, হরিবোল' বলে নাচন কুদন নয়। পদকীর্তন। ওর মত জিনিস হয় না। ঝাড়া পাঁচশ বছর ধরে হাজার হাজার বাঙালী তার প্রেমের গীত আপন গলায় গায়নি—গেয়েছে রাধার গলা দিয়ে, কিংবা কৃষ্ণের বাঁশীর ভিতর দিয়ে। ফার্সীতে প্রেমের গান গাওয়া হয়েছে লায়লী মজনূ, শীরীন ফরহাদ, ইউসুফ জোলেখার ভিতর দিয়ে—দেখতেই পাচ্ছো, বিস্তর বখরাদার, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, প্রেমটা তেমন জম-জমাট ভর-ভরাট হয়নি। তাই কীর্তনে পাবে ঠাস-বুনোট। তার গোড়াপত্তন হয় এই খানেই, এই কেঁদুলীতেই—তবে সংস্কৃতে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে। আমি শুনেছি। বিশেষ ভালো লেগেছে, বলতে পারবো না। বড় কথার ঝলমলানি। আমি সংস্কৃত বুঝিও না। কিন্তু বাঙলায় পেয়েছে ঐ বস্তুই তার আসল খোলতাই। হ্যাঁ মনে পড়লো, মুসলমান কীর্তনিয়াও বিস্তর আছে। তারই একজন আমাদেরই পাশের সৈয়দ মরতুজা।'

গুল বাহাদুর এ নামটি ভালো করে মনে রেখেছিলেন, শিবু মরার সময় তাঁকে বলে গিয়েছিল বলে। বললেন, 'এঁর নাম শুনেছি' শিবুর কাছে। তাঁরই কে যেন কি—আনন্দী তাঁর নাম, তাঁর মেহের-বাণীতে পেয়েছিল বলে শিবুর ছেলের নাম আনন্দী।'

ঘোষাল বললেন, 'তাই বলো। আনন্দ নাম হয়, কিন্তু ডোম পাড়াতে আনন্দী নামের হদিস আমি এতক্ষণ পাইনি। তা সে কথা পরে হবে। এখন শোনো, এই কেত্তন গান বোষ্টমদের জান-প্রাণ। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রায়ই হয়। তুমি এলে কেউ কিচ্ছু ভাববেই তো না, উল্টে তোমার গোঁসাইগিরী আরো ফলাও হয়ে ফুটে উঠবে।'

গুল বাহাদুর একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'আমি তো ওসবের কিছুই জানিনে।'

জানবে আবার কি ? বসে বসে মাথা নাড়বে, আর মাঝে মাঝে

আহাহা করে উঠবে। তোমাকে তো আর গাইতে হবে না। মুসলমানদের কাওয়ালীতে যখন হিন্দু হম্‌দ্‌ ও নাৎ (আল্লা রসূলের প্রশস্তি) শুনতে যায় তখন তারা সে গীতে পোঁ ধরে নাকি? বেন্দাবনের বাবাজী বসে আছেন, ঐ তো ব্যাস্‌। আর হজরৎ মুহম্মদই তো বলেছেন, 'মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা গুণীর নিদ্রা শ্রেয়ঃ।' কেত্তন চলে অনেক রাত অবধি। ভালো কেত্তনিয়া হলে তো কথাই নেই—ভোর অবধি। কথা-বার্তা তখন হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ঘোষাল দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর কীই বা আছে কথা-বার্তা বলার।'

এ-রকম নৈরাশ্য গুল বাহাদুরের সয় না। বললেন, 'অতো কাতর হয়ো না বাবুজী। আল্লার উপর একটু বিশ্বাস রাখতে শেখো।'

ঘোষাল হেসে বললেন, 'আমি তো বিশ্বাস রাখি গোঁসাই, কিন্তু আল্লা যে আমাকে বিশ্বাস করলেন না। গদরের মেওয়া তো আমার কোঁচড়ে ফেললেন না। আচ্ছা। এখন তবে আসি।'

গুল বাহাদুর ফার্সীতে, চাপান বললেন,

'দুঃখ করো না, হারানো ইসুফ
কিনানে আবার আসিবে ফিরে।'

ঘোষাল ওতর হাঁকলেন, 'দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥'

কেঁদুলি থেকে ডুব সাঁতারে চিকনকালা গাঁয়ে পৌঁছন যায়। সন্ধ্যার সময় গোরুর গাড়ীতে উঠে দোলানী-ঝাঁকুনির ভিতর নিদ্রা—সকালবেলা চিকনকালা। সন্ধ্যার সময় চাঁদ থাকবে পায়ের দিকে, ঘুম ভাঙলে দেখবে, তিনিও ডুব সাঁতার মেরে চিকনকালা গাঁ পেরিয়ে পশ্চিমাকাশে ডুবুডুবু।

গুল বাহাদুর ভেবেছিলেন, সন্ধ্যার সময় রওয়ানা দেবেন, কিন্তু ঘোষালের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে যখন রওয়ানা হলেন তখন রাত প্রায় কাবার। দিনের বেলা গরমে গোরুদুটোর কষ্ট হবে, কিন্তু গাড়োয়ান গণি মিয়া বললে, বরঞ্চ দুপুরের গরম্‌টা গাছতলায় কাটানো যাবে, কিন্তু এখানে আর থাকা নয়, ওলা বীবীর দয়া হয়েছে, অর্থাৎ কলেরা আরম্ভ হয়েছে।

ওলা বীবী! সে আবার কি! গণি মিয়া পণ্ডিত নয়, তাই ঘোষালের মত এর কথায় সব-কিছু বলে দিতে পারলো না। অনেক সওয়াল করার পর বেরল, শেতলা মনসার মতো ইনি ওলাওটার দেবী কিম্বা বীবী। কিন্তু আর সব দেবী যখন হিন্দুর মৌরশী পাট্টা, তখন ইনিই বা মুসলমানী হয়ে বীবী খেতাব নিলেন কেন?

গুল বাহাদুর জানতেন না, বাঙলা দেশ তাজ্জব দেশ। ভাগ্যিস তিনি তখনো দখিন বাঙলায় যাননি। সেখানে তাহলে আলাপ-পরিচয় হ'ত জলের দেবতা বদর পীরের সঙ্গে, 'বড়মেঞা' ওরফে বাঘের দেবতা গাজী পীরের সঙ্গে।

এই ঘোষালের সঙ্গেই আলাপ করে তিনি যত না শিখলেন তথ্য তার চেয়েও বেশী প্রশ্ন। যথা ;—

এ দেশের খানদানীরাও কিছু কিছু তাহলে গদরে যোগ দিয়েছিল কিন্তু প্রশ্ন, সে কি শুধু বাঙলা দেশের বাইরে? দেশের ভিতর অন্য খানদানীদের মতিগতি তা হলে কি? তারা যদি ইংরেজকে এ-দেশ থেকে খেদাতে না চায় তবে তো কোনো-কিছু করা অসম্ভব, কারণ তারা যদি নেতৃত্ব না নেয় তবে ডোম চাঁড়ালেরা কি আপন হিম্মতে নয়া গদরের তাজা ঝাণ্ডা উঁচু করতে পারবে? তারপরের প্রশ্ন, এই খানদানী অর্থাৎ বামুন এবং চাঁড়ালদের ভিতর কি অন্য কোনো সম্প্রদায় নেই? দিল্লীতে যে রকম ব্রাহ্মণ আর বেনের মাঝখানে আছে ক্ষত্রিয়রা? আর দিল্লীর ব্রাহ্মণ আর এখানকার ঘোষাল ব্রাহ্মণেই বা মিল কোথায়? দিল্লীর বামুনরা তো করে স্রেফ

পুরুতগিরি, এ বামুন তো একদম 'আগ-খুর্' অর্থাৎ আগুন-গিলনেওলা। কিন্তু মারাঠি ব্রাহ্মণ পেশওয়ারাও তো পুরুতগিরি করে না। তবে কি তারা হাতিয়ার নেয়, না শুধু আড়ালে বসে কল-কাঠি নাড়ে?

আনন্দীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুল বাহাদুর ভাবলেন, এসব জাত-বেজাৎ তার তাদের ফ্যাচাঙ-ফেউ শিখতেই তো কেটে যাবে একটা আস্ত জীবন। তা আর কি করা যায়, অন্য কোনো পন্থা যখন আর নেই। আরব্য উপন্যাসের জিনও তো বোতলের ভিতর বন্ধ হয়ে কাটিয়েছিল, তিনশ' না চারশ' বছর। পরমাত্মার কৃপায় তবু তো তিনি মুক্ত—অন্তত বোতলের জিন্নির তুলনায়।

দূরের শালবনের ফাঁকে কে যেন ছোট্ট একটি আগুন জ্বালিয়েছে। না, সূর্য ঠাকুর ঘুম ভেঙে চোখ কচলে কচলে লাল করে ফেলেছেন? আকাশে চাঁদের আলো কখন মিললো, সূর্যের আলো দেখা দিল তিনি লক্ষ্যই করে নি। পূব থেকে একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস এগিয়ে চলেছে পশ্চিমপানে দেবতার পায়ে পেন্নাম করতে। কিন্তু এ দেবতা বড়ই জাগ্রত বদমেজাজী পীর! ভক্তকে অভ্যর্থনা জানান ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে। পূব বাঙলা থেকে বেরিয়ে-আসা এই তীর্থযাত্রী পূরবিয়া হওয়াকে তিনি আদর করে গায়ে মাখেন না, উল্টে ছেড়ে দেন পচ্ছিমিয়া গরম বাতাস। আল্লাওয়ার্দী খানের আমলের মারাঠা দস্যুর মত তারা পশ্চিম দিগন্ত থেকে আসে ঝড়ের মত হু হু করে, ঘোড়ার খুরে বালি পাথর শুকনো পাতার হাজারো দ' জাগিয়ে দিয়ে। একেবারে আকাশ-জোড়া নিরন্ধ্র, তমসাঘন, সূর্যাচ্ছাদিত একচ্ছত্রাধিপত্য।

দানিশপুর গাঁ ডাইনে রেখে চিকনকালা যেতে হয়। সে গাঁয়ের বাইরে আসতে না আসতেই গাড়ীর উপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল চৌষট্টি পবন মারাঠাদের চৌষট্টি হাজার হর্স-পাওয়ার নিয়ে।

সামাল সামাল বলতে না বলতেই, গোরু, গাড়োয়ান, গুল

বাহাদুর খান কারো কোনো খবরদারী হুশিয়ারীর তোয়াক্কা না করে গাড়ী ঢুকলো দানিশপুর গাঁয়ের ভিতর। তারপর বাঁ দিকে চক্কর খেয়ে শিমূল পলাশ মহুয়ার আড়ালের এক আঙ্গিনায় গিয়ে ছিটকে ফেলে দিলে আনন্দী, গুল বাহাদুর গণি মিয়া মায় দুটো গোরুকে একে অন্যের ঘাড়ে মায়ের সুপুত্তুর যে রকম বস্তা বস্তা চাল ডাল নূন চিনি আঙ্গিনায় আছাড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে কয়, 'দেখো, মা, তোমার জন্যে কি এনেছি।' কোথায় লাগে এর কাছে পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বাড়ী এনে মাতা কুন্তীকে আনন্দ সংবাদ জানানো!

চতুর্দিকে, আকাশ বাতাসে তখন লাল ধূলো-বালির ভূতের নৃত্য। ঝড়টা এমনি অসময়ে এবং অতর্কিতে এসে আক্রমণ করেছে যে ধূর্ত বায়সকূল পর্যন্ত আশ্রয় নেবার ফুর্সত পায়নি। সেই ঝড়ের তীব্র শিটির শব্দের ভিতরও ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠছে তাদের তীক্ষ্ণ মরণাহত আর্তরব।

গুল বাহাদুর সব-কিছু ভুলে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন,

'শাবাশ, শাবাশ! একেই বলে আক্রমণ; একেই বলে হামলা। বিলকুল বে-খবর এসে বে-এক্তেয়ার করে দিল দুশমনকে।'

গোরু দুটো গাড়ী থেকে খালাস করে আনন্দীকে কোলে করে আঙ্গিনার অন্য প্রান্তের কুঁড়ে ঘরের দাওয়াতে উঠতেই গুল বাহাদুরের চোখে পড়ল আরেক ঝড়। ঝড়েরই বেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিনায় এল এক রমণী। শাড়ীর এক অংশ কোমরে বাঁধা, দীর্ঘতর অংশ সোজা উঠে গেছে আকাশের শূন্যে, মাথার চুলও উঠেছে আকাশের দিকে তালগাছের সব্বলের উঁচু পাতাটার মতো ঢপ নিয়ে। তার বগলে একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা। এই লালচে অন্ধকারের ভিতরও গুল বাহাদুরের নজরে পড়লো ছাগল-বাচ্চাটার দুটো ভয়ার্ত চোখে। আর,···আর তার পাশে, একে অন্য থেকে বেশ দূরে আরও দুটি লাল-কালো চোখ। মেয়েটি আসমান থেকে শাড়ী নামিয়ে বুক ঢাকার চেষ্টা না করে সোজা উঠলো ঘরের দাওয়ায়। ঝটাৎ করে

শিকলি খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে এক লহমার তরে দরজা ফাঁক করে ধরলো। এহেন প্রলয় নৃত্যের ওক্তে 'আপ যাইয়ে', 'আপ বৈঠিয়ে' বলে কে? পেছন থেকে গণির বেধড়ক ধাক্কা খেয়ে গুল বাহাদুর পড়লেন মেয়েটার উপর। সে চোট না সামলাতে পেরে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাকে জাবড়ে ধরলেন দু হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে। মেয়েটা 'আ মর মিনষে' ঐ ধরণের কি যেন একটা বললে। ইতিমধ্যে গণি মিয়া কোনো গতিকে দরজাতে হুড়কো দিয়ে ফেলেছে।

ভিতরে ঘোর ঘুট্টি অন্ধকার। শুধু চালের সঙ্গে যেখানে মাটির দেয়াল লেগেছে তারই ফাঁক দিয়ে কেমন যেন একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছে—গাঁয়ে আগুন লাগলে রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে যে-রকম বাইরের আগুনের আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ ঝলমল করে উঠলে সক্কলের মুখের উপর সোনালী আবির মাখিয়ে দেয়।

একটা মোড়া ঠেলে দিয়ে রমণী বললে, 'বসো, গোঁসাই।' গণি এক কোণে চ্যাটাইয়ের উপর বসেছে। আনন্দী গুল বাহাদুরের হাঁটু জড়িয়ে ধরে ভীত নয়নে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে।

গুল বাহাদুর দিল্লী শহরে বিস্তর খাপসুরৎ রমণী দেখেছেন। খাঁটি তুর্কী মেয়ের ড্যাবডেবে চোখ, খানদানী পাঠান মেয়ের ধনুকের মত জোড়া ভুরু, নিকষ্যি কুলীন ইরাণী তন্বঙ্গীর দোলায়িত দেহ সৌষ্ঠব, এমন কি প্রায় অমিশ্র আর্যকন্যা ব্রাহ্মণ কুমারীর সরল বুদ্ধিদীপ্ত শান্ত-সৌন্দর্য তিনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আজ যে রমণী তাঁর সামনে আধা আলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তার লাবণ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সৌন্দর্য ছ'শ বছরের মিশ্রণের সওগাত। এর গায়ের রঙ এদেশের কচি বাঁশ পাতার সবুজ দিয়ে আরম্ভ, তাতে মিশে গিয়েছে পাঠান-মোগলের কিঞ্চিৎ তাঁবা-হলুদের রঙ। চুল ইরাণীদের মত কালো হয়ে গিয়ে গিয়ে যেন নীলের চিলিক পড়েছে। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য তার আটসাঁট গড়নে—সাঁওতাল মেয়ে দেখে যেমন মনে হয় এর দেহ তৈরী হয়েছে গয়ার কালো পাথর দিয়ে। পেটে পিঠে

কোনো জায়গায় এক চিমটি ফালতো চর্বি নেই। আলগোছে কোমরে জড়ানো এর শাড়ীর আঁচল কোমরটিকে যা ক্ষীণ করে দিয়েছে দিল্লীর তন্বঙ্গী তার ইজের-বন্ধ কষে বাঁধলেও এ ক্ষীণ কটি পেত না।

প্রথম তরুণ বয়সে গুল বাহাদুর যখন সবে বুঝতে আরম্ভ করেছেন যুবতীর দেহে কি রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে তখন তাঁর এক ইয়ার তাকে একখানা চিত্রিত ইউসুফ-জোলেখার বই দিয়েছিল। পাতার পর পাতা উল্টে সে বইয়ে তিনি দেখেছিলেন শিল্পী কি ভাবে প্রতি পাতায় জোলেখার সৌন্দর্য ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রতি ছত্র, প্রতি রঙ তাঁর অঙ্গে অঙ্গে তখন কি অপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল। রোমাঞ্চ কলেবরে কাটিয়েছিলেন অর্ধেক যামিনী।

আজ ঠিক সেই রকম বিদ্যুতের প্রতি ঝলক যেন মেয়েটির সৌন্দর্য পাতার পর পাতা খুলে তাঁর মুগ্ধ আঁখির সামনে তুলে ধরছিল। আর চতুর্দিকে তখন ঝঞ্ঝা-বাত্যার প্রলয় নর্তন। তারই মাঝখানে এই কমলিনীর ক্ষণে ক্ষণে আত্ম-বিকাশের মন্দমধুর প্রস্ফুরণ।

কিন্তু আজ আর প্রথম তারুণ্যের সেই রোমাঞ্চ শিহরণ গুল বাহাদুরের দেহে মনে হিল্লোলিত হল না। আজ এই সৌন্দর্যের পটপরিবর্তন তিনি গভীর তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেন—শান্ত মনে, সমাহিত চিত্তে।

বিদ্যুতালোক গুল বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে রমণী শুধালো, 'কি দেখছ, গোঁসাই ?'

অতিশয় অনাবশ্যক প্রশ্ন। কণ্ঠে লজ্জা দেবার কিম্বা পাওয়ারও কোনো রেশ নেই। এমন সময় আকাশ থেকে কক্কড় করে নামলো শুকনো দেশের ভরাট অকাল বৃষ্টি। গুল বাহাদুরকে কোনো উত্তর দিতে হল না।

মেয়েটি মাটিতে বসে দু হাতে হাঁটু জড়িয়ে গুল বাহাদুরের মুখের

দিকে আবার তাকালো। চিবুক যে জোড় হাঁটুর উপর রাখবে তার যেন উপায় নেই। মাঝখানে সুবিপুল মৃণ্ময় মর্ম-বিগ্রহ যুগল।

হঠাৎ রমণী দু বাহু তুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে গুল বাহাদুরকে শুধালে, 'গোঁসাই, তোমার বয়স কত ?'

যেন প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন। কিন্তু উত্তর না দিয়ে পাল্টে শুধালেন, 'কোন বয়স ?'

রমণী হেসে উঠলো। বললে, 'সে আবার কি ? বয়স আবার কত রকমের হয় ?'

গুল বাহাদুর বললেন, 'অনেক রকমের হয়। আমার বয়স তেইশ।' গদরের নৈরাশ্য এই নাতিদীর্ঘ তেইশকে যেন কত দীর্ঘ তেইশে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে।

এবারে রমণী খল খল করে হেসে উঠলো। 'ইয়া আল্লা. ইয়া রসুল। তোমার বয়স তেইশ! আমার-ই তো এক কুড়ি ছয়!'

গুল বাহাদুর চমকে উঠলেন। এ মেয়ে কি মুসলমান ? শুধালেন,

'তোমার নাম কি ?'

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার যেমন অনেক রকমের বয়স, আমার তেমনি অনেক নাম। লোকে বলে 'মিছার মা'।'

'সে আবার কি ?'

'বুঝলে না ? আমি সাচ্চা মা নই, তাই আমি মিছার মা।'

বৃষ্টি নেমেছে দেখে গণি মিয়া গাড়ী গোরুর খবর নিতে বাইরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ সে কোনো-কিছুতে কান দেয় নি। এবারে একটুখানি দাঁড়িয়ে গুল বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে যা তা বলছে, বাবাজী। ওর নাম আসলে মিঠার মা।'

মিঠার মা গণির দিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁরে গণ্যা, আমি যা তা বলি ? আমি মিছার মা না তো কি ? আল্লার কিরে কেটে ক 'তো ?' গণি বাইরে যেতে যেতে বললে, 'তা তুই নিকে

করে বাচ্চা বিয়োলেই পারিস।' গুল বাহাদুরকে বললে, 'আসলে ওর নাম মোতী।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, 'এ-নাম যে দিয়েছে সে আর যাই হোক্ মিছের বাপ নয়—সত্যি নামই দিয়েছে।' কিন্তু এর জাত কি তার হদীস গুল বাহাদুর তখনো পেলেন না।

কিন্তু এক মুহূর্তেই পাওয়া গেল। তাও অনায়াসে।

আনন্দী বললে, 'দাদু, জল খাবো।'

মোতী শুনতে পেয়েছে। ভাবখানা যেন শুনতে পায় নি।

গুল বাহাদুর বললেন, 'মোতীর মা, একে একটু পানি খেতে দাও।'

মোতীর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, 'আমি যে মুসলমান।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'তুমি পানি দাও।'

মোতী চীনে মাটির বাটিতে করে আনন্দীকে জল দিলে। সঙ্গে দুটি বাতাসা। গুল বাহাদুরের কাছে এসে বললে, 'এ তো তোমার ছেলে নয়, ঠাকুর। কার ছেলের জাত মারছো?'

এই জাত মারামারিতে গুল বাহাদুর একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন, 'শিবু মোড়লের ছেলে। ও জাত—'

আনন্দের চোটে আনন্দীকে জড়িয়ে ধরে মোতী বললে, 'কোজ্জাব মা, তুই শিবুর ব্যাটা। তাই ক। কি খাবি বল।'

মোতীর মা ভারী খুসী। অচেনাজন চেনা লোককে যখন চেনে তখন আর সে অচেনা নয়। আসলে তাও নয়—চেনা অচেনার পার্থক্য মোতীর মা কখনো করেনি। মোতী খুশী হয়েছে, কথা কইবার মতো দুজনারই একজন চেনা লোক পাওয়া গেল বলে। গুল বাহাদুরকে বললে,

'ওর কথা আর তোল না, গোঁসাই, ওর মত হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে এ মুল্লুকে দু'টো ছিল না। ক' বছরের কথা? আমার সোয়ামী

রেখেছে রোজা, জষ্ঠি মাসের গরমে। ইফতারের জন্য আমি করেছি শরবৎ। র র, থাম্ থাম্ বলতে না বলতে শিবু মেরে দিলে বেবাক ঘটি। ওর আবার জাত। ওর জাত মারে কে ?'

তারপর গুল বাহাদুরের প্রায় গা ঘেঁসে বসে ফিস্ ফিস্ করে বলতে আরম্ভ করলো, যেন কতই না লুকনো কথা,

'ওর জাত ছিল সোনা বাঁধানো। এক ঘটি তেঁতুলের শরবৎ ঢাললে তার জেল্লাই বাড়ে বই কমে না। আর আসলে ছিল, আমারই মত বদ্ধ পাগল। জানো আমার বিয়ের দিনে এক জালা তাড়ী খেয়ে এসে জুড়ে দিল কান্না। আমার বাবা নাকি তাকে বলেছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। সবাই হেসে গড়াগড়ি। শেষটায় আমার মামা বললে, 'তা মোড়ল, বিয়ে করবে তো তোমার পাটরাণীকে খবর দাও, তিনি এসে বাঁদী বরণ করে নিয়ে যাবেন!' যেই না শোনা অমনি শিবু জল। নেশা কেটে পানি হয়ে গেল। শিবুর বউ ছিল এ তল্লাটের খাণ্ডার। মারমুখা বঁটিদা। তারপর শিবু গলায় ঢোল ঝুলিয়ে শুরু করল নাচতে। পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে সেদিন যা হাসিয়েছিল। বিয়ের পর আকছারই আসতো আমাদের বাড়ীতে। 'কই গো নাগর' বলে আমার সোয়ামীর হাত থেকে হুঁকো কেড়ে নিয়ে একদমে দিত ছিলিম ফাটিয়ে। আসলে ও খেত বড় তামাক।'

গুল বাহাদুরের দুঃখ আরো বেড়ে গেল। এ রকম একটা গুণরাজ খান চলে গেল। আর কেউ যেতে পারলো না ?

মোতী আরো গলা নামিয়ে বললে, 'কিন্তু জানো ঠাকুর, আমার সোয়ামী চলে যাওয়ার পর একদিনও এ বাড়ীতে আসেনি। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। একদিন বাঁধের কাছে ধরা পড়ে গেল। তখন আমায় মনের কথা বললে। ওরা দুজনে নাকি কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে যাবার মৎলব করেছিল। তারপর শিবু কোথায় উধাও হয়ে গেল। ফিরে এসে বেশী দিন বাঁচলো না। কিন্তু ওসব কথা আর কেউ জানে না।'

বাইরে আস্‌মান-ফাটা বরসাৎ নেমেছে, হাওয়ার মাতামাতি বন্ধ হ'য়ে গিয়ে চাল দিয়ে জলের ধারা ঝালরের মত ঝুলে পড়ছে। গণি মিয়া দাওয়ায় বসে আছে গালে হাত দিয়ে। বাইরে জলের ধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মিঠার মা তার বড় বড় ডাগর চোখে—শুকনো চোখে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, 'লোকে যে আমায় পাগলী বলে, ভুল বলে না। তুমি পায়ের ধূলো দিয়েছ এ বাড়ীতে, আর আমি একবার জিজ্ঞেসবাদও করছিনে, তোমার সেবার কি হবে ?'

গুল বাহাদুর তাড়াতাড়ি বললেন, 'তার জন্যে তুমি চিন্তে করো না, মিঠের মা। গাড়ীতে চিঁড়ে মুড়ি আছে। না হয় তুমিই কিছু দেবে।'

অবাক হয়ে মোতী শুধালে, 'তুমি জাত মানো না।'

একটুখানি ভেবে নিয়ে গুল বাহাদুর বললেন, 'আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ।'

মোতী প্রথম একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বললো, 'বুঝেছি। খুব যারা উঁচুতে উঠে যায়, তারা বোধ করি ওসব আর মানে না। আমার বাপের বাড়ীর পাশের গাঁয়ে বামুনরা থাকতো। ভয়ঙ্কর জাত-বামুন। আমার বাবা বলতো, তাদের কেউ কেউ নাকি জাত মানতো না। বাবার হাতে তামাক খেত।'

গুল বাহাদুরের জানবার ইচ্ছে হল, এই ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারটা মোতী কোন্ চোখে দেখে। শুধালেন, 'এ জিনিসটে কি ভালো ?'

মোতী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কি জানি ভালো, না, মন্দ। যার যেমন খুশী। আমাদের পীর সায়েবও তাঁর বীবীর হাতে ছাড়া খান না। ভালোই করেন নিশ্চয়। তিনি যা জায়গা-বেজায়গায় নিত্যিনিত্যি আড়াই কুড়ি দাওয়াত পান, ওসবের সিকিটাক খেলেও দেখতে হত না। ঐ হোথায় বাসা বাঁধতে হত। সেখানে আবার বাবুর্চীখানা নেই।' বলে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগল।

গুল বাহাদুর বুঝতে না পেরে বললেন, 'কোথায় ?'

ডান হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে, বাঁ হাতে খোলা দরজা দিয়ে কোথায় যেন দেখিয়ে দিলে।' গুল বাহাদুর তবু বুঝলেন না।

'গোরস্তান, গো, গোরস্তান। ঐ যেখানে মিছার বাপও ঘুমুচ্ছে।'

গুল বাহাদুর মরমী, দরদী লোক নন—অন্তত এই তাঁর বিশ্বাস। তবু শুকনো মুখে বললেন, 'কেন তুমি এ দুঃখের কথা বার বার তুলছো, মিঠার মা ?'

মোতী যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। দু'হাত জুড়ে বললে, 'মাপ করো, গোঁসাই, কিন্তু দুঃখের কথা বললো কে ? ও তো ওখানে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে। আর যাবার সময় ও তো ভারী হাসি মুখে গিয়েছে। চোখ বুজলো, কিন্তু মুখের হাসিটুকু মিললো না। জিজ্ঞেস করো না, এই গাঁয়ের পাঁচজনকে, যারা তাকে গোসল করালে কাফন পরালে।'

'থাক্।'

'হ্যাঁ, থাক। দাঁড়াও, আনন্দীর গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে আসি।'

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

গুল বাহাদুর মাঝে মাঝে খোলা দরজা দিয়ে দেখছিলেন, জল ধরার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে কি না। মোতী লক্ষ্য করে বললে,

'সে আশা ছেড়ে দাও আজ। জল ধরলেও বেরতে পারবে না। এ গাঁ ও গাঁর মাঝখানে যে খোয়াই তার ভিতর বিষ্টি থেমে যাওয়ার পরও জল যা তোড়ে বয় তাতে হাতী ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কত শ 'দ'। একবার একটাতে মজে গেলে বিনা মেহন্নতে বেরিয়ে যাবে এক ঝটকায় ঐ দূরের অজয়ে। তবে জানটা আর সঙ্গে যাবে না। না, থাক্। ওসব কথা তুমি ভালোবাসো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। সামলে-সুমলে কথা বলতে হয়।'

গুল বাহাতুর বললেন, 'তুমি তো কিছু খেলে না।'

'আমি তো দিনের বেলা খাইনে।'

'সে কি ? তামাম বৎসর রোজা রাখো নাকি ?'

'ঐ তুই ঈদের ছটা দিন বাদ দিয়ে। তবু দেখো তো গতরখানা।'

ছাড়-পত্র পাওয়ার পূর্বেও গুল বাহাতুর অনেকবার সীমা লঙ্ঘন করেছেন, তবু নূতন করে 'গতরখানা' দেখে খুশীই হলেন। কোনো প্রকারের সহানুভূতি জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন, 'কার ওজন কতখানি তাই মাপবার জন্য ভগবান দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে স্বর্গে বসে থাকেন না।'

মোতী বলতে, 'হক্ কথা। কিন্তু আমাদের একটা মুর্শীদীয়া গীত আছে, ঐ নিয়ে। শুনবে ?' বলেই গুণ গুণ করে ধরলে—মিষ্টি গলায়, কিন্তু কেমন যেন কান্না ভর-ভর সুরে—

দীপ নাই শলিতা নাই,
জ্বলে শখের বাতি
কইয়ো গিয়া মুরশীদের ঠাঁই।
জ্বলে দিবা জ্বলে রাতি
কইয়ো গিয়া ও ভাই—

ঘুরে ফিরে, এখানে ধরে, ওখানে ছেড়ে, অবার নূতন করে ধরে মোতী অনেকক্ষণ ধরে গানটি গাইল। সমস্ত প্রাণ দিয়ে। ঝরঝর বারিধারা যে রকম সহজ পথে আকাশ থেকে নেমে আসে এর গানও হৃদয়ের উৎস থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। রসকষহীন গণি মিয়া পর্যন্ত সরে এসে চৌকাঠের কাছে বসেছে।

গুল বাহাতুর গানের পূরো অর্থ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু রস পেতে খুব যে অসুবিধে হ'ল তা নয়। বাচ্চারা যে রকম গল্প শোনার সময় ভাষার দৈন্য কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিয়ে পূরো রসই পায়, নূতন ভাষা শেখার সময় বয়স্ক লোকও তাই করতে পারে, যদি সে ইতিমধ্যে কল্পনা-শক্তি হারিয়ে না ফেলে থাকে। 'জ্বলে শখের বাতি' বলার

সময় মোতীর দেহ যেন আরো সুন্দর হয়ে দেখা দিচ্ছিল, আর 'দীপ নাই শলিতা নাই' গাইবার সময় মোতীর চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, গুল বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলছিলেন।

তবু বললেন, 'বুঝিয়ে বলো।'

'এতে আবার বোঝাবার কি আছে! গুরুকে খবর পাঠাচ্ছি, মহব্বৎ দরদের তেল শলতে নেই ভিতরে, তবু দেহের বাতি জ্বলছে। তা আবার খামোখা দিনেরবেলাও জ্বলে। তাইতো তোমাকে বলছিলুম, 'গতরটার পানে চেয়ে দেখো'।'

গুল বাহাদুর মনে মনে বললেন, 'দেশের প্রতি ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গ করার তেল শলতে তৈরী করেই আমরা জ্বালিয়েছিলুম গদরের প্রদীপ। সে মিথ্যা, মায়া, ফানী।'

কিন্তু মোতীর এই সুন্দর দেহ। এর ভিতরে সুন্দর হিয়ার প্রদীপ নেই—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বললেন, 'মোতী, সবই ভগবানের দান। তাচ্ছিল্য করতে নেই। রোজা ভালো জিনিস, কিন্তু তারও বাড়াবাড়ি করতে নেই। মীরা বাঈয়ের ভজন তুমি শুনেছ,

'নিত্য নাহিলে হরি যদি মিলে
জল-জন্তু আছে ঢের
কামিনী ত্যাজিলে হরি যদি মিলে
তবে হরি খোজাদের।'

মোতী গদগদ কণ্ঠে বললে, 'এতো ভারী মধুর, গোঁসাই। আমি কখনো শুনিনি।'

যমুনার পারে রাজপুতানার এক বৈরাগী মীরার ভজন গাইত। গুল বাহাদুর আনমনে তার গান শুনেছেন, মাঝে-মধ্যে, কিন্তু সে গান যে তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, তা তিনি নিজেই জানতেন না। ভক্তিরস, ভাবালুতা গুল বাহাদুর কখনো খুব নেকনজরে দেখেন নি। বাড়াবাড়ির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ তবে চলি, মিঠের মা।

খোয়াইরের জলটা আমার দেখবার ইচ্ছে আছে। গণি আর আনন্দী রইল। কাল সকালে গাড়ীতে করে পাঠিয়ে দিয়ো।'

মোতী বাধা দিল না। গোঁয়ারদের নিয়ে তার জীবনের কেটেছে অনেকখানি—তার বাপ ভাইরা ছিল এক একটি হুঁদে গোঁয়ার।

শিমূলতলায় এসে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আচ্ছা, গোঁসাই একটা কথার উত্তর দেবে? এই গণির স্বভাব-চরিত্র কি তা তুমি জানো না। সে আমার বাড়িতে থাকলে তোমার কোনো আপত্তি নেই। সে আমাকে নিয়ে যা-খুশী করুক। কিন্তু তুমি থাকলেই আসমান মাথার উপর ভেঙে পড়ে। কেন বলোতো। ছোটজাতে ছোটজাতে যা-খুশী করুক—নয় কি?'

সত্যি বলতে কি, গুল বাহাদুর পরিস্থিতিটা এ ভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। কিন্তু মোতীর কথাগুলো এমনি সোজাসুজি তার কানের ভিতর দিয়ে মগজের উপর ঠনাঠন হাতুড়ী পিটিয়ে দিল যে তাকে চিন্তা করে কথাগুলো বুঝতে হল না। প্রথমটায় থ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমায় সত্যি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করো, আমি অতখানি চিন্তা করে এ-ব্যবস্থা করি নি। বোধহয়, এ ব্যবস্থা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি যে কারণটা দেখালে সেটাও হয়তো ঠিক, কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তবে বলবো, আমি ভদ্রলোক, সাধারণ লোক সকলের সঙ্গেই মিশেছি এবং এ-বাবদে আমি গণি মিয়াদের ঢের ঢের বেশী বিশ্বাস করি। এদের হ্যাংলামো অনেক কম। গরীবের সুন্দরী মেয়েকে মোকায় পেলে 'ভদ্রলোক'-এর মাথায় বদ-খেয়াল চাপবেই। ভদ্রলোকের মেয়ে হলেও তাই—তবে সেখানে একটু লাইয়ের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তাই দেখো, ভদ্রলোকের মেয়েকেও আমরা চাকর-বাকরের হেপাজতীতে রাখা পছন্দ করি। আর—'

'থামলে কেন? বলো।' কঠিন গলা একটু মোলায়েম হয়েছে বলে মনে হল।

'আর গণি ভালো-মন্দ কিছু একটা করতে গেলে তাকে যে রকম ঠাস করে তুমি চড় মারতে পারবে, আমাকে কি—

ধমক দিয়ে বললে, 'থাক্ থাক! কে কাকে চড় মারতো কে জানে।' বিকেল বেলার বৃষ্টিশেষের কনে-দেখার আলো সবটুকু মুখে মেখে এতক্ষণ-গোপন-রাখা তার সবচেয়ে মিষ্টি মুখে মিষ্টি গলায় বললে, 'তবে এসো ঠাকুর।'

* * *

জলের তোড় গুল বাহাদুর অতি উত্তম রূপেই দেখলেন। বাদশা মুহম্মদ তুগলুক যে রকম দিল্লীর জাহানপানা শহরে সাত তলা মঞ্চের উপরে বসে তাঁর হাজার হাজার সৈন্য স্রোত বয়ে যেতে দেখতেন—অর্থাৎ একটা উঁচু টিপির বসে জলের তোড়, স্রোতের দ', উঁচু উঁচু টিপির উপর রাগী ঢেউয়ের ছোবল তাবৎ বস্তুই দেখলেন, এবং তারচেয়েও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন, মোতীর মা'র কথা, মিছার মা'র গল্প নয়। এর যেখানে হাঁটুজল সেখানেও দাঁড়ায় কার সাধ্য?

সন্ধের সময় আবার বৃষ্টি নামলো। ষোড়শীর রাত কিন্তু মেঘে মেঘে সব অন্ধকার। সমস্ত রাতটা কাটাতে হল টিবির উপর।

অভিসম্পাত দিতে দিতে বললেন, 'মহাজনগণ বলেছেন, মেয়েদের বুদ্ধিতে চলো না। হক্ কথা। কিন্তু না চললে কি হয় তাও বেশ টেরটি পেলুম। ওদের কথা শুনলে বিপদ, না শুনলে আরো বিপদ। এ জাতটাই বজ্জাৎ!'

॥ সাত ॥

কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে পাণ্ডোরা খুলে ফেললে কৌটোটি, আর অমনি তার থেকে পিল পিল করে বেরতে লাগলো, দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আরো কত কী আর তারই চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়লো ভুবনময়। পাণ্ডোরা ভয়ে ভয়ে যখন ভিরমি যাবো যাবো করছে তখন সর্বশেষে বেরলো—আশা। তারই জোরে মানুষ

সর্ব দুঃখদৈন্য সয়। আত্মহত্যার দৃঢ় দড়িতে নিজেকে না ঝুলিয়ে দিয়ে ঝুলতে থাকে সেই আশার ক্ষীণসূতোটিতে।

সুলেমান যখন তাঁর স্বাধিকার-প্রমত্ত জিন্‌কে শাস্তি দিয়ে বোতলে পূরে সমুদ্রে ফেলে দেন তখন তাকে পাণ্ডোরার শেষ দৌলতটি দেন নি। সেই তাঁর চরম করুণা। জিন্নি যদি বোতলের ভিতর বন্দীদশার প্রথম প্রহরেই জানতে পেত তাকে ক'শ বছর ধরে বোতলের ভিতর প্রহর নয়—শতাব্দী গুণতে হবে তাহলে সে নিশ্চয়ই থ্রম্বসিসে মারা যেত।

গুল বাহাদুর যদি চিকনকালাতে আশ্রয় নেবার দিন জানতে পেতেন তাঁকে ক'যুগ ওখানে কাটাতে হবে তাহলে তিনি নামাবলীতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তেন। পাণ্ডোরার যে ক্ষীণ আশাটি নিয়ে তিনি নামাবলী গায়ে দিয়েছিলেন সেটি ওরি মত এত জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে ওটিকে আর পরা চলে না।

কিন্তু
কেশের আড়ালে জৈছে
পর্বত লুকাইয়া রৈছে

ঠিক তেমনি তার দিন-আনি-দিন-খাই-য়ের আড়ালে আশা-নিরাশা সব-কিছুই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সেটা দিব্য যেন ক্লরফর্ম কিম্বা আফিঙের কাজ করে যাচ্ছিল। পরম ধার্মিকজনও যখন দিন-যামিনী এটা সেটার চিন্তায় মশগুল থেকে শেষের দিনের কথা সম্বন্ধে অচেতন হয়ে যেতে পারে তখন সামান্য প্রাণী গুল বাহাদুর যে পলাশ-তলায় খাটিয়ার উপর শুয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবেন তার আর বিচিত্র কি?

কালটাও ছিল ধীরমন্থর। কারো সঙ্গে দেখা করতে হলে তোড়জোড় করতেই লেগে যেত তিনমাস। বিয়ের আলাপ পাকাপাকি করতে নিদেন তিন বছর। এমন কি মরার সময় গঙ্গাযাত্রায় বেরিয়ে সেখানে দিন সাতেক না কাটালে মুরুব্বিরা রীতিমত বেজার হতেন।

'অত তাড়া কিসের রে বাপু? ছ-পাঁচ দিন হরিনাম শুনবি, চন্দন বেটে ধীরেসুস্থে সর্বাঙ্গে হরিনাম ছাপা হবে, ইষ্টিকুটুম খবর পেয়ে ঘর-সংসার গুছিয়ে গাছিয়ে দেখা করতে আসবে, শুনতে পাবি কবে যাবি, ক'দিন আর আছিস তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা হচ্ছে, বাজী ধরা হচ্ছে;—তা না, চললি হুট করে যেন ডাক পড়ার পূর্বেই হাড়-হাবাতে আপন হাতে আসন পেতে বসে গেল যজ্ঞির দাওয়াতে। কিম্বা যেন বাসর ঘরে পাঁচজনের সামনে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে ফেললি কনে বউয়ের ঘোমটাখানি। কিম্বা তারো বেশী।'

হিসেব করো দিকিনি, গুল বাহাদুর, শান্ত মনে—শুদ্ধ-বুদ্ধ চিত্তে। ক'বছর হল? দশ, বিশ, ত্রিশ? পিছনের দিকে না সামনের দিকে? তুমি বসে, আর তারা সামনে দিয়ে চলে গেল, না তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছ, না তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছ? না তুমি কাজের মাঝখানে এমনি যোগ সাধনায় তুরীয় ভাব অবলম্বন করেছিলে যে কাল, না কাল কেন, যেন স্বয়ং মহাকালই ধূর্জটির জটার ভিতর প্রথম উর্বশীর মত বেশ খানিকটা নেচে কুঁদে, তারপর গঙ্গার মতন এদিক ওদিক পথ না পেয়ে বিষ্ণুর মতন উত্তম ডানলোপিলোর বিছানাতে অনন্ত শয়নে নেতিয়ে পড়েছেন?

কে জানে কি হয়? যেখানে বছরে একদিনও স্মরণ করতে হয় না, আজ কোন্ তারিখ, সেখানে একটা বৎসরই একদিন। আর যেখানে দিনে বত্রিশবার স্মরণ করতে হয় আজ অমুখ তারিখ, সেখানে একটা দিনই এক বৎসর। কে জানে সময় কোন্ দিক দিয়ে যায়? দশ, বিশ, ত্রিশ বৎসর।

এই মোতীর সঙ্গেই আবার দেখা হতে লেগে গেল দেড় মাস।

সকাল থেকেই পূবের আকাশে মেঘ জমে উঠেছ—সাঁওতাল দেশের সাঁওতালী মেয়ের গায়ের রঙ মেখে। মেঘের পর মেঘ জমেই উঠছে যেন আকাশের ভরা গেলাসে পর্জন্য এক এক ফোঁটা করে জল ঢালছেন আর দেখছেন, এইবারে উছলে পড়ল কি না। ক্ষণে ক্ষণে

কালো মেঘের উপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝলমলানি। যেন ঐ সাঁওতালনীরই শ্যামবদনে টগর-ফুলের সফেদ হাসি। কিম্বা যদি ইন্দ্রপুরীতেই ফিরে যাই তবে মনে হবে, মেঘের কালো টানার উপর উর্বশী বিদ্যুতের রুপোর পোড়েন টানছেন, বাসর রাতের কাঁচুলির কিংখাপ বুনতে। নাঃ! এ সব তুলনাই অতি কাঁচা। মোক্ষম তুলনাটির চড় বিশ্ব সাহিত্যের গালের উপর মেরে দিয়ে গিয়েছেন রাজা শূদ্রক। বিদ্যুৎ যেন শ্যামাম্বু নীলকণ্ঠের গলা জড়িয়ে গৌরীর শুভ্র-ধবল বাহুলতা।

গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্দ্যুল্লেখেব রাজতে

হায়রে শূদ্রক! একটু টেনে-সামলে উপমাগুলো ছাড়লে না কেন হে পৃথ্বীরাজ, কাব্যসম্রাট? এ যুগের মধ্যমজনকেও যে একদিন রসসৃষ্টি করে নিষ্ক সঞ্চয় করতে হবে সেটা কি তিনি খেয়ালই করলেন না? রাজা হলেই কি এ রকম দান করতে হয়? তাই দেশের রাজা হাতিমতাই অন্ন দান করে হয়েছিলেন অন্নরাজ, কিন্তু তিনিও তো বীচির ধান খাইয়ে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিরন্ন করে যাননি। উপমার বেলা শূদ্রক শেষে নবান্নের বীচিও যে খতম করে গেলেন।

তা যাক্। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-প্রেম, বিশেষ করে আসঙ্গ-লিপ্সা এ জগৎ থেকে এখনো লোপ পায়নি।

গুল বাহাদুর দেখলেন, তেপান্তরী মাঠ যেখানে ফালি হয়ে বাঁ দিকে ঢুকেছে, তারই অপর প্রান্তে, মেঘের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে একটা উঁচু ঢিপির উপর ক্ষণিকের তরে দাঁড়ালে। মাঠ-বাট জনহীন। বৃষ্টি নামি নামছি, নামি নামছি করছে। এ অবেলায় লোকটার আহম্মুখী দেখে গুল বাহাদুর ভুরু কোঁচকালেন।

আধা আলো-অন্ধকারে বেলা কতখানি গড়িয়েছে ঠাহর হচ্ছেনা। ঘরে ঢুকে গুল বাহাদুর আনন্দীকে শুধালেন, 'কি খাবে আনন্দী?' দিল্লীতে 'তুই' 'তুঁ' শব্দটা প্রায় উঠে গিয়েছে।

আনন্দীর আটপৌরে পোষাকী একই মেনু। বললে, 'খিচুড়ি আর

আলুর দম।' ঐ একটি মাত্র রান্না যার সঙ্গে দিল্লীর রান্নার কিঞ্চিৎ ঐক্যসখ্য আছে—গরম মশলার কৃপাতে—অবশ্য আনন্দীর অজানাতে। গুল বাহাদুর সাজ সরঞ্জামের চতুরঙ্গ বাহিনী তোড়জোড় করে যোগাড় করতে লাগলেন। আনন্দী কখনো মায়ের আদর পায়নি। পাওয়ার মধ্যে পেয়েছে বাপের ধাতানি। সেও এটা সেটা যোগান দিতে লাগলো।

বৃষ্টি নামবার আগে আরো কিছুটা জল এনে রাখলে ভালো হয় ভেবে গুল বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। দাওয়ার এক প্রান্তে খুটিতে হেলান দিয়ে মোতী বসে।

'তুমি!'

নিরুত্তর।

'কখন এসেছ? ডাকলে না কেন?'

দেয়ালের থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললে, 'তুমি আমাকে টিপির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে চলে গেলে কেন?'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'তাজ্জব কী বাৎ! অতদূর থেকে আমি তোমাকে চিনবো কি করে? আমি ভাবলুম,—'

'দত্যি, দানো, মামদো! তোমাদের কাছে সব মুসলমানই মামদো? না?'

গুল বাহাদুর বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, 'এ কী জ্বালা! হিন্দু নই, তবু হিন্দু অপরাধের হিস্সে আমাতেও অর্সায়।'

গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমাকে আমি বলিনি, আমার ধর্মে জাত মানামানি বারণ। চলো ভিতরে ঐ দেখ বৃষ্টি আসছে।'

এবারে মারাঠা সৈন্যের অতর্কিতে আক্রমণ নয়। দূরদিগন্ত থেকে হেলে দুলে বিলম্বিত তালে এগিয়ে আসছে আকাশ-জোড়া পাতাল-ছোঁয়া শ্যামসুন্দর মেঘবৃষ্টি। এই রকম অগণিত করীযূথ সমাবৃত গাঙ্গেয় চমূ অগ্রসর হচ্ছে শুনেই আলেক্সান্দর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমীচীন গণনা করেছিলেন।

এবারে মোতী খিলখিল করে হেসে উঠলো। কিছুতেই থামতে চায় না। যেন পেটের ভিতর হামানদিস্তে দিয়ে কেউ পাথর কুটছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে দুলে দুলে ফুলে ফুলে কাঁপন। গায়ের বসন যেন সে কাঁপন সামশাতে না পেরে পড়ে যেতে চায়। কার যেন বিরহ বেদনায় কনক বলয় ভ্রংশ, অর্থাৎ বাজুবন্দ খোল খোল যাউত হয়েছিল, আজ হাসির হররায় এ রমণীর বসনাঞ্চল প্রান্ত বিস্রস্ত। এবং স্মরণ রাখা কর্তব্য, গ্রামাঞ্চলে অঞ্চল প্রায়শ উপকণ্ঠিত থাকে না।

চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, 'ঠাকুর, তুমি মস্করা-ফিস্কিরি এক্কেবারে বুঝতে পারো না। ওদিকে কথা কও পাকা পাকা। তুমি একটি আস্ত মেড়া।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'আল্লা করুন, তুমি ঐ রকম মেড়াই থাকো।' আল্লার স্মরণে ডান বাহু উঁচুতে তুলে আচল দিয়ে ঘোমটা টানলে। আজান শুনলে বাঙালী মুসলমান মেয়ে যে রকম করে থাকে।

ওদিকে তখন বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা গুল বাহাদুরের ধূলো-ভরা আঙ্গিনায় হরিন্নুটের বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

গুল বাহাদুর নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য গলা একটু শক্ত করে বললেন, 'ভিতরে চলো।'

মিঠার মা মিশ্রির মিঠা। শক্ত। বললে, 'জোর করে টেনে নিয়ে যাবে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানি এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও।' এবং তারি সঙ্গে সঙ্গে উঠি উঠি ভাব। টান দিলেই সুর সুর করে ভিতরে চলে যাবে।

গুল বাহাদুর দ্বিধায় পড়লেন। কি আর করেন? সুরটি যতদূর পারেন মমতাময় করে বললেন, 'মেহেরবানী করো।' 'মেহেরবানী' কথাটার আমেজ উর্দু এবং বাঙলাতে এক নয়। সে-কথা না জেনেও আশা করলেন, মুসলমানেব মেয়ে সুরটি ধরতে পারবে।

মোতী গুণগুণ করে গান ধরে ভিতরে গেল। বুঝলো গুল বাহাদুরের হার হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা নিজে যখন বুঝতে পারেনি

যে তার হার হয়েছে, তখন সে জেতাতে কি আনন্দ ? আর হেরে যাওয়ার দুঃখের ছাপ যদি তার মুখের উপর পড়তো তাহলেই কি মোতী আনন্দ পেত ?

এবারে গুল বাহাদুরকে শুনিয়ে একটু উঁচু গলায় গাইলে,

ও মুর্শীদ তোমার লগে নাই তো অভিমান
আইলে আও, যাইলে যাও, ঠেলে মারো টান
ও মুর্শীদ নাই তো অভিমান।
বাচ্চারে যে ঠ্যালা মারলে কান্দ্যা পড়ে মায়ের কোলে
যতো মারো বাঁচ্যা উঠে তত পরাণখান।
ও গুরু নাই তো অভিমান
তুলাধূনা কর্যা, মৌলা, ফেলাও না ফের জান।
করো না খান্ খান্।
জানুক না জাহান্।
মস্তান ফকিরে কয় হেন আমার মনে লয়
গুরুর মনে হৈল ভয়, পায়ে দিল স্থান
ও মুর্শীদ গেল অভিমান।

এবারে গুল বাহাদুরের গীতটি বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু খটকা লাগলো 'অভিমান' শব্দটি নিয়ে।

মোতী বললে, 'এতে আবার মুশকিল কোথায় ? এই মনে করো আনন্দী যদি তোমার উপর রাগ করে খিচুড়ি আলুরদম না খেয়ে শুতে যায় তবে সে তোমার উপর অভিমান করল।'

গুল বাহাদুর বললেন. 'সে তো হল রাগ।'

মোতী বললে. 'তা নয়। যদি সে তখন তোমার ভাতে ছাই মিশিয়ে দেয় তবে হবে রাগ।'

এবারে গুল বাহাদুর অনেকখানি বুঝতে পেরে বললেন, 'ওঃ, তাই তুমি আমার উপর অভিমান করে বাইরে বসে ছিলে ?'

মোতী উত্তর দিলে না।

গুল বাহাদুর শোধালেন, 'এ গীত তুমি কাকে শোনালে ?'

মোতী নির্ভয়ে উত্তর দিলে 'তোমাকে, মুর্শীদকে, আর কাকে ?'

'তোমার মুর্শীদ কে ?

মোতী হেসে উঠলো। বললো, 'আজ দেখি, তুমি অনেক কথাই শুধচ্ছো। কেন হিংসে হচ্ছে নাকি ? হ্যাঁ আছে একজন। কিন্তু সে বড্ড বুড়ো। সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'ছিঃ, গুরুকে নিয়ে কি এ ধরণের মস্করা করতে আছে ?'

মোতী বললে, 'মস্করা কিসের ? এই তো আমার সব। আমার জান ভরে দেবে মহব্বৎ দিয়ে সে তো সব গীতেই আছে। আর আমার শরীরটা ? সে বুঝি কিছু নয় ? গুরু আমার সব আশা পূর্ণ করবে না ?'

গুল বাহাদুর নিরাশ হয়ে বললেন, 'তুমি সব সময় কেমন যেন হেঁয়ালিতে কথা কও। তোমার আশা যদি পাপে ভরা হয় তবে সেটাও গুরু পূর্ণ করবেন নাকি ?'

মোতী চিন্তা না করেই বললে, 'নিজেই জানিনে কি চাই। কখনো ইচ্ছে করে মা হয়ে ছেলে কোলে নিতে, কখনো বা স্বামী পেতে ইচ্ছে করে, আর কখনো মনে হয় তুচ্ছাই, এসব দিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে একটি নাগর পেলে হয়। ঐ যে রকম তোমাদের রাধা ঠাকুরাণী কেষ্ট-মুরারীকে পেয়েছিলেন। রসের সায়রে সুবো-শাম ডুবে থাকবো। আমার শরীর ওর শরীরে মিশে যাবে।'

গুল বাহাদুর হাসিমুখে বললেন, 'যাক্, বাঁচালে। মনের কেষ্টকে দিলের হরি বানিয়ে পড়ে থাকো। কোন বদনাম হবে না।'

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মোতী বললে, 'ছোঃ। বদনাম। ডপকী রাঢ়ী। নিকে করিনে। একলা পড়ে আছি। আমার বদনাম তো লেগেই আছে। নাগর নিলে তার আর বাড়বে কি ? মড়ার গোরের

উপর একমণও মাটি শ' মণও মাটি। আমি তাকে সাঁঝ-সকাল কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসবো—হাটে যাবার পথের পাশে।'

গুল বাহাদুর ভাবলেন, মেয়েটা বদ্ধ পাগল। তারপর ভাবলেন, কিন্তু এরকম সাদা যার দিল তার আর ভাবনা কি? এর ভিতর বাহির দুইই সাফ। বললেন, 'এসব খেয়ালী পোলাও খেয়ে তুমি খুব সুখ পাও—না? কিন্তু যত্রতত্র বলে বেড়িয়ো না।'

মোতীর মা সেদিকে খেয়াল না দিয়ে শুধালে, 'তোমার সম্বন্ধে বেবাক বাৎ আমার শুনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বাবাজীদের তো ঘর-গেরস্তীর কথা শোধানো বারণ। তবে যদি অভয় দাও তয় একটি কথা শুধাই।'

গুল বাহাদুর হেসে বললেন, 'নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করো। আমার কিচ্ছুটি লুকোবার নেই। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল গোঁপে চাড়া দেবার। কিন্তু গোঁফ তো আর নেই।

'তোমার বিয়ে-শাদী হয় নি?'

'না।'

'কারোতে মজো নি?'

'না। তবে লক্ষ্ণৌ থেকে একবার একটি বাঈজী এসেছিল। যেমন নাচতে পারতো, তেমনি গান জানতো, তেমনি ছিল চেহারাটি। তাকে বড় ভালো লেগেছিল।'

'তারপর কি হল?'

'কিছুই হল না। আমি অন্য কাজে জড়িয়ে পড়লুম। তারপর এখানে চলে এলুম।'

'ও। কোনো কেলেঙ্কারী করে ভেক নাও নি?'

বোষ্টমদের প্রতি গুল বাহাদুরের কোনো অহেতুক প্রেম ছিল না, কিন্তু তারা 'কেলেঙ্কারী' করলেই শুধু ভেক নেয়, এ ইঙ্গিতটা তাঁর ভালো লাগলো না।

বললেন, 'কুল্লে বোষ্টমরা পাষণ্ড?'

'অতো রাগো কেন? আমাদের মুসলমান পীরসায়েবদের দেখোনি? তাঁরা যে তাঁদের চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখেন?

'সে আবার কি?'

'ঐ, আমার মতো গোটা দশেক খাপসুরৎ ডপকী ছুঁড়ির মধ্যিখানে বসে ভাবখানা করেন,

'হেরো. হেরো, আগুন আমারে ছোঁয় না।'

'তারপর?'

'তারপর, আর কি, তারপর বিস্তর ঘি গলে যায়।'

গুল বাহাদুর খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি অতশত বলছো-কইছো, শুনছো-শোনাচ্ছো কেন বলো তো। আসলে তোমার মৎলবটা কি খুলে বলো তো।'

মোতী গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল। বললে, 'মতলব কিছুই নয়, গোঁসাই। আমি ভেবেছিলুম, তুমি নষ্টামি করে বেরিয়ে এসেছো। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার সঙ্গে নষ্টামি করে আমি নষ্ট হব। এই আমার শরীর, এই আমার দিল। ওগুলো যখন কোনো কাজেই লাগলো না, তখন না হয় ভেঙ্গেই দেখি, কি হয়। তা আর হ'লো না। তুমি বড় সরল, বড় সাদা। তোমার সঙ্গে বনলো না।'

গুল বাহাদুর আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ওটা মিথ্যে কথা। তোমার সবই ভালো। আমি অনেক দেখেছি, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি। অবশ্য আমার সঙ্গে বনলো কি না সে অন্য কথা।'

মোতী আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আমার যদি সবই ভালো তবে তাই হোক ঠাকুর। এবারে তোমাকে শেষ প্রশ্ন শুধাই। তোমার সংসারে মন বসলো কেন, সেইটে আমায় বলো।'

গুল বাহাদুর বললেন, 'সংসারে আমার রত্তিভর অরুচি হয় নি, মোতী। আসলে আমি শিবুর মত গদরের সেপাই। তোমার স্বামীর

যা হওয়ার কথা ছিল। লড়াইয়ে হেরে গা ঢাকা দিয়েছি। ভেক নিয়েছি যাতে করে দুশ্‌মন্‌ চিনতে না পারে—

আমি মুসলমান।'

* * *

লেখকের নিবেদন :

এখানেই 'এক পুরুষ' শেষ।

বইখানা 'তিন পুরুষ'-এ সমাপ্ত করার বাসনা ছিল ; কিন্তু আমার গুরুই যখন 'তিন পুরুষ' লিখতে গিয়ে এক পুরুষে সমাপ্ত করে সেটিকে 'যোগাযোগ' নাম দিলেন তখন যাঁর কৃপায় 'মূক বাচাল হয়', তাঁরই কৃপায় এস্থলে 'বাচাল মূক হল'।

কবিরাজ চেখফ

উত্তম গুরুর সদুপদেশ পেলেই যদি সার্থক লেখক সৃষ্টি হতেন তবে ইহসংসারে আমাদের আর কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। কারণ আমার বিশ্বাস, এতাবৎ বহুতর গুরু অপ্রচুর পুস্তকে নানাবিধ সদুপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, এবং সদুপদেশতিয়াষী তরুণ সাহিত্যযশাভি-লাষীরও অনটন এই বঙ্গদেশে নেই।

আমি সার্থক সাহিত্যিক নই, তবে কিছুটা লোকায়ত ('জনপ্রিয়' বললে বড্ড বেশি দম্ভভাষণ হয়ে যায়) বটি। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি সোল্লাসে বলেছিলেন, 'আপনার লেখা পড়লেই পাঁচকড়ি দে'র কথা আমার মনে আসে।'

আমি সাতিশয় শ্লাঘা অনুভব করেছিলুম। আমি জানি আপনারা পাঁচজন পাঁচকড়িকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। যদিও শুঝোই, বুকে হাত দিয়ে উত্তর দিন তো, পনেরো বছর বয়েসে পাঁচকড়ি পড়ে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়স্তম্ভন হয়নি? আপনার চৈতন্যকে এরকম সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ একাগ্রমনা করতে পেরেছেন ক'জন লেখক? এবং স্বয়ং গীতা বলেন. চৈতন্যকে সর্বপ্রথম নিষ্কম্প প্রদীপশিখার ন্যায় একাগ্র করে তবে ধ্যানলোকে প্রবেশ করবে। স্বয়ং পতঞ্জলিও বলেন, 'ধ্যানের বিষয়বস্তু অবান্তর।' তা সে যাক্। আসল কথা সে বয়সে পাঁচকড়ি আপনাকে এমনি একাগ্রমনা করে দিয়েছিলেন যে আপনি তখন দেশকালপাত্র ভুলে গিয়েছিলেন। এবং এটা যে আর্টের অন্যতম লক্ষণ সেটি সর্বজনবিদিত। তা হলে আজ আপনি পাঁচকড়ির নামে নাক সেঁটকান কেন? পাঁচকড়ি পড়ার পূর্বে সাত বছর বয়েসে আপনি রূপকথা পড়েছিলেন, আজ পড়েন না, কিন্তু তাই বলে তো আপনি ওর পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসেন না। কেন?

টলস্টয় বলেন, যে বই সর্বযুগে সর্ববয়সের লোক পড়ে আনন্দ পায় সেই বইই উত্তম বই। সে রকম বই ইহসংসারে অতিশয় বিরল। টলস্টয় মহাভারতের নাম করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ একমত। (তিনি তাঁর নিজের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'র নিন্দা করেছেন। আমরা একমত নই।)

অতি অল্প লেখককেই টলস্টয় আর্টিস্ট বা সৃষ্টিকর্তা রূপে স্বীকার করেছেন। চেখফ তাঁদেরই একজন। (১) তাঁকে তিনি বলেছেন, রিয়েল আর্টিস্ট ;—পাঠক সেটি পরে সবিস্তর শুনতে পাবেন।

চেখফের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

প্রথম ছবি দেখি, রুশের এক গণ্ডগ্রামে ঘরের ছেলে চেখফ গাঁয়ের পাঁচজন মাতব্বরের চালচলন কথাবার্তার ভঙ্গির অনুকরণ করে বাড়ির পাঁচজনকে হাসাচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্লাসের সর্দার পড়ুয়াও বটে।

তার পরের ছবি দেখি মস্কোতে। গরীব পরিবারে। একটা ছোট্ট ঘরে মা কচুঘেঁচু রাঁধছেন, বাবা অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনে গজ্ গজ্ করছেন, ভাইবোনেরা কিচিরমিচির করছে, আর মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র চেখফ—বয়েস উনিশ—তারই এককোণে, হট্টগোল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, খস্ খস্ করে পাতার পর পাতা ফার্স লিখে যাচ্ছেন। তিনি জানেন, খুব ভালো করেই জানেন, রসিকতাগুলো কাঁচা, কিন্তু তার চেয়েও ভালো করেই জানেন, খবরের কাগজের গ্রাহক রামাশামা এ ধরনের রসিকতাই পছন্দ করে, সম্পাদক মশাইও সেই মালই চান। লেখা শেষ হল।

---

(১) টলস্টয় চেখফকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে একদিন টলস্টয়ের বাড়ি ইয়াসানা পলিয়ানাতে যখন তিনি আর গর্কি বসে গল্প করছেন তখন চেখফ বাগানের অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে টলস্টয় গর্কিকে বলেন, 'জানো, গর্কি, চেখফ যদি মেয়েছেলে হত তবে আমি ওকে বিয়ে না করে থাকতে পারতুম না।' যাঁরা বর্তমান লেখকের অত্যধিক বাগাড়ম্বর অপছন্দ করেন তাঁরা বাকি প্রবন্ধ না পড়ে সোজা চেখফের 'দুলালী'-গল্পের অনুবাদে চলে যাবেন।

রান্না তখনো শেষ হয়নি। চেখফ ছোট ভাইকে বললেন, 'লেখাটা নিয়ে যা তো অমুক পত্রিকার আপিসে। দু পাঁচ টাকা যদি দেয় তবে কিছু কাবাব-টাবাব কিনে আনিস। কচুঘেঁচু গেলার সুবিধে হবে।'

এর পাঁচ বছর পর চেখফ মেডিকেল কলেজ পাশ করলেন।

কিন্তু ভালো করে প্র্যাকটিস করা চেখফের আর হয়ে উঠলো না। ইতিমধ্যে রুশদেশ জেনে গিয়েছে, চেখফের সার্জিকাল ছুরির চেয়ে তার কলমের ধার বেশী। তবু সরকার তাঁকে পাঠালেন সাখেলিন দ্বীপের কয়েদীদের সম্বন্ধে মেডিকাল তদন্ত করতে। সে রিপোর্ট তিনি এমনই বুক-ফাটানো জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন যে তারই ফলে সরকার কয়েদীদের জন্য বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এ রিপোর্টখানা আমি কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমার বড় বাসনা ছিল দেখবার, সাহিত্যিক যখন মেডিকেল রির্পোট লেখে তখন তার কলম কি ভাবে চালায়? যংযত করে? যাতে করে লোকে না ভাবে সাহিত্যিক তার হৃদয়-উচ্ছ্বাস দিয়ে তথ্যের দীনতা ঢাকতে চেয়েছে—কেসে পয়েন্ট না থাকলে উকীল যে রকম গরম লেকচার ঝাড়ে আর টেবিল থাবড়ায়। কিংবা তাঁর জোরদার কলম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে? কিংবা উভয়ের অভূতপুর্ব সংমিশ্রণে? রবীন্দ্রনাথ যখন সভ্যতার সংকট লিখেছিলেন তখন তাঁর লেখনে কতখানি রাষ্ট্রদর্শন আর কতখানি কবির তীব্র হৃদয়-বেদনার পরিপূর্ণ প্রকাশ!

তারপর একবার লেগে যায় রুশ দেশে জোর কলেরা। সেই এক বছর চেখফ ডাক্তারি করেন প্রাণপণ। ব্যস্।

খাস পশ্চিমের লোক বয়েস হওয়ার পর বিয়ে-শাদী করে কস্মিনকালেও বাপমায়ের সঙ্গে বসবাস করে না। ভিন্ন সংসার পাতে। রুশদেশ বোধহয় কিছুটা প্রাচ্যের আমেজ ধরে।

কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই চেখফ গ্রামাঞ্চলে কিঞ্চিৎ

জমিজমা ও ছোট্ট একটি বসত-বাড়ি কিনলেন। বাপ মায়ের সঙ্গে সেখানে ছ'টি বৎসর চেখফ বড় আনন্দে কাটালেন। চেখফের সমগোত্রীয় আরেকজন অতিশয় দরদী লেখক, আলফঁস দোদেও ঠিক ঐরকমই মোটামুটি ঐ সময়েই অসুরের মত খেটে পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ মাকে গ্রাম থেকে এনে প্যারিসে আরামে রেখেছিলেন। জীবনের এই ছ'টি বৎসর চেখফের বড় শান্তি আর আনন্দের মধ্যে কাটে। এর পরই দেখা দিল তাঁর শরীরে ক্ষয়রোগের চিহ্ন এবং বাকি জীবনের অধিকাংশ তাঁকে কাটাতে হয় ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে, সমুদ্রপারে। চেখফের বয়স তখন একচল্লিশ। তাঁর ক্ষয়রোগের কথা জেনেশুনেও তাঁরই নাট্যের অসাধারণ সুন্দরী এক অভিনেত্রী তাঁকে বিয়ে করেন। তিন বৎসর পর খ্যাতির মধ্যগগনে চেখফ-ভাস্কর অস্ত গেল। দাম্পত্য জীবনে সুখ বলতে তাঁর স্ত্রী পেয়েছিলেন স্বামীকে সেবা করার আনন্দ। অভিনেত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কয়। তাই বলে নেওয়া ভালো, চেখফের স্ত্রী বিধবা হওয়ার পর বাকি জীবন নির্জনে অতিবাহিত করেন। মডার্ন গল্প-উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা বোধহয় তাজ্জব মানবেন। চেখফের বিধবা তখন যুবতী। রুশে বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় তো নয়ই, যুবতী বিধবা পুনরায় বিয়ে না করলে তাকে 'আহাম্মুখ' আখ্যা দেওয়া হয়। মা হওয়ার গৌরব থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তিনি ত্যাগ ও প্রেমের নিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। একথাটা বলতে হলো চেখফ-চরিত্র বোঝাবার জন্য। তিনি নিশ্চয়ই এমনই গভীর প্রেম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর জীবন উদ্দীপ্ত করে দিয়েছিলেন যে সেই দীপ্তদীক্ষায় প্রজ্বলিত তাঁর প্রেম-প্রদীপ চেখফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাপিত হল না। তারই অনির্বাণ বহ্নিতে তাঁর ভবিষ্যতের পথ আলোকিত হয়ে রইল।

চেখফের জীবন সংক্ষিপ্ত ও আদৌ ঘটনাবহুল নহে। যে কটি ছবি আমাদের চোখের সামনে আসে সেগুলিই মধুর। শুধু শেষের

চিত্রটি বড় করুণ। রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে আজীবন বিলাসে লালিতা এই যে অসাধারণ গুণবতী রমণী তাঁর স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য কন্টিনেন্টের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যনিবাস থেকে স্বাস্থ্যনিবাস, এক ধন্বন্তরী থেকে অন্য ধন্বন্তরীর পদপ্রান্তে পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করলে, আপন হৃদয়াবেগ শান্ত মুখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, কত না বিনিদ্র যামিনী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কাটালে, অসীম ধৈর্যে মিশ্রিত অক্ষয় সেবায় ক্ষয়রোগীর প্রতিটি পীড়িত মুহূর্তের যন্ত্রণাভার লাঘব করলে—এ ছবিটি একাধিক রুশ লেখক এঁকেছেন।

টলস্টয়ের বৃদ্ধ বয়সে চেখফের তিরোধান তাঁর বুকে বড় বেজেছিল —চেখফকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গর্কি তখন লেখেন চেখফ সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ইয়াসানা পলিয়ানাতে এই ত্রিমূর্তির আলাপ আলোচনা, হৃদ্যতার আদান-প্রদান সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোরম একাধিক প্রবন্ধ রুশ ভাষায় বেরিয়েছে। চেখফ স্বয়ং তাঁর 'নোটবুকে' কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। টলস্টয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। অবশ্য সে-শ্রদ্ধা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি টলস্টয়ের 'নীতিমূলক' (স্টরি উইত এ মরাল) গল্পের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু রিয়েল আর্টিস্ট (টলস্টয়ের ভাষায়) তো বেশীদিন অন্যের পথে চলতে পারে না—তা সে-পথ যতই শানবাঁধানো প্রশস্ত হক না কেন।

গর্কি তাঁর নাট্যরচনায় চেখফের অনুকরণ করেছেন। এস্থলে পাঠক-পাঠিকার স্মরণার্থে উল্লেখ করি,

টলস্টয়ঃ জন্ম ১৮২৮ মৃত্যু ১৯১০
চেখফঃ " ১৮৬০ " ১৯০৪
গর্কিঃ " ১৮৬৮ " ১৯৩৬॥

চেখফ আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আমি এক যুগ ধরে লিখে যেতে পারি। তাঁর প্রতিটি গল্পের টীকা

লিখতে লিখতেই আমার বাকী জীবন কেটে যাবে। অথচ এই প্রবন্ধ শেষ করতে হবে, এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে এটি লিখছি সেটি ভুললেও চলবে না।

পূর্বেই বলেছি, বঙ্গসাহিত্যে আমি যশস্বী লেখক নই, কিন্তু পপুলার বটি। সেই কারণেই বোধহয়, আমি কিছু অনুরোধ পেয়েছি, পত্রলেখকদের জানাতে, কোন্ কোন্ লেখক পড়লে তাঁরা লাভবান হবেন। বিদায় নেবার প্রাক্কালে নিবেদন, ছোট গল্প দিয়েই সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করা প্রশস্ত এবং সম্মুখে চেখফের ফোটোগ্রাফ টাঙিয়ে নিয়ে। এমন কি যাঁরা পরবর্তীকালে উপন্যাস লিখবেন তাঁরাও চেখফ চেখে, শুঁকে, সর্বাঙ্গে মেখে উপকৃত হবেন। এ প্রবন্ধটি তাঁদেরই উদ্দেশে লেখা।

কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, রুশ সাহিত্যে চেখফের অনুকরণ করেছেন অনেকেই, কিন্তু 'টলস্টয়-ঘরানা', 'ডস্টয়েফাস্কি-ঘরানা'র মত 'চেখফ-ঘরানা' কখনো নির্মিত হয়নি। তার কারণ চেখফকে অনুকরণ করা অসম্ভব।

তবে সে উপদেশ দিচ্ছি কেন?

কারণ অসম্ভবের চেষ্টা করলেই সম্ভবটা হাতে আসে, সম্ভব হয়।

*　　*　　*　　*

চেখফের আছে কি?

অদ্ভুত সহানুভূতি। সমবেদনা। সহানুভূতি সমবেদনা বললে কমই বলা হয়। মপাসাঁর 'বুল্ দ্য সুইফ্' ('চর্বির গোলা,' 'এ বল অব্ ফ্যাট') যখন ঘোড়াগাড়িতে ফিরে অঝোরে কাঁদছে তখন মপাসাঁও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেন, কিন্তু চেখফ যখন তাঁর কোচম্যানের দুঃখের কাহিনী বলেন তখন মনে হয় তিনি স্বয়ংই যেন সেই ক্যোচম্যান।

গল্পটির প্লট এতই সরল যে কয়েক ছত্রে বলা যায়। এক ছ্যাকড়া গাড়ির কোচম্যান শহরে গাড়ি খাটায়, একমাত্র ছেলে থাকে গ্রামে।

হঠাৎ খবর পেল তার সে জোয়ান ছেলে মারা গিয়েছে। বুড়োর তিন কুলে কেউ নেই যাকে সে তার দুঃখের কাহিনী বলে। পেটের ধান্দায় বেরোতে হয়েছে গাড়ি নিয়ে। উঠেছে এক সোয়ারি। বুড়ো কোচম্যান আস্তে আস্তে আলাপচারী জমিয়ে যখন তার পুত্রশোকের কাহিনী বলতে যাবে, তখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সোয়ারি ঘুমিয়ে পড়েছে। থামতে হল। তারপর উঠলেন এক জেনরেল। 'জলদি চলো, জলদি চলো' আর ধমকের চোটে সে তার কাহিনী আরম্ভ করেও শেষ করতে পারলো না। তারপর উঠলো জনাতিনেক ছাত্র। তাদের হৈ হল্লার মাঝখানে বুড়ো কোনো পাত্তাই পেল না। তার উপর উঠলেন আর এক ভদ্রলোক—ভারী দরদী। তাকে যখন দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে পুত্রের মৃত্যু সংবাদটা দেবে ঠিক তখনই তিনি বলে উঠলেন, 'থ্যাঙ্ক গড্। ঐ আমার বাড়ি। পৌঁচে গিয়েছি।' বলা হল না। রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে। বুড়ো বাড়ি ফিরল। ঘোড়াটাকে দানা দিয়ে ডলাই মলাই করতে করতে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল 'তোকে কি আর আমি ভালো করে ডলাই-মলাই করতে পারি, বাছা। বুড়ো হাড়ে আর কি আমার তাগৎ আছে? থাকতো আমার ছেলে। তাকে তো তুই চিনিসনে। হ্যাঁ, তার ছিল গায়ে জোর। হ্যাঁ সত্যি বলছি। সে যদি থাকতো আজ, তবে বুঝিয়ে দিত ডলাই-মলাই কারে কয়।' ঘোড়াটা আপন খেয়ালে গর্‌র্‌র্ করে নাক দিয়ে শব্দ ছাড়লো। কেমন যেন দরদ-ভরা —অন্তত বুড়োর তাই মনে হল।

তখন—তখন—? বুড়ো ঘোড়াটাকে তার শোকের কাহিনী বলে দিল। (২)

যতবার গল্পটি পড়ি চোখে জল ভরে আসে—এখন আরো বেশী, কারণ আমার বয়েস ঐ কোচম্যানেরই কাছাকাছি—আর মনে হয়,

(২) গল্পটির প্লট আমার ঠিক ঠিক মনে নেই; তবে হরেদরে এই।

কে বলে চেখফ ডাক্তার ছিলেন, কে বলে তিনি রূপসী অভিনেত্রী বিয়ে করেছিলেন, কে বলে তিনি টলস্টয়ের বন্ধু? তিনি নিশ্চয় ছিলেন ঐ কোচম্যান।

অনুকরণ করুন এই গল্পটির। কিংবা আরম্ভ করুন অন্যভাবে।

যেমন মনে করুন আপনার প্রিয়া সর্বাংশে আপনার চেয়ে গুণবান একটি 'লভার' পেয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন তার সঙ্গে। আপনি ঘন ঘন 'উদভ্রান্ত প্রেম' পড়ে হৃদয়বেদনায় মালিশ করছেন, কিন্তু কোনো ফায়দা ওৎরাচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনার এক্স-বান্ধবীর এক বান্ধবী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত আরেক ভদ্রলোকও আপনার বন্ধু। আপনি ভাবলেন, 'তাঁদের কাছে গিয়ে আমার দুঃখের কাহিনী কই।' দুজনাই বড় দরদী। দুজনাই আপনার আপসাআপসি সাতিশয় মনযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু হায়, শেষটায় দেখলেন, ওদের দুজনারই পাকা রায়, আপনাকে কলার খোসাটির মত রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনার প্রিয়া অতিশয় বিচক্ষণার কর্ম করেছেন!

এটা আপনি ব্যঙ্গ করে লিখতে পারেন, হাস্যরসে ভর্তি করে লিখতে পারেন, দুঘটি চোখের জল ফেলে করুণ রসে ঢেলে বানিয়ে লিখতে পারেন, যৌন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ দিয়েও লিখতে পারেন—কিন্তু আপনি চেখফ হবেন তখনই যখন পাঠক পড়ে মনে করবে ইটি একান্ত আপনারই অভিজ্ঞতা। অথচ আপনার এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আদপেই হয়নি। আমার কাছে প্লটটি শুনে, এবং চেখফের কোচম্যানের গল্পটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন মাত্র॥

এবারে টেকনিকাল দিক।

এখানে এসে সর্ব আলঙ্কারিকের ওয়াটারলু।

রস কি, এস্থলে কথাসাহিত্যে কি, সে-বস্তু যা আমাদের মনে কলারসের সঞ্চার করে—সেটাকে যদি বা কোনো গতিকে সংজ্ঞাবদ্ধ

বর্ণনাসম্ভব করা যায়, তবু করা যায় না রসসৃষ্টি হয় কোন্ উপাদানে, কোন্ প্রক্রিয়ায় !

কাজেই আমি সামান্য দুটি নির্দেশ দেব।

প্রথম বাক্‌সংযম। 'সে বলে বিস্তর মিছা যে বলে বিস্তর'— বলেছেন ভারতচন্দ্র। এ-স্থলে 'সে রচে নিরস রস যে বলে বিস্তর।'

এখানে চীনা চিত্রকরদের কথা স্মরণে আনবেন। পাঁচটি আঁচড়ে আঁকা বাঁশের মগডালে একটি পাতা—আপনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন পাতাটি ফর ফর করছে। তিনটি আঁচড়ে আঁকা একটি উড়ন্ত হাঁস। আপনি দেখতে পেলেন যেন নীলাকাশে শরতের সাদা মেঘ—ভালো করে তাকানোই যায় না, চোখ ঝলসে দেয়।

তার অর্থ উড়ন্ত হাঁস আঁকার সময় চিত্রকর সম্পূর্ণ হাঁস আঁকেন নি। ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় বিন্দু ও বক্ররেখা (পইণ্ট কার্ভ) দিলে পাঠকের মন নিজেই বাকিটা এঁকে নেবে, পাঠকের চোখ নিজেই বাকিটা দেখে নেবে ঠিক সেই সেই জায়গায় চিত্রকর তুলি ছুঁইয়েছেন।

চেখফও ঠিক তাই করতেন। কয়েকটি পইণ্ট ও কার্ভ—শব্দের মারফতে—এমনই ভাবে এঁকে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ ছবিটি চোখের সামনে জলজল করতে থাকে। শুধু তাই নয়, এমনই সূক্ষ্ম দানা-ওলা ফিলমে তোলা ফোটোগ্রাফ যে যার যেমন কল্পনার লেন্‌স্ সে তেমনি বিরাট আকারে সেটিকে এনলার্জ করতে পারে। কোচম্যান চেষ্টা করেছিল তিন না চার টাইপের সোয়ারির কাছে তার হৃদয়বেদনা প্রকাশ করার ; আপনি দেখতে পাবেন সে তাবৎ মস্কো শহরের লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দুয়ারে শির হেনে হেনে হতাশ হচ্ছে। আর সেই দরদী ঘোড়ার গর্‌র্‌র্ শব্দ যে শুধু শুনতে পাবেন তাই নয়, শুনতে পাবেন সে যেন বহু আগের থেকেই কোচম্যানকে বলছে, 'কেন তুমি আজেবাজে লোকের কাছে এসব দুঃখের কথা বলতে যাও ? কে বুঝবে তোমার হৃদয়-বেদনা ? সবাই আপন স্বার্থ নিয়ে

মগ্ন। বলো, আমাকে। হাল্কা হবে।' তারপর হয়তো আপন মনে বলছে, 'জানি তো সবই। কিন্তু হায় করি কি? এ যে ভগবানের মার।'

গুণীরা বলেন সর্বনিম্নে জড়জগৎ, তারপর তৃণজগৎ, তারপর পশু-জগৎ—সর্ব্বোচ্চে মানুষ। চেখফের গল্পটি পড়ার পর মত পালটাতে হয়।

এ স্থলেই ক্ষান্ত হোক, আমার অক্ষম লেখনীর ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

এইবারে পড়ুন চেখফের একটি গল্পের বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদটি করেছেন আমারই অনুরোধে, আমার সখা মৌলানা খাফী খান। 'যদ্দৃষ্টং' এবং 'প্রিয়াঙ্গী'র লেখক।

দুলালী

ওলেঙ্কা অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসেসর প্লেম্‌ইয়ান্নিকভের মেয়ে। সে ভাবনায় ডুবে বসেছিল উঠোনের সামনে ছোট্ট বারান্দাটিতে।

গরম, মাছিগুলো আঠার মত লেগে আছে, বিরক্ত করছে। একটু বাদেই যে সন্ধ্যে হবে সে কথা ভাবতে ভালোই লাগছে। পূব দিক থেকে থেকে ঘন কালো মেঘ এসে জমা হচ্ছে, সেই সঙ্গে থেকে থেকে ভিজে হাওয়ার আমেজ আসছে।

উঠোনের মধ্যিখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কুকিন্। লোকটি থিয়েটারের ম্যানেজার, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বাগানে একটি আনন্দ-মেলার আসর জমায় নাম 'তিভলি প্রমোদ উদ্যান।' থাকে ওলেঙ্কাদের বাড়ির একপাশে ভাড়া নিয়ে।

কুকিন্ হতাশ হয়ে বলল, 'আবার! আবার এল বৃষ্টি। রোজ বৃষ্টি, রোজ, যেন আমাকে নাকাল করার জন্যেই নামে!' গলায়

দড়ি দিই না কেন? সর্বস্ব গেল। দিন দিন লোকসান আর লোকসান!"

দুহাত জুড়ে ওলেঙ্কার দিকে ফিরে কুকিন্ আবার বলতে লাগল, "এই তো জীবন আমাদের, ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভ্‌না। দু চোখ ফেটে জল আসে। খেটে মরি, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করি, সারারাত জেগে ভাবি কী করে জিনিসটাকে উঁচুদরের করে তোলা যায়। হয় কী? এদিকে দেখ, লোকগুলোকে—আহাম্মুক, বর্বর।

আমি ওদের দেখাই সেরার সেরা ছোট ছোট অপেরা, কথা-ছাড়া শুধু ভঙ্গী দিয়ে বোঝানো নাটক, অপূর্ব অপূর্ব ভ্যারাইটি আর্টিষ্ট। কিন্তু ওরা কি ও জিনিস চায়? বোঝে তার মর্ম? ওরা শুধু চায় হৈ-হুল্লোড়! ওদের দেখাতে হয় রদ্দি চীজ।

আবার ইদিকে দেখ আবহাওয়াখানা! প্রায় প্রতি সন্ধ্যেয় বৃষ্টি! ১০ই মে থেকে শুরু হল, চল্‌ছে রোজ, গোটা মে-জুন মাসটাই! দর্শকের দেখা নেই, অথচ বাগান-ভাড়াটা? সেটি ঠিক ধ'রে দিতে হয়। আর গাইয়ে-বাজিয়েদের মাইনেটা?"

পরদিন্ সন্ধ্যের দিকে আবার দেখা দিল মেঘ। হি হি করে হেসে উঠল কুকিন্। বল্‌লে,

"এসো, এসো বৃষ্টি! দাও ভাসিয়ে আমার প্রমোদ উদ্যান। সব ডোবাও, তারপর আমাকেও ডোবাও। আমার ইহলোক পরলোক দুইই মজুক! মামলা করুক আমার আর্টিষ্টরা আমার নামে, পাঠাক জেলে—সাইবীরিয়ায় নির্বাসনে—ফাঁসিকাঠে! হাহা হাহাঃ।"

তার পর দিন আবার ঐ।

ওলেঙ্কা চিন্তিত মুখে, নীরবে কুকিনের কথাগুলি শুন্‌ত। মাঝে মাঝে তার চোখে জল এসে পড়ত। এত উতলা হয়ে উঠত তার মন কুকিনের দুর্ভাগ্যে, যে শেষ অবধি সে ওর প্রেমেই পড়ে গেল।

কুকিনের মানুষটি বেঁটে, রোগা। মুখখানা ফ্যাকাশে। চুল,

আঁচড়ে রগের ওপর টেনে নামানো। সরুগলায় কথা কয়, মুখ এক-পাশে বেঁকিয়ে। চেহারায় চিরকেলে নৈরাশ্যের ছাপ। তবু সে ওলেঙ্কার মনে গভীর এবং অকৃত্রিম একটি ভাব জাগিয়ে তুল্‌ল।

ওলেঙ্কা সর্বদাই কারো না কারো প্রেমে অভিভূত হয়ে থাকত। প্রথমে ছিল বাবা। এখন তিনি রুগ্ন; অন্ধকার একখানা ঘরে সারাদিন আরামকেদারায় বসে তাঁর দিন কাটে। শ্বাসকষ্টে কাতর।

তারপর সে ভালোবাসলো তার এক খুড়িমাকে। তিনি থাকতেন ব্রিয়ান্‌স্কে, দু বছরে একবার করে আসতেন। তার আগে, যখন সে ইস্কুলে পড়ত, তখন তার প্রেমপাত্রী ছিল তার ফরাসী শিক্ষিকা।

ওলেঙ্কা মেয়েটি শান্ত, সহৃদয়—বড় ভালো স্বভাবের। চোখ দুটি ভীরু, নিরীহ। নিটোল স্বাস্থ্য। তার টলটলে, লাল্‌চে গালদুখানি, ধপধপে সাদা নরম তুলতুলে ঘাড়ের উপর ছোট্ট কালো তিলটি, আর সরল স্নিগ্ধ যে হাসিটি ফুটে উঠত তার মুখে খুশীর কোনো কথা শুনলেই, তা দেখে ছেলেরা ভাব্‌ত "মন্দ নয় তো মেয়েটি, বেশ," হাসতও। আর মেয়েরা তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ তার হাতখানি ধরে বলে উঠত, কথার মধ্যিখানে, আনন্দের—উচ্ছ্বাসে "ও দুলালী!"

জন্ম থেকে যে বাড়িতে ওলেঙ্কার বাস, তার বাবার উইল অনুযায়ী সেটী তারই প্রাপ্য। বাড়িখানা ছিল শহরের একটু বাইরের দিকে, জিপ্‌সী রোডের উপর। প্রমোদ উদ্যান "তিভলি" থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে যখন সন্ধ্যেবেলায় বা রাত্রে বাজনা বাজত, বাজি ফুটত, ওলেঙ্কার মনে হত যেন যুদ্ধ বেধেছে কুকিনের সঙ্গে তার নিয়তির। কুকিন্ লড়ছে, তার প্রধান শত্রু নিঃসাড় দর্শকগুলোর সঙ্গে। অমনি ওলেঙ্কার মন গলে যেত। ঘুমতে ইচ্ছে করত না। ভোররাত্রে কুকিন্ যখন বাড়ি ফিরত, তখন ওলেঙ্কা তার শোবার ঘরের জানালায় আস্তে আস্তে টোকা দিত, আর পরদার ফাঁক দিয়ে শুধু তার

মুখখানা আর কাঁধের একটুখানি দেখিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসত, নরম হাসি।

কুকিন্ বিয়ের প্রস্তাব করল, বিয়ে হয়ে গেল। তারপর দেখল, বেশ ভালো করে, ওলেঙ্কার ঘাড়খানি আর তার সুন্দর, মোটা-সোটা কাঁধ দুটি। দেখে বলে উঠল, "দুলালী!"

কুকিন্ খুশী হল, তবে তার বিয়ের দিন এবং রাত্রেও বৃষ্টি হল, তাই মুখের নিরাশ ভাবটা বদলালো না।

দুজনের বনে গেল বেশ। ওলেঙ্কা টিকিট বিক্রির দিকটা দেখত, হিসেব রাখত, মাইনে পত্তর দিত। তার মিষ্টি ছলাকলাবর্জিত হাসিটিতে কখনো টিকিটঘর, কখনো খাবার দোকানটি, কখনো রঙ্গ-মঞ্চের দুটি পাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

বন্ধুদের সে বলতে আরম্ভ করল, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বস্তু হল নাট্য-শালা—প্রকৃত আমোদ একমাত্র এরই মধ্য দিয়ে পাওয়া যেতে পারে। এর দ্বারাই মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভদ্র এবং মানবতাবোধসম্পন্ন।

"কিন্তু লোকে কি তা বোঝে?" বলত ওলেঙ্কা। "ওরা চায় হৈ হুল্লোড়। কাল আমরা দেখালাম 'উল্টোপাল্টা ফাউস্ট্'—বক্স্ গুলোর প্রায় সবকটিই খালি রইল। কিন্তু যদি ভানিচ্কা আর আমি দেখাতাম ওঁচা একটা কিছু, দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত রঙ্গালয়। কাল ভানিচ্কা আর আমি দেখাচ্ছি 'নরকে অফেউস্'—নিশ্চয়ই এসো কিন্তু।"

কুকিন্ থায়েটর সম্বন্ধে অভিনেতাদের সম্বন্ধে যাই বল্ত ওলেঙ্কা তারই পুনরাবৃত্তি করত। কুকিনের মতোই সেও দর্শকদের অজ্ঞতা এবং রসবোধের অভাবকে ঘৃণা করত। মহড়ায় আসত ওলেঙ্কা, অভিনেতাদের ভুল শোধরাত, বাজিয়েদের গতিবিধির দিকে চোখ রাখত। খবরের কাগজে যদি খারাপ কিছু মন্তব্য করা হত তবে সে কেঁদে ফেলত, যেত সম্পাদকের কাছে, কৈফিয়ৎ চাইত।

অভিনেতারা তাকে ভালোবাসত, ডাকত "ভানিচ্‌কা আর আমি", "ছুলালী" বলে। ওলেঙ্কার ওদের জন্য কষ্ট হত, মাঝে মাঝে টাকা ধার দিত অল্প-স্বল্প, ঠকালে গোপনে চোখ মুছত, স্বামীর কাছে নালিশ করত না।

শীতের মরসুমেও ওদের গেল ভালোই। মিউনিসিপ্যালিটির থীয়েটরখানা ওরা ভাড়া নিল, নিয়ে অল্পদিনের মেয়াদে ভাড়া দিল উক্রাইন-দেশী একটা দলকে, এক জাছকরকে, স্থানীয় একটি নাটুকে সঙ্ঘকে।

ওলেঙ্কা হয়ে উঠল আরো গোলগাল, মুখে ফুটল কায়েমী একটা খুশীর জৌলুস, কুকিন্‌ হয়ে গেল আরো রোগা, মুখ হল আরো হল্‌দে। ভয়ানক লোকসানের বুলি তার মুখে লেগেই রইল, যদিও শীতের বাজারে ব্যবসা তার মোটেই খারাপ চলে নি।

কুকিন্‌ রাত্রে কাশে। ওলেঙ্কা ফলের রসের সঙ্গে ফুল মেড়ে তাকে খাওয়ায়, বুকে তেল মালিশ করে, নিজের নরম নরম শালগুলো দিয়ে তার গা ঢাকে।

বলে, "কী মিষ্টি তুমি মণি" চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, অন্তর থেকেই, "আমার স্থন্দর, আমার বুকের ধন।"

শীতের শেষে কুকিন্‌ গেল মস্কো, নতুন একটা দল নিয়ে আস্‌তে। ওলেঙ্কা কুকিন্‌ বিহনে ঘুমতে পারে না। সারারাত জানলার ধারে ব'সে তারার দিকে চেয়ে থাকে। মুরগী ঘরে মোরগ না থাকলে যেমন সারারাত অস্বস্তিতে কাটায়, জেগে থাকে; ওলেঙ্কারও তেমনি হয়।

মস্কোয় কুকিন্‌ আটকা পড়ে গেল। চিঠি দিল ওমাসে ঈস্টারের আগেই সে ফিরবে। তিভলির কাজকর্ম বুঝিয়ে লিখল।

যে সময় কুকিনের ফেরার কথা সেই সময়েই একদিন, দিনটা সোমবার, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ দরজায় অলুক্ষুণে রকমের একখানা ঘা পড়ল। সে কী আওয়াজ! যেন কেউ ঢাক পিটছে।

দড়াম দড়াম দমাদ্দম। রাঁধুনি মেয়েটা ঘুম চোখে খালি পায়ে থৈ থৈ জল ভেঙে ছুটল বেড়ার দরজা খুলতে।

দরজার ওধার থেকে হেঁড়েগলায় কে বলল, "দরজাটা খোলো তো, তোমার নামে তার এসেছে।"

ওলেঙ্কা আগেও পেয়েছে টেলিগ্রাম তার স্বামীর কাছ থেকে, কিন্তু এবারে কেমন যেন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। থর্ থর্ কাঁপা হাতে টেলিগ্রাম খুলে সে পড়ল ঃ

ইভান্ প্যেত্রোভিচ আজ হঠাৎ মারা গেল আগ্‌রা নির্দেশ সাপেক্ষ মঙ্গলবার শেষক্কৃত্য।

ঠিক এই ছিল টেলিগ্রামে, "শেষক্কৃত্য" আর অবোধ্য কথাটা "আগরা"। টেলিগ্রামে সই নাটুকে দলের বড়কর্তার।

ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার মণি, ভানিচ্‌কা, মণি আমার প্রিয়তম। কেন দেখা হলো আমাদের? কেন তোমায় জানলাম, ভালবাসলাম! তুমি তো ছেড়ে গেলে আমাকে, এখন তোমার দুঃখিনী ওলেঙ্কা কার পানে চাইবে?"

মঙ্গলবার কুকিন্‌কে ভাগান্‌কোভো গোরোস্থানে কবর দেওয়া হল। ওলেঙ্কা বাড়ি ফিরে এলো বুধবার, এসেই বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, এমন চেঁচিয়ে যে রাস্তা আর আশেপাশের বাড়ির উঠোন থেকে সে কান্না শোনা গেল।

পাড়াপড়শীরা ক্রুসের চিহ্নে বুকে মাথায় কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল আর বলল, "বেচারী দুলালী, ওল্‌গা সেম্‌ইয়ানভ্‌না! আহা, দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে বাছার।"

তিনমাস বাদে একদিন গির্জা থেকে ফিরছে ওলেঙ্কা। শোকে দুঃখে জর জর। ঘটনাচক্রে বাবাকায়েভ্ কাঠগোলার গোমস্তা ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্ পুস্তভালভ, সেও ফিরছিল গির্জা থেকে, তারই সঙ্গে হেঁটে এল। পুস্তভালভের মাথায় কেতাদুরুস্ত শাদা টুপী, পরনে শাদা ওয়েস্টকোট—তার ওপর ঝুলছে সোনার ঘড়ি চেন।

লোকটিকে দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ী, দেখায় জমিদারের মতো।

সে বললে গম্ভীর সুরে "যা কিছু ঘটে ওল্‌গা সেম্‌ইয়নভনা, সে সব ঘটে তাঁরই আদেশে।" স্বরে সমবেদনার রেশ। "প্রিয়জনদের কেউ যদি চলে যায়, তবে তার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। বুক বেঁধে মাথা নত করে তা আমাদের মেনে নিতে হবে।"

ওলেঙ্কাকে বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে পুস্তভালভ বিদায় নিল। ওলেঙ্কা সারাদিন ধরে শুনল তার গম্ভীর গলার আওয়াজ। চোখ যখন জুড়ে এল, স্বপ্নে দেখল তার কালো দাড়ি। বড় ভালো লাগলো তাকে ওলেঙ্কার।

পুস্তভালভের মনে বোধ হয় ওলেঙ্কা একটা দাগ ধরিয়ে দিল, কারণ দুদিন না যেতেই একটি আধবয়সী মহিলা, যাকে ওলেঙ্কা প্রায় চেনেই না, এল তার সঙ্গে কফি খেতে, আর খেতে বসেই পুস্তভালভের গল্প জুড়ে দিল। বলল, অতি চমৎকার শক্ত পোক্ত লোকটি, বিয়ের বয়সী যে কোনো মেয়ে ওকে বিয়ে করে সুখী হবে। তিন দিন বাদে পুস্তভালভ নিজেই এল। রইল বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক হবে, কথা বলল অল্পই, কিন্তু ওলেঙ্কা তার প্রেমে পড়ে গেল—এতদূর যে সারারাত তার ঘুম হল না, জ্বরের মত জ্বালায় জ্বলল, এবং সকাল হতে সেই আধবয়সী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাল। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বিয়েও হয়ে গেল।

বিয়ের পর দুজনের বনিবনা খুব ভালো হল। নিয়মিত পুস্তভালভ কাঠগোলায় বসত দুপুরে খাওয়া অবধি, তারপর যেত কাজে বেরিয়ে, ওলেঙ্কা এসে বসত তার জায়গায়, আপিসে ব'সে সন্ধ্যে অবধি বিল তৈরী করত, আর অর্ডার মাফিক মাল চালান দিত।

খদ্দেরদের এবং পরিচিত লোকদের ওলেঙ্কা শোনাত "কাঠের দর ফী বচ্ছর শতকরা কুড়ি টাকা হিসেবে বাড়ে। আগে আমরা কাঠ নিতাম এখান থেকেই, কিন্তু এখন ভাসিচ্‌কাকে প্রতি বৎসর যেতে হয়

মগিলেভ্ অঞ্চলে, কাঠের বন্দোবস্ত করতে। আর ভাড়া কী!" তাজ্জব হয়ে গালে হাত দিয়ে ওলেঙ্কা বল্‌ত "কী খরচা গাড়িভাড়ার!"

তার মনে হত সে কাঠের ব্যবসায় আছে যুগ যুগ ধরে; কাঠ জীবনের সর্বপ্রধান এবং সার বস্তু। গার্ডার, কড়ি, বরগা, তক্তা, বাটাম, বাক্সের কাঠ, ল্যাথ, পীস্, স্ল্যাব কথাগুলো তার কাছে বড় আদরের মনে হত, শুনে মন কেমন করত। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখত পাহাড় প্রমাণ বোর্ড আর তক্তা, অসংখ্য গাড়ি ভর্তি কাঠের গুঁড়ি সার বেঁধে কোন্ দূর দেশে যাত্রা করেছে, ৮ ইঞ্চি চওড়া ২৮ ফুট লম্বা কড়িকাঠের একটা দল খাড়া দাঁড়িয়ে ধেয়ে চলেছে কাঠগোলার দিকে, কড়িতে কড়িতে, গার্ডারে স্ল্যাবে ঠোকাঠুকি হচ্ছে, শুকনো কাঠে কাঠে খটাখটির বোদা আওয়াজ হচ্ছে, সবাই পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে এর ওর ঘাড়ে চেপে স্তূপের মতো জমা হচ্ছে···

ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে ওলেঙ্কা। পুস্তভালভ আদর ক'রে বলে "ওলেঙ্কা, কী হল দুলালী? মাথায় কাঁধে বুকে ক্রুসচিহ্ন ছোঁয়াও!"

যে ধারণাই তার স্বামীর হত ওলেঙ্কারও তাই হত। পুস্তভালভ যেই বলত ঘরে বড় গরম, অথবা ব্যবসায়ে মন্দা পড়েছে, ওলেঙ্কারও মনে হত তাই। আমোদ প্রমোদ পুস্তভালভের ভালো লাগ্‌ত না, ছুটির দিন কাটাত বাড়ি বসে। ওলেঙ্কাও তাই করত।

বন্ধুবান্ধবেরা বলত, "তুমি সবটা সময় কাটাও বাড়িতে বা আপিসে। থীয়েটরে সার্কাসে যাওয়াও তো উচিত।"

মুরুব্বিয়ানার সুরে ওলেঙ্কা বলে, "ভাসিচ্‌কা আর আমি থীয়েটারের ধার মাড়াই না। আমরা খাটিয়ে লোক, ওসব ছ্যাবলামির দিকে আমাদের মন নেই! কী হয় ওসব থীয়েটর দিয়ে?"

প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আর ছুটির দিনে সকাল সকাল তারা গির্জায় যেত, পাশাপাশি হেঁটে ফিরত, দুজনেরই মুখে ফুটে থাকত উপাসনার আবেগ। দুজনেরই অঙ্গে লেগে থাকত মনোরম সুবাস।

ওলেঙ্কার রেশমী পোশাক থেকে বেরোত একটা খুশী খুশী খস্‌খস্‌ শব্দ।

বাড়িতে তাদের খাদ্য ছিল চা, মিষ্টি রুটি, আর রকম রকম জ্যাম। তারপর কিমার 'পাই'। রোজ দুপুরবেলা তাদের বাড়ির সামনের উঠোনে, গেটের বাইরে, রাস্তায়, সুরুয়ার ভুরভুরে গন্ধ ছড়াতো, ভেড়ার বা হাঁসের ঝলসানো মাংসের কিংবা উপবাসের দিনে মাছের; যেই যেত ওবাড়ির পাশ দিয়ে তারই খিদে পেয়ে যেত।

আপিসে, সামোভারে চায়ের জল সর্বদাই চড়ানো থাকত—খদ্দের এলে দেওয়া হত চায়ের সঙ্গে কড়া পাকের পিঠে।

সপ্তাহে একদিন করে তারা যেত স্নানাগারে, ফিরত এক সঙ্গে টকটকে রাঙাবরণ হয়ে।

ওলেঙ্কা বলত বন্ধুদের "সত্যি, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সবদিক থেকে বেশ ভালোই আছি। যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছি ভাসিচ্‌কা আর আমি, তেমনি যদি সবাই থাকত তো বেশ হত!"

পুস্তভালভ যখন কাঠ কিনতে মগিলেভে যেত, ওলেঙ্কার ভীষণ মন কেমন করত। সারারাত সে জেগে কাটাত, কাঁদত।

মাঝে মাঝে স্মিরনিন্‌ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। স্মিরনিন্‌ ছিল সৈন্যদলের পশু-চিকিৎসক। সে ওলেঙ্কারদেরই বাড়ির এক পাশটা ভাড়া নিয়ে থাকত। তার অল্প বয়স। সে এসে গল্প-স্বল্প করত, তাস খেলত, ওলেঙ্কার মনটা একটু ভুলে থাকত।

স্মিরনিনের নানা কথার মধ্যে ওলেঙ্কার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগত তার ঘরের খবর। স্মিরনিন্‌ বিবাহিত, তার একটি ছেলে আছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেছে, কারণ পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম। বৌকে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তবু মাস মাস টাকা পাঠায় চল্লিশ রুব্‌ল্‌, তার ছেলের খোরপোশ বাবদ। এসব শুনে ওলেঙ্কা মাথা নাড়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর জন্য বড় দুঃখ হয় তার মনে।

যাবার সময় ওলেঙ্কা স্মিরনিন্‌কে মোমবাতি হাতে করে সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দেয়। বলে, "ভগবান করুন, তোমার যেন কোনো বিপদ আপদ না হয়। তুমি যে রইলে এতটা সময় আমার সঙ্গে, তার জন্য ধন্যবাদ। স্বর্গের রাণী মা মেরী তোমাকে অটুট্ স্বাস্থ্যে রাখুন।"

তার স্বামীর যেমন চারিদিক বিবেচনা করে গম্ভীরভাবে কথা কইবার ধরন, ওলেঙ্কা তারই অনুকরণ করে। ডাক্তার সিঁড়ির নিচেকার দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, তখন ওলেঙ্কা তাকে ডেকে ফেরায়, আর বলে,

"দেখ ভ্‌লাদিমির প্লাতোনিচ্, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার মিটমাট করে ফেলাই উচিত; তাকে ক্ষমা করো, ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলেটি হয়তো সবই বোঝে।"

পুস্তভালভ যখন ফিরে এল, ওলেঙ্কা তাকে ঘোড়ার ডাক্তারের দুঃখময় জীবনের সমস্ত কাহিনী শোনালো—গলা খাটো ক'রে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল, মাথা নাড়ল। দুজনেই বলাবলি করতে লাগল ছেলেটির বিষয়ে। বলল, নিশ্চয়ই ছেলেটির বাবার জন্য মন কেমন করে। তারপর দুজনেরই মন যেন কেমন করে এলো একই কথা, তারা দাঁড়ালো এসে গৃহবিগ্রহের সামনে। প্রার্থনা করলো মাটি অবধি নুয়ে, ভগবান যেন তাদের সন্তান দেন।

এমনিভাবে পুস্তভালভ পরিবার ছটি বছর কাটাল, পরম শান্তিতে, বিনা আড়ম্বরে, ভালোবেসে, পরস্পরের সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ বজায় রেখে। তারপর একদিন, শীতকালে, ভাসিলি আন্দ্রেয়িচ্ আপিসে বসে গরম চা খাওয়ার পর মাথায় টুপী না এঁটে বেরিয়ে গেল কিছু কাঠ চালান দিতে। তার ঠাণ্ডা লেগে গেল, অসুখ করল। সবচেয়ে বড় বড় ডাক্তার তার চিকিৎসা করলেন, কিন্তু রোগ কিছুতেই সারল না। চার মাস ভোগার পর পুস্তভালভ মারা গেল। ওলেঙ্কা আবার বিধবা হল।

স্বামীকে গোর দিয়ে ওলেঙ্কা ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল, "কার

কাছে যাব আমি, ওগো তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব আমি অভাগী দুঃখিনী ? ওগো তোমরা সবাই আমাকে দেখ'সে।"

কালো শোকবস্ত্র পরে ওলেঙ্কা চলাফেরা করে। মাথায় টুপি নেই, হাতে দস্তানা পরেনা। চোখের জলের ধারার নকশায় তৈরি শাদা ঝালর অঙ্গে ধরে। বাইরে বেরোয় কদাচিৎ; যদিও বা যায় কোথাও তো সে গির্জায় কিংবা স্বামীর কবর দেখতে। বাড়িতে বাস করে যেন সন্ন্যাসিনী।

ছটি মাস কেটে যাবার পর সে বিধবার বেশ ছাড়ল। তার ঘরের জানলার খড়খড়ি উঠতে আরম্ভ করল। কখনো সখনো তাকে বাজারের পথেও দেখা যেতে লাগল, সকালের দিকে রাঁধুনীর সঙ্গে। কি যে সে করে, বাড়িতে কি করে তার দিন কাটে তা নিশ্চয় করে কেউ জানল না, তবে আন্দাজ একটা করা গেল। দেখা যেত, ওলেঙ্কা বাগানে বসে চা খাচ্ছে ঘোড়ার ডাক্তারটির সঙ্গে, ডাক্তার ওলেঙ্কাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। এসব দেখে লোকে অনুমান একটা করে নিত।

আরও একটা ঘটনা ঘটল। ডাকঘরে ওলেঙ্কার একটি চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। তাকে সে বললে,

"আমাদের এই শহরে গোরু ঘোড়ার কি হয় না হয় দেখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, তাই এত ব্যামো। প্রায়ই শোনা যায় দুধ খেয়ে মানুষের অসুখ করে, গোরু ঘোড়ার ছোঁয়াচ লেগে এটা হয়, সেটা হয়। গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে যেমন, মানুষের জন্য ঠিক তেমনি নজর রাখা উচিত।"

পশুর ডাক্তারটির মনে যা ধারণা ওলেঙ্কার বক্তব্যও তাই। সকল বিষয়েই ডাক্তারের যা মত তারও আজকাল সেই মত। স্পষ্টই দেখা গেল, কোন একটা আকর্ষণ বিনা ওলেঙ্কার একটি বৎসরও কাটে না। আর, এবারে সে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে আনন্দ একেবারে তার নিজের বাড়িরই একপাশে।

মেয়েটি আর কেউ হলে তার নিন্দে হত, কিন্তু ওলেঙ্কার সম্বন্ধে কেউ কুকথা ভাবতে পারত না—সবটাই তার এত সহজ স্বাভাবিক। কি ডাক্তার কি সে কেউই খুলে বলে নি যে আগে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল তা বদলেছে। বরং ওটা ওরা ঢেকে রাখতেই চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না, কারণ ওলেঙ্কার কথা গোপন রাখার ক্ষমতা ছিল না।

যখন ডাক্তারের সহকর্মীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, ওলেঙ্কা তাদের চা ঢেলে দিতে দিতে বা খাবার সময় তুলত জীবজন্তুর মড়কের কথা। কিংবা বলত পশুদের কোন ব্যায়রাম অথবা সরকারী কসাইখানার বিষয়। ডাক্তার বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। বন্ধুরা চলে যেতেই সে ওলেঙ্কার হাত চেপে ধরে ফোঁস করে উঠত,

"বার বার তোমাকে মানা করেছি যা তুমি বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে। আমরা পশু চিকিৎসকেরা যখন আলাপ-আলোচনা করি, দয়া ক'রে তুমি তার মধ্যে এসে পড়ো না। সত্যি ভারী রাগ হয়।"

ওলেঙ্কা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকাত, চোখ কাপালে তুলে জিজ্ঞেসা করত, "তা হলে কী বিষয়ে কথা বলব, ভলদচ্‌কা ?" তারপর জলভরা চোখে সে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরত, ডাক্তারকে দিব্যি দিত রাগ না করতে। তারপর দুজনেরই খোশমেজাজ ফিরে আসত।

এ আনন্দ বেশি দিন রইল না। ডাক্তার তার সৈন্যদলের সঙ্গে কোথায় গেল, একেবারের মতো। গোটা দলটাই বদলী হয়ে গেল দূর দেশে—হয়তো বা সাইবীরিয়াতেই। ওলেঙ্কা একা পড়ে গেল।

এবারে সে একেবারেই একলা পড়ে গেল। তার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন; তাঁর সেই আরামকেদারাটা পড়ে আছে চিলকোঠার গুদোমে, ধূলোয় ভর্তি, একটা পায়া ভাঙা। ওলেঙ্কা রোগা হয়ে গেল, তার চেহারায়ও আর সে শ্রী রইল না। রাস্তায় দেখা হলে আর তার দিকে কেউ আগের মত চাইত না, হাসত না।

বোঝা গেল তার জীবনের সব চেয়ে ভালো দিনগুলো চলে গেল। সে দিন রইল পিছনে পড়ে, এখন যে জীবন শুরু হল তা আলাদা, অনিশ্চিত, তার কথা ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় বসে ওলেঙ্কা শুনত 'তিভোলি'তে বাজনা বাজছে, বাজি ফুটছে, কিন্তু তা শুনে তার কোনো কথাই মনে হত না। ফাঁকা উঠোনটার দিকে সে নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে থাকত, কোন কথা ভাবত না, চাইত না কিছুই। দিন ফুরিয়ে গেল ওলেঙ্কা শুয়ে পড়ত, স্বপ্নে দেখত ফাঁকা উঠোনটা। খাওয়া-দাওয়া করত, যেন অনিচ্ছায়।

সব চেয়ে বড় আর বিশ্রী ব্যাপার হল যে তার আর কোন রকম মতামত রইল না। চোখে পড়ত নানা জিনিস, বুঝত কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধেই একটা মতামত তার মনে গড়ে উঠত না। কি নিয়ে কথা বলা যায় তাও সে বুঝত না।

কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার—মতামত না থাকা! ধরো, দেখছ একটি বোতল অথবা বৃষ্টি, কিংবা দেখছ চাষী চলেছে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে, কিন্তু বোতল, বৃষ্টি বা চাষী কী নিমিত্ত, কী তাদের তাৎপর্য—কিছুই বলতে পারছ না, হাজার রূপিয়া কবুল করলেও নয়!

যখন তার কুকিন্ ছিল, অথবা পুস্তভালভ কিংবা পরে তার কাছে থাকত পশুর ডাক্তারটি, তখন ওলেঙ্কা সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারত, যা চাও তারই সম্বন্ধে একটা মত দিতে পারত। কিন্তু এখন তার মনটা ফাঁকা উঠোনটার মতো। বড় কষ্টমাখা, বড় বিস্বাদ এ জীবন।

শহরটা একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। খোলামেলা রাস্তা জিপসী রোড হয়ে উঠল শহুরে সড়ক। সেখানে ছিল তিভোলির বাগানগুলো আর কাঠের গোলা, সেখানে বাড়ির সারির ফাঁকে ফাঁকে গলিঘুঁজি গজিয়ে উঠল। কী তাড়াতাড়ি কেটে যায় সময়!

ওলেঙ্কার বাড়িটা শ্রীহীন হয়ে পড়ল। ছাতে মরচে ধরল, কুঁড়ে

ঘর এক পাশে ঝুলে পড়ল, সারা উঠোনটা ভরে গেল লম্বা ঘাস আর বিছুটির ঝোপে। ওলেঙ্কার নিজেরও বয়স হলো, চেহারায় সে লাবণ্য আর রইল না।

গ্রীষ্মকালে সে বসত বারান্দাটায়, মন শূন্য, নিরানন্দ, বিরস। শীতে সে বসত জানলার ধারে, তাকিয়ে থাকত বরফের দিকে। কখনও বসন্তের বাতাসে, অথবা হাওয়ায় ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টা, ধ্বনিতে স্মৃতির বন্যা জেগে উঠত, তখন তার মন গলে যেত, চোখে জল ভরে আসত—কিন্তু তাও মুহূর্তস্থায়ী, সেটা চলে গেলেই আবার ফিরে আসত সেই শূন্যতা, জীবনের উদ্দেশ্যের সেই অনিশ্চয়তা।

কালো বেড়ালের বাচ্ছা ব্রিস্কা তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াত, ঘড়র ঘড়র শব্দ করত, কিন্তু ওসব বেড়ালী আদরে ওলেঙ্কার মন সাড়া দিত না। ওর কি ঐটুকুরই দরকার? সে চাইত এমন ভালোবাসা যা তার সমস্ত আত্মা, তার মনকে দখল করবে, মনে জন্ম দেবে ধারণার, জীবনে আনবে গতিমুখ, পড়ন্ত বয়সের রক্তে এনে দেবে উষ্ণতা।

কালো বেড়ালবাচ্ছাটাকে ওলেঙ্কা তার কোল থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে, "যা এখান থেকে, যাঃ! এখানে কী তোর? এখানে কিচ্ছু নেই।"

এমনি ভাবে চলত দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কোনো মত নেই, অমত নেই, আনন্দের ছিটেফোঁটা নেই। রাঁধুনী মাভ্রা যা বলত, ওলেঙ্কা তাই মেনে নিত।

একদিন—জুলাই মাস, গরম পড়েছে, সন্ধ্যের দিকে, গরুগুলো যখন ঘরে ফিরছে—সারা উঠোনে ধুলো উড়িয়ে, সেই সময় কে যেন আচমকা দরজায় ঘা দিল। ওলেঙ্কা নিজেই গেল ফটক খুলতে, খুলে যা দেখল তাতে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল—দরজায় দাঁড়িয়ে পশুর ডাক্তার স্মিরনিন্! তার চুলে পাক ধরেছে, পরনে বেসামরিক পোশাক।

এক মুহূর্তে ওলেঙ্কার সব কথা মনে পড়ে গেল। সে নিজেকে

সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল। একটি কথাও না বলে সে স্মিরনিনের বুকে তার মাথা রাখল। এত ওলোট-পালোট হয়ে গেল তার মন যে, কখন যে স্মিরনিনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে তার সঙ্গে চা খেতে লাগল তা সে বুঝতেই পারল না।

আনন্দে সে কেঁপে উঠল, মুখে কথা ফুটল, "ওগো ভ্লাদিমির প্লাতনিচ্ কী জন্যে এলে এখানে ?"

স্মিরনিন্ বলল, "আমি এসেছি এখানে থাকব বলে। সৈনিকের চাকরী আমার শেষ হয়েছে। এবারে এখানেই বসবাস করে নিজে রোজগার করবার চেষ্টা দেখব। তা ছাড়া ছেলেটিও বড় হল, তাকে উচ্চশিক্ষা দিতে হবে। আর জানো স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেলেছি।"

ওলেঙ্কা বললে, "কোথায় সে ?"

"হোটেলে, আমার ছেলের সঙ্গে। আমি বেরিয়েছি একটা আস্তানা খুঁজতে। ভাড়া নেব।"

"সে কি কথা গো। আমার বাড়িটা নাও। ভাড়া! একটি পয়সা ভাড়া নেব না।" ওলেঙ্কার মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, সে কাঁদতে শুরু করলে। বলল, "তোমরা এখানে থাকো। আমার পক্ষে বাড়ির একটা ধারই যথেষ্ট। ওঃ কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার।"

পরদিনই তারা ছাতে দু এক পোঁচ রঙ আর দেয়ালে চূণকাম করতে লেগে গেল। ওলেঙ্কা কোমরে হাত দিয়ে উঠোনটার চারদিক ঘুরে কাজের খবরদারী করতে লাগল। সেই পুরানো দিনের হাসি আবার তার মুখে ফুটে উঠল। মনে হল যেন লম্বা একটানা ঘুমের পর তার শরীর তাজা হয়ে প্রাণ ফুটে উঠেছে।

পশুর ডাক্তারের স্ত্রী এল। রোগা মেয়েটি, সাদাসিদে ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে একটা খামখেয়ালী ভাব। সঙ্গে তার ছোট ছেলেটি, সাশা, বয়স প্রায় দশ, কিন্তু সে আন্দাজে মাথায় খাটো। ফুলো ফুলো গালে টোল, উজ্জ্বল নীল চোখ। উঠোনে ঢুকেই

সে বেড়ালটার পিছনে ছুটতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল খিল খিল হাসি—খুশী মনের ফুর্তির।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "মাসি, এটা কি তোমার বেড়াল? ওর যখন বাচ্ছা হবে, আমাকে দিও। মা ইঁদুর দেখে ভয়ানক ভয় পায়"।

ছেলেটির সঙ্গে ওলেঙ্কার গল্প শুরু হল। চা খাওয়াল সে ছেলেটিকে। হঠাৎ তার বুকটা ভরে উঠল। মধুর একটা ভাবে তার বুক কন কন করতে লাগল—ছোট্ট ছেলেটি যেন তার নিজের।

সন্ধ্যেবেলায় সে যখন খাবার ঘরে তার পড়া তৈরি করতে বসল, ওলেঙ্কা তার দিকে চেয়ে রইল। মন মুখ তার স্নেহ মমতায় ভরে উঠল। সে বলতে লাগল, নিচু গলায়,

"আমার দুলাল, আমার মানিক, কত বুদ্ধি তোমার···কী সুন্দর দেখতে তুমি।"

ছেলেটি জোরে জোরে পড়তে লাগল, বই দেখে, "দ্বীপ একটি ভূখণ্ড, সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত।"

ওলেঙ্কা পুনরাবৃত্তি করল, "দ্বীপ একটি ভূখণ্ড।"

বহুদিনের ফাঁকা মনে থেকে একটি কথা না ব'লে সে আজ এই প্রথম একটি মত প্রকাশ করল যাতে তার বিশ্বাস আছে।

এইবারে তার নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। রাত্রে খাবার সময় সে সাশার বাবা মাকে শোনাতে লাগল যে, হাইস্কুলে ছেলেপিলেদের যা পড়ানো হয় তা কী রকম শক্ত। অবশ্য শুধু কারিগরীর কাজ শেখানোর চেয়ে উচ্চশিক্ষা ভালো, কারণ তার দ্বারা সমস্ত পথই খুলে যায়—চাও তুমি ডাক্তার হতে পারো···এঞ্জিনীয়ার হতে পারো···

সাশা হাইস্কুলেই যেতে শুরু করল। তার মা খারকভে তার বোনের বাড়ি গেল, গিয়ে আর ফিরল না। বাবা তার পশুর পাল দেখতে বেরোত, কখনো কখনো এক নাগাড়ে বাইরে থাকত।

ওলেঙ্কার মনে হত সবাই সাশাকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ তাকে চায় না, না খেয়ে ছেলেটি মরে যাচ্ছে। ওকে সে সরিয়ে আনল নিজের পাশটিতে ছোট একটি কামরায়। সেখানেই তার থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

ছ মাস হয়ে গেল। সাশা থাকে তার পাশেই। রোজ সকালে ওলেঙ্কা যায় সাশার ঘরে। সাশা তখনও শুয়ে, গালের তলায়, হাতটি রেখে গভীর ঘুমে অচেতন, নিঃশ্বাস নিঃশব্দে উঠছে পড়ছে। ওলেঙ্কার মনে কষ্ট হয় সাশার ঘুম ভাঙাতে। তবু বলে, আস্তে আস্তে,

"সাশেন্‌কা, উঠে পড়ো সোনা। ইস্কুলে যাবার সময় হল।"

সাশা ওঠে, পোশাক পরে। প্রার্থনা সেরে খেতে বসে। খায় তিন গ্লাস চা, ছুটো বড় কড়া কেক্, মাখন মাখানো আধখানা ছোট রুটী। ঘুম তখনও তার পুরোপুরি কাটে নি, তাই মেজাজটি তখনও ধাতস্ত হয় নি।

ওলেঙ্কা বলে "সাশেন্‌কা, গল্পটা তোমার কিন্তু ভালো তৈরী হয় নি।"

এমন ভাবে চেয়ে থাকে সে তার দিকে যেন ছেলেকে সে বিদায় দিচ্ছে দূর যাত্রার পথে।

"তোমার জন্য আমি ভেবে মরি। প্রাণপণ চেষ্টা করো সোনামণি, ভালো করে পড়াশুনো করো। মন দিয়ে মাষ্টারদের কথা শুনো।" সাশা বলে,

"আঃ, আমাকে ছেড়ে দাও দিকি।"

তারপর হেঁটে রওনা হয় স্কুলে।

ছোট মূর্তিটি পথে চলেছে, মাথায় মস্ত একটা টুপী, কাঁধে একটা ঝুলি। ওলেঙ্কা নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়। ডাকে,

"সাশেনকা—আ"। সাশা যেই পিছন ফিরে তাকায় ওলেঙ্কা তার হাতে গুঁজে দেয় একটি খেজুর বা কারামেলের একটি টুকরো।

স্কুলের গলি এসে পড়ে। সাশেনকার বিশ্রী লাগে, লম্বা মোটা-সোটা একটি মহিলা তার পিছু পিছু আসছেন, দেখে তার লজ্জা করে। পিছন ফিরে সে বলে, "মাসি, বাড়ি ফিরে যাও। এখন আমি একা যেতে পারব।"

ওলেঙ্কা থামে, কিন্তু তার চোখ সরে না। স্কুলে ঢোকার পথটিতে ছেলে পৌঁছে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সে তার দিকে তাকিয়েই থাকে। আঃ, কী ভালোই বাসে সে ছেলেটিকে। মায়ার ফাঁদে সে আগেও পড়েছে, কিন্তু কেউই তাকে এমন করে বাঁধতে পারে নি। আজ তার মায়ের মন জেগে উঠে যত আনন্দে, যেমন করে তার আত্মাটাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছে, তেমন কখনো হয় নি আগে। এই ছোট্ট ছেলেটি তার নিজের নয়, তবু তার গালের টোলটি, মাথার টুপীটার জন্য সে তার জীবন দিতে পারে, আনন্দে, মমতায় জলভরা চোখে। কেন? কেন তা কে বলতে পারে?

সাশাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ওলেঙ্কা শান্ত মনে বাড়ি ফিরে যায়। মন ভরা তার তৃপ্তি, প্রশান্তি, ভালোবাসা। গেল ছ মাসে বয়স যেন তার কমে গেছে, মুখে উজ্জ্বল আনন্দ। লোকে তাকে দেখে খুশী হয়, বলে, "সুপ্রভাত গো ওল্‌গা সেমইয়নভ্‌না, দুলালী, কেমন আছ দুলালী?"

সে বলে, "ইস্কুলে আজকাল এত শক্ত পড়া দেয়!" বাজারে ঘুরে কেনা কাটার ফাঁকে ফাঁকে সে বলতে থাকে, "ঠাট্টা নয়। কাল প্রথম ঘন্টায় ওকে পড়া দিয়েছে একটা গল্প মুখস্থ, লাতিন থেকে একটা তরজমা, আর একটি সমস্যাপূরণ। ঐটুকু একটা ছেলের পক্ষে এটা বড্ড বাড়াবাড়ি, বাস্তবিকই।"

তারপর সে আরম্ভ করে মাস্টারদের কথা, পড়ার কথা, পাঠ্য বইগুলোর কথা। সাশা যা বলে ঠিক তাই বলে।

তিনটের সময় ওরা একসঙ্গে খায়। সন্ধেবেলায়, মাস্টাররা যে বাড়ির পড়া দেন তা ওরা পড়ে একসঙ্গে, একই সঙ্গে কাঁদে।

সাশাকে বিছানায় শুইয়ে ওলেঙ্কা প্রার্থনায় আর ক্রূসচিহ্ন আঁকায় অনেকক্ষণ লাগিয়ে দেয়। তারপর সে নিজে শুতে যায় আর স্বপ্ন দেখে সেই দূর, অস্পষ্ট ভবিষ্যতের, যখন সাশার পড়া শেষ হয়েছে, সে ডাক্তার, বা এঞ্জিনীয়ার। তার মস্ত একটা বাড়ি, ঘোড়া গাড়ি। বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে···এই কথাই ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাশে কালো বেড়ালটা শুয়ে আওয়াজ করে···ঘড়র···ঘড়র।

হঠাৎ দরজায় জোরে ঘা পড়ে। ওলেঙ্কার ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। আধ মিনিট বাদে আবার ঘা।

ওল্গার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, "খারকভ্ থেকে এসেছে তার। সাশার মা তাকে চেয়ে পাঠিয়েছে! হা ভগবান!"

সমস্ত আশাভরসা তার উবে যায়, মাথা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, মনে হয়, তার মত অভাগিনী জগতে আর কেউ নেই।

কিন্তু আরও এক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সে কার যেন গলা শুনতে পায়; কিছু নয়, পশুর ডাক্তার ক্লাব থেকে ঘরে ফিরল।

ওলেঙ্কা মনে মনে বলে "যাক। ধন্য ভগবান!" ক্রমে ক্রমে তার বুকের ওপর থেকে ভারটা সরে যায়। আশ্বস্ত হয়ে সে ফিরে যায় বিছানায়, আর সাশার কথা ভাবে। পাশের ঘরে ঘুমোয় সাশা আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমের ঘোরে, "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! এই, ওকি, মারামারি নয়!"

* * * *

গল্পটি চেখফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। কেউ কেউ বলেন, দি বেস্ট্ শর্ট স্টরি অব্ চেখফ। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ গল্প।

কেন?

তারই টীকা করেছেন স্বয়ং টলস্টয়। এরকম একটা ঘটনা এই বাংলাদেশেই ঘটেছিল। প্রভাত মুখুয্যে একদা একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন। তার মূল বক্তব্য ছিল, হিন্দুর 'নীচ' জাতির একটি ছেলে অপমানিত বোধ করে খৃষ্টান হবে বলে মনস্থির করলে। তখন দেখে, খৃষ্টানদের ভিতরও জাতিভেদ রয়েছে। নেটিভ খৃষ্টানদের জন্য আলাদা ক্লাব, এমন কি ধর্মমন্দির—চার্চ সেও আলাদা, এবং সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মৃত্যুর পরও জাতিভেদ যায় নাঃ গোরার জন্য ভিন্ন গোরস্থান নেটিভের ভিন্ন গোরস্থান। গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, সে যুগের ঋষিপ্রধান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি সমালোচনা লেখেন—'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর'। হিন্দুর বর্ণাশ্রম সমস্যা নিয়ে এরকম প্রামাণিক প্রবন্ধ এর পূর্বে বা পরে কখনো লিখিত হয়নি। 'হরিজন' আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু বহু পূর্বে।

টলস্টয়ের টীকা পড়ে পাঠক বুঝবেন, আমরা, সাধারণ পাঠক, কত সহজেই গল্পটির মূল বক্তব্য মিস্ করে যেতে পারি। অনবদ্য এই টীকাটি।

টীকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর চেখফ সর্বসাধারণকে অনুরোধ জানান তাঁর গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন টীকাটি পড়েন, এবং প্রকাশকদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন সব সময়ই গল্পটির সঙ্গে টীকাটিও ছাপেন। ইটিও অনুবাদ করেছেন সখা খাফী খান।

দুলালী ("দুশেচকা") র সমালোচনা

তলস্তয়

বাইব্‌লের গণনাপুস্তকে একটি গল্প আছে, তার অর্থ অতি গভীর। গল্পটিতে বলা হয়েছে, ইস্‌রাএলীরা যখন মোআবের রাজ্যসীমায় এসে

উপস্থিত হল, মোআবীয়দের রাজা বালাক্ তখন নবী বালআমকে ডেকে পাঠালেন ইস্রাএলীদের অভিসম্পাত দেবার জন্য; কাজটি সেরে দিলে বালাক্ বিলআমকে বহু পুরস্কার দেবেন। তার লোভে বিলআম বালাকের কাছে গেলেন, এবং তাকে নিয়ে উঠলেন পর্বতে। সেখানে একটি বেদী তৈরী করা হল, গোবৎস ও মেষ উৎসর্গ করা হল অভিশাপের উদ্যোগে। বালাক্ রইল অভিশাপের প্রতীক্ষায়, কিন্তু বালআম ইস্রাএলের লোকদের অভিসম্পাত না দিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন।

২৩ পরিচ্ছেদ ১১ চরণঃ "বালাক্ বালআমকে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ, তুমি তাহাদিগকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করিলা।

তাহাতে সে উত্তর করিল, পরমেশ্বর আমার মুখে যে কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে?

"১৩। পরে বালাক্ কহিল, আমি মিনতি করি, অন্যস্থানে আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আমার নিমিত্ত তাহাদিগকে শাপ দেও।"

কিন্তু আবার শাপ না দিয়ে বালআম আশীর্বাদ করলেন। তৃতীয় বারেও তাই।

২৪ পরিচ্ছেদ ১০ম চরণ, 'তখন বালআমের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, সে আপনা হস্তে হস্তের আঘাত করিল এবং··· বালআমকে কহিল, শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ তুমি তিনবার সর্বতোভাবে তাহাদের আশীর্বাদ করিলা।

"১১। অতএব তুমি এখন স্বস্থানে পলায়ন কর; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মানিত করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু দেখ পরমেশ্বর তোমার সম্মান পাইতে নিবৃত্ত করিলেন।"

তখন বালআম পুরস্কার লাভ না করেই প্রস্থান করলেন, কারণ তিনি বালাকের শত্রুদের অভিসম্পাতের পরিবর্তে দিলেন আশীর্বাদ।

বালআমের যা হয়েছিল প্রকৃত কবি ও রসস্রষ্টাদের প্রায়ই তা হয়। বালাকের পুরস্কার জনপ্রিয়তার লোভে কিংবা ভ্রান্ত ধারণার বশে কবি দেখে না যে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদূত, গাধাও যাকে দেখতে পায় *। চায় সে অভিশাপ দিতে, কিন্তু অহো! সে দেয় আশীর্বাণী।

ঠিক তাই হল খাঁটি কবি এবং রসস্রষ্টা চেখফের মনোহর এই "তুলালী" গল্পটি লেখবার বেলায়।

লেখক নিশ্চিত চেয়েছিলেন কৃপার পাত্রী এই জীবটিকে উপহাস করতে। হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছিলেন তুলালীকে··· যে প্রথমে কুকিনের তুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর কাঠ কেনা-বেচার বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর পশুর ডাক্তারের আওতায় এসে গরু-মহিষের ব্যামোকেই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার বলে ঠিক করে, আর শেষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ব্যাকরণের প্রশ্ন এবং মস্ত টুপী পরা ছোট্ট বাচ্ছাটির ভালো মন্দ নিয়ে।

কুকিন্ পদবীটি উদ্ভট, তার অসুখ, যে টেলিগ্রামে তার মারা যাবার খবর জানানো হল তাও উদ্ভট, কাঠের ব্যাপারী আর খানদানী ঠাট পশুর ডাক্তার, এমন কি ছোট্ট ছেলেটি, সবাই, সবই উদ্ভট, কিন্তু তুলালী, তার অন্তর, যাকেই সে ভালবাসে তারই মধ্যে তার সমস্ত সত্তার নিবেদন—এ উদ্ভট নয়, অনির্বচনীয় পবিত্র।

আমার বিশ্বাস, "তুলালী" গল্পটি লেখার সময়ে লেখকের—হৃদয়ে নয়—মনে ছিল একটি অস্পষ্ট মূর্তি, নব্যনারীর, যে পুরুষের সমকক্ষ, মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন, শিক্ষিতা, সমাজহিতব্রতে স্বয়ং নিযুক্ত দক্ষতায় পুরুষের তুল্য কিংবা আরও সুদক্ষ, নারীসমস্যা কথাটা যে তুলেছে এবং তোলে।

---

* বালাকের আমন্ত্রণে বালআম যখন যাত্রা শুরু করে তখন তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল য়িহুহের দূত। বালআম তাকে দেখতে পায় নি, কিন্তু যে গাধার পিঠে চড়ে সে আসছিল সে পেয়েছিল দেখতে—অনুবাদক।

"তুলালী" লিখে লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন মেয়েদের কী হওয়া উচিত নয়। জনমত বালাক্ চেখফকে বলেছিল, তুর্বল, একান্ত অনুগত, অনুন্নত, পুরুষসেবায় নিয়োজিত স্ত্রীদের অভিশাপ দাও! চেখফ পর্বতে উঠলেন, বেদীর উপর গোবৎস এবং মেষ রেখে দেওয়া হল, কিন্তু যখন তাঁর মুখ খুলল, তখন, যাদের শাপ দিতে এসেছিলেন তাদের তিনি শোনালেন আশীর্বচন।

অনবদ্য স্বচ্ছ পরিহাসের রসে লেখা অপরূপ এই গল্পটি : তবু, এর কোনো কোনো অংশ পড়তে গিয়ে আমি অন্ততঃ আমার চোখের জল সামলাতে পারি নি! মন ভিজেছে—কুকিন্, যা কিছু নিয়ে কুকিন্ মেতে থাকে, কাঠব্যবসায়ী, পশুর ডাক্তার এ সবের প্রতি তুলালীর একান্ত অনুরাগ ও অভিনিবেশের বিবরণ পড়ে; আরও বেশী যখন সে একা, আর তার ভালবাসার কেউ নেই তখন তার যে যন্ত্রণা, তার বিবরণ, আর সবার শেষে, নারীর মাতৃত্বের যে অনুভূতি তার নিজের জীবনে সে পায়নি তার সমস্ত শক্তি এবং অপরিসীম প্রেম যখন সে নিয়োগ করে ভবিষ্যতের মানব মস্ত বড় টুপী-পরা ইস্কুলের ছেলেটির মধ্যে, তার বিবরণ প'ড়ে।

লেখক মেয়েটিকে ভালোবাসালেন উদ্ভট এক কুকিন্‌কে, নগণ্য এক কাঠব্যবসায়ীকে, কাঠখোট্টা এক পশুর ডাক্তারকে, কিন্তু প্রেমের পাত্র একটা কুকিন্‌ই হোক আর একটি স্পিনোজা, পাস্কাল বা শিলারই হোক, প্রেমাস্পদ ঘন ঘন বদলাক—যেমন তুলালীর বেলায়—অথবা চিরকাল একই থাক, প্রেম তাতে কিছু কম পবিত্র হয় না।

কিছুদিন আগে আমি 'নোভোয়ে ভ্রেম্ইয়া' কাগজে নারী সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটিতে লেখক নারীদের সম্বন্ধে অতি চতুর এবং বড় গভীর একটি মতবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "মেয়েরা আমাদের দেখাতে চেষ্টা করছে যে যা কিছু আমরা পুরুষেরা পারি, তা তারাও পারে। এ নিয়ে আমার বিবাদ

নয় ; আমি মান্‌তে রাজি যে পুরুষেরা যা পারে মেয়েরা তার সবই পারে, হয়তো পুরুষদের চেয়ে ভালোই পারে। কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, মেয়েরা যা পারে পুরুষদের কীর্তি তার ধারে কাছেও যেতে পারে না।”

ঠিক, কথাটি যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। এবং এটি যে শুধু শিশুর জন্মদান লালন পালন ও বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য তাই নয়। পুরুষ সেই সর্বাধিক উন্নত শ্রেষ্ঠ কার্য্যটি সাধন করতে পারে না যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের নিকটতম সন্নিধানে আসতে পারে—এই কীর্তি—প্রেম, প্রেমাস্পদে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ। এটি শ্রেষ্ঠ নারী পেরেছে, পারে এবং পারবে, অতি উত্তমভাবে এবং সহজ স্বাভাবিক উপায়ে। কী হতো এই জগতের যদি মেয়েদের এই ক্ষমতাটি না থাকতো, এবং যদি এর প্রয়োগ তারা না করতো!

মেয়ে ডাক্তার, টেলিগ্রাফের কেরানী, নারী বৈজ্ঞানিক, মেয়ে উকীল, লেখিকা—এ সব না থাকলেও আমাদের চলতো, কিন্তু যারা মানুষের মধ্যে যা সর্বোত্তম তাকে ভালোবাসে, এবং সেইটিকে অগোচরে তার মধ্যে সঞ্চালিত, উদ্বুদ্ধ করে, তার সহায় হয়, সেই মা, সহায়িকা, সান্ত্বনাদাত্রী, তারা না থাকলে জীবনটা বিপরীত একটা ব্যাপার হয়ে উঠতো। যীশুখ্রীষ্টের কাছে কোনো মগ্‌দলীনি আসত না, সাধু ফ্রান্সিসের সঙ্গে ক্লারা থাকত না, ডিসেম্বরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের পত্নীরা সাইবীরিয়ায় যেত না, দুখবরদের স্ত্রীরা যে তাদের স্বামাদের সত্যের জন্য আত্মদানের পথ থেকে না সরিয়ে দিয়ে বরং সেই পথেই তাদের প্রবৃত্ত করেছিল, তাও হত না। থাকত না সেই হাজার হাজার অজানা মেয়েরা—নারীকুলশ্রেষ্ঠা এরা—অজ্ঞাতেরা চিরকালই যা হয়—যারা সান্ত্বনা দেয় মদ্যপ, দুর্বল, উচ্ছৃঙ্খল জনকে, প্রেমস্নিগ্ধ সান্ত্বনার প্রয়োজন যাদের সবার চেয়ে বেশী। এ প্রেম যাতেই প্রযুক্ত হোক, কুকিনে বা খ্রীষ্টে, এইটেই নারীর প্রধান, মহীয়সী, অনন্যলভ্যা শক্তি।

কী প্রচণ্ড বোঝার ভুল, এই সব তথাকথিত নারীসমস্যা—যার কবলে পড়েছে শুধু মেয়ে নয়, পুরুষদেরও বেশীর ভাগ। অর্বাচীন যে কোনো ধারণার কবলে এরা পড়বেই।

"মেয়েদের মন চায় নিজেদের উন্নতি।" এর চেয়ে ন্যায় যুক্তিসঙ্গত কথা আর কী হতে পারে?

কিন্তু স্বভাবগুণে মেয়েদের কাজ পুরুষদের কাজ থেকে ভিন্ন। অতএব মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এবং পুরুষদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আদর্শ এক হতে পারে না। মেনে নেওয়া যাক যে মেয়েদের আদর্শ কী তা আমরা জানি না। যাই হোক সেটা, এটা নিশ্চিত যে সেটা পুরুষের চরম উৎকর্ষের আদর্শ নেয়। অথচ, নারী-জাতির পথকণ্টক এই সৌখীন নারী আন্দোলনের সমস্ত উদ্ভট কার্য-কলাপের লক্ষ্য হচ্ছে ঐ পুরুষালী আদর্শে পৌঁছনো।

আমার মনে হয়, এই ভুল বোঝার প্রভাব চেখফের উপর পড়েছিল, "দুলালী" লেখবার সময়।

বালআমের মতো তিনি চেয়েছিলেন অভিশাপ দিতে, কিন্তু কাব্যদেবতা তাঁকে নিষেধ করলেন, আদেশ দিলেন আশীর্বাদ করতে। আশীর্বাদই তিনি করলেন, এবং অজ্ঞাতে এমন অপূর্ব প্রভামণ্ডিত করলেন এই মাধুরীময়ী প্রাণীটিকে যে সে চিরকালের মতো একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল—যে নিজে আনন্দ চায় এবং নিয়তি যাকেই তার সান্নিধ্যে আনে তাকেই আনন্দ দিতে চায় এমন একটি নারী যে কী হতে পারে তার।

গল্পটি যে এত অপরূপ তার কারণ, এর পরিণতি পূর্বকল্পিত নয়।

আমি বাইসিকেল চালাতে শিখেছিলাম একটা হলঘরে। সেটা এত বড় যে তার মধ্যে একটি সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করতে পারে। অপর প্রান্তে একটি মহিলা শিখছিলেন বাইসিকেল চড়া। আমি ভাবলাম, হুঁশিয়ার থাকব, ওঁর উপর চোখ রাখলাম। চেয়ে থাকতে

থাকতে ক্রমেই আমি ওঁর দিকে এগিয়ে পড়তে লাগলাম। উনি বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। তবু আমি গিয়ে পড়লাম ওঁর ঘাড়ের উপর, ধাক্কা মেরে বাইসিকেল থেকে তাঁকে ফেলে দিলাম—অর্থাৎ যা চেয়েছিলাম তার উল্টোটাই করে বসলাম—শুধু এই কারণে যে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মহিলাটির উপর।

চেখফেরও তাই হল, বিপরীত মুখে। উনি চেয়েছিলেন তুলালীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে, কিন্তু তাঁর কবির দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ থাকায় তিনি দিলেন তাকে তুলে।

এই টীকাটি পড়ার পর আর কার কি বলবার থাকে?

[চেখফ বলেছিলেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আমি আমার জীবনে আর কী আশা করতে পারি?

সত্যেন্দ্রনাথ যখন একদিন দেখলেন, কবিগুরু তাঁর একটি বাঙলা কবিতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন (অর্থাৎ নিজের সৃজনীকর্ম মুলতুবি রেখে) তখন তাঁর হৃদয়ে কী শ্লাঘার উদয় হয়েছিল তার কি-কল্পনাও আমরা করতে পারি।]

ধন্য 'তুলালী'র প্রেম। তা সে যাকেই বাসুক না, যতবারই বাসুক না কেন। রমণীর এই প্রেমই তো জগৎকে শ্যামল করে রেখেছে।

কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। সহৃদয় পাঠক আমার দম্ভ ক্ষমা করবেন।

আন্তন চেখফ: "The Darling and other short stories", রুশ কন্স্ট্যান্স গার্নেটের তরজমা, London, Chatto & Windus, 1918.

'দুলালী' যখন ভানিচকাকে ভালোবাসছে তখন যদি হঠাৎ ভাসিলিকে দেখে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হৃদয়হীনার মত হৃদয় খান খান করে তার প্রেমকে পদদলিত করে (ইংরিজিতে যাকে বলে তাকে 'জিল্‌ট্' করে) ভাসিলিকে বরণ করতো তখনও 'দুলালীর' সে-প্রেম ধন্য ?

ঠাকুর দেবতার কার্যকলাপ আমাদের সমালোচনার বাইরে। এই যে কেষ্টঠাকুর রাধাকে জিল্‌ট্ করে মথুরা গিয়ে একাধিক প্রণয় এবং শুধু তাই নয়, রাধার কানের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে বিয়ে করলেন সেগুলোও ধন্য ? অথচ আমাদের হৃদয় তো পড়ে রইল শ্রীরাধার রাঙা পায়ে। শত শত বৎসর ধরে এই বাঙলাদেশে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরা আপন আপন বিরহবেদনা আপন আপন পদদলিত প্রেমের নিবিড়তম পীড়া তুলে দিলেন রাধার মুখে। তাই দিয়ে 'মাথুর' আর সেই জিনিসই পদাবলীর হৃদয়খণ্ড,—মেরুদণ্ড—যে নামেই তাকে ডাকা যাক। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা আমি পাইনি ঃ শত শত বৎসর ধরে হাজার হাজার কবি (এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর নাকি প্রায় শ' তিনেক বিধর্মী মুসলমান কবি ! ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয় এই অভাগিনী জিলটেড রাধার প্রেমে কী যাদুমন্ত্র লুকনো ছিল যে শত শত বিধর্মী কবিকেও তার সামনে নতমস্তক হতে হল !) আপন আপন হৃদয়বেদনা—যার মূল্য বিশ্বাসঘাতক, প্রেমঘ্ন নিরতিশয় স্বার্থপর, নীচ, দয়িত দিল না—নিজের মুখে প্রকাশ না করে সর্ব বৈভব নতনমস্কারে রেখে দিল পাগলিনী শ্রীরাধার অধরোষ্ঠে। তার হয়তো একমাত্র কারণ, উপনিষদ বলেছেন, 'তাকে ত্যাগ করে ভোগ করবে।' শ্রীরাধা প্রেম দিয়ে আনন্দ পেতে চান নি, মাতৃত্বের বিগলিত মধুরিমা, যশোদার মত বিশ্বজয়ী পুত্রের গৌরবও তিনি কামনা করেন নি। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভোগ করলেন। এ ভোগ 'দুলালী'র ভোগ নয়। এ শচীপতি ইন্দ্রের ভোগ নয়, এ শ্মশানবাসী নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য।

কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্রসৃষ্টিতে পদদলিত প্রেমের উদাহরণ নেই। যাঁর জন্য তাঁর বিরহবেদনা তাঁর শত শত গানে প্রকাশ পেয়েছে তিনিও কবিকে ভালোবাসেন—তাঁর 'প্রেমের বেদনাতে' কবির 'মূল্য আছে'—শুধু তিনি চলে গেছেন দূরে। রবিপ্রেম কখনো লাঞ্ছিত হয় নি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না।

কিন্তু এ তো একটা দিক। আমার মূল প্রশ্ন এখনো পাঠকের কাছে রইল, অতি ঘরোয়া ভাষায় শুধোই, এই যে আমাদের সোসাইটি লেডি, আজ মুখুয্যেকে জিল্‌ট্ করে কাল সেনকে, পরশু সেনকে জিল্‌ট্‌কে করে ঘোষকে—তাঁর প্রত্যেক প্রেমের জয়ধ্বনি গাইবেন টলস্টয় ?

সর্বশেষে পুনরায় বিস্ময় মানি চেখফের এই গল্পটির সামনে। বিস্ময় মানি টলস্টয়ের টীকার সম্মুখে। আমাদের মত জড় পাষাণ-হৃদয়কে বিগলিত করে বইয়ে দিল শত শত প্রশ্নধারায়।

৩রা জুলাই ১৯৬৩।

আন্তন চেখফের "বিয়ের প্রস্তাব"

অনুবাদকের টিপ্পনী

আন্তন চেখফের রচনায় রাশার যে-যুগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে আমাদের জমিদারী-যুগের প্রচুর মিল দেখতে পাই। সেই কারণেই বোধহয় আমাদের শরৎচন্দ্র প্রচুর রাশান উপন্যাস, ছোট গল্প অতিশয় মনযোগ সহকারে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অসাধারণ শিল্পী, তাই তাঁর পরিণত বয়সের লেখাতে অন্যের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। তবে যদি কোন সাহিত্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকে তবে সেটা রুশ সাহিত্য। তাঁর 'দত্তা'র সঙ্গে এ-নাটিকার কোন মিল নেই, কিন্তু দুটিতেই আছে একই জমিদারির আবহাওয়া।

চেখফ যে যুগের বর্ণনা দিয়েছেন সে সময় একই লোককে ভিন্ন ভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডাকত। যেমন এই নাটিকার নাম নাতালিয়া স্তেপানভনা চুবুকফ। অতি অল্প পরিচয়ে লোক তাকে ডাকবে মিস চুবুকফ বলে। যাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, তারা ডাকবে নাতালিয়া স্তেপানভনা (স্তেপানভনা=স্তেপানের মেয়ে)। যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তারা ডাকবে শুধু নাতালিয়া, এবং যারা নিতান্ত আপন জন তারা ডাকবে নাতাশা। এখনো বোধহয় এই রীতিই প্রচলিত আছে, তবে যে-স্থলে মিস চুবুকফ বলা হত আজ বোধহয় সেখানে কমরেড চুবুকফ বা চুবুকভা বলা হয়।

পাত্র-পাত্রীগণ:

স্তেপান স্তেপানভিচ চুবুকফ—জমিদার।

নাতালিয়া (ডাক নাম নাতাশা) স্তেপানভ্না চুবুকফ—ঐ জমিদারের কন্যা; বয়স ২৫।

ইভান ভাসিলিয়েভিচ্ লমফ্—চুবুকফের প্রতিবেশী জমিদার, স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু সমস্তক্ষণ ভাবেন তিনি বড্ডই অসুস্থ (হাইপোক্রোন্‌ডিআক)।

ঘটনা চুবুকফের জমিদারীতে।

[চুবুকফের ড্রইংরুম। চুবুকফ এবং লমফ; ঈভনিং ড্রেস এবং সাদা দস্তানা পরে লমফের প্রবেশ]

চুবুকফঃ [লমফের দিকে এগিয়ে গিয়ে] এস, এস, বন্ধুবর। এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ! কিন্তু বড় আনন্দ হল, বড়ই আনন্দ হল [হ্যাণ্ডশেক্]। সত্যি একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে, ভায়া। কি রকম আছ?

লমফঃ ধন্যবাদ। আর আপনি কি রকম আছেন?

চুবুকফঃ মোটামুটি আমাদের ভালোই যাচ্ছে, বাছা—তোমাদের প্রার্থনা আর-যা-সব-কি-সব তো রয়েছে। বসো, বসো। জানো, এরকম করে পুরনো দিনের প্রতিবেশীকে তোমার ভুলে যাওয়া উচিত? বড় খারাপ, বড্ডই খারাপ। কিন্তু বলো দিকিনি, এত সব ধড়াচুড়ো পরে কেন? পুরো-পাক্কা ফুল ডিনার ড্রেস, হাতে দস্তনা আর-যা-সব-কি-সব? কারো সঙ্গে পোষাকী দেখা করতে যাচ্ছো নাকি, না অন্য কিছু ভায়া?

লমফঃ আজ্ঞে না, শুধু আপনাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

চুবুঃ তবে ফুল ডিনার ড্রেস কেন, ভায়া। মনে হচ্ছে তুমি যেন নববর্ষে পোষাকী মোলাকাৎ করতে এসেছ!

লমফঃ ব্যাপারটা হচ্ছে···(চুবুকফের হাত ধরে)···আমি কি না, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে, স্যর—শুধু আশা করছি আপনি বিরক্ত হবেন না। আপনার কাছ থেকে এর আগেও আমি সাহস করে কয়েকবার সাহায্য চেয়েছি এবং আপনিও, সব সময়েই, বলতে কি··কিন্তু মাফ করুন, আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে··আমি একটুখানি জল খাই। [জলপান]

চুবু ঃ [নেপথ্যে] টাকা ধার চাইতে এসেছে নিশ্চয়ই। দেব না। [লমফকে] কি হয়েছে, বলো না ভায়া।

লমফ ঃ দেখুন স্যর,…কিন্তু মাফ করুন, স্যর…আমার সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে…দেখতেই পাচ্ছেন…মানে কি না, আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমায় সাহায্য করতে পারেন, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এ যাবত আপনার জন্য এমন কিছু করতে পারিনি যার জন্য আপনার কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি, সত্যি, আমার সে হক্ক আদপেই নেই…

চুবু ঃ কী বিপদ! অত সূতো ছাড়ছ কেন, ভায়া। বলেই ফেল না, কি হয়েছে বলো।

লমফ ঃ বলছি, বলছি, এখ্খুনি বলছি…ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আমি আপনার মেয়ে নাতালিয়া স্তেপানভনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

চুবু ঃ (সোল্লাসে) ইভান ভাসিয়েলিভিচ! প্রাণের বন্ধু আমার! ফের বলো তো, কি বললে। আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাইনি।

লমফ ঃ অতিশয় সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি…

চুবু ঃ [বাধা দিয়ে] সোনার চাঁদ ছেলে! আমি যে কী খুশী হয়েছি আর-যা-সব-কি-সব। নিশ্চয় নিশ্চয় আর-যা-সব-কি-সব। [লমফকে আলিঙ্গন ও চুম্বন] ঠিক এই জিনিসটিই আমি বহুকাল ধরে চাইছিলুম [এক ফোঁটা চোখের জল] তোমাকে আমি চিরকালই আপন ছেলের মত স্নেহ করেছি। ভগবান তোমাদের হৃদয়ে একে অন্যের জন্য প্রেম দিন, তোমাদের মনের মিল হোক, আর-যা-সব-কি-সব। সত্যি বলতে কি, আমি সব সময়েই চেয়েছিলুম…কিন্তু আমি এখানে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছি কি? আমাকে কেউ যেন আনন্দের ডাণ্ডশ মেরেছে— আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না! আহা, আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে —আমি গিয়ে নাতাশাকে ডাকছি, আর-যা-সব-কি-সব—

লমফ ঃ স্তর, উনি কি বলবেন আপনার মনে হয়? তিনি সম্মতি দেবেন, আশা করতে পারি কি?

চুবু ঃ কি বললে? নাতাশা যদি রাজী নাও হতে পারে! অবাক করলে! আর তোমার চেহারাটাও চমৎকার নয়? ধরো বাজি, ও তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আর-যা-সব-কি-সব। আমি এখুনি তাকে বলছি গে। [নিষ্ক্রমণ]

লমফ [একা] ঃ আমার শীত শীত করছে···আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে যেন পরীক্ষার হলে যাচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে, মন স্থির করা। বেশী দিন ধরে শুধু যদি ভাবতেই থাকো, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে শুধু আলোচনা করো, গড়িমসি গড়িমসি করতে থাকো, আর কোন এক আদর্শ রমণীর জন্য কিংবা খাঁটি, সত্য প্রেমের জন্য পথ চেয়ে থাকো, তবে তোমার কখ্খনো বিয়েই হবে না। উহুহুহু···কী শীত করছে আমার! নাতালিয়া স্তেপানভনা সংসার চালায় চমৎকার, লেখাপড়ি করেছে আর দেখতেও খারাপ নয়···এর বেশী আমার কীই বা চাই? কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। মাথাটা তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। [জল পান] কিন্তু আমার আইবুড়ো হয়ে থাকা চলবে না। পয়লা কথা, আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ঃ আমাকে মেপেজুকে ছকে কাটা জীবন চালাতে হবে···আমার বুকের ব্যামো রয়েছে, ভিতরটা সর্বক্ষণ ধড়ফড়···আমি কত সহজেই রেগে কাঁই হয়ে যাই আর কত সহজেই উত্তেজনার চরমে পৌঁছে যাই···এই তো, এই এখ্খুনি আমার ঠোঁট কাঁপছে আর ডান চোখের পাতাটা নাচছে···কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হল আমার ঘুম নিয়ে। বিছানায় যেই শুয়েছি আর চোখদুটো জুড়ে আসছে অমনি কি যেন কি একটা আমার বাঁ পাশটায় ছোরা মারে। এক্কেবারে ছোরা মারার মত! আর সেটা সরাসরি আমার কাঁধের ভিতর দিয়ে গিয়ে মাথা অবধি পৌঁছে যায়···আমি ক্ষ্যাপার মত লাফ

দিয়ে উঠি, খানিকটা পায়চারি করি, ফের শুয়ে পড়ি···কিন্তু যেই না আবার ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এল আর অমনি আবার পাশের দিকটায় সেই ছোরার ঘা—আর ঐ একই ব্যাপার নিদেন কুড়িটি বার···

[নাতালিয়ার প্রবেশ]

নাতালিয়া : ও, আপনি ! অথচ বাবা বললেন : যাও, খদ্দের মাল নিতে এসেছে। কি রকম আছেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ ?

লমফ : আপনি কি রকম, নাতালিয়া স্তেপানভনা ?

নাতালিয়া : কিছু মনে করবেন না, আমার এপ্রন পরা রয়েছে, ভদ্র-দুরুস্ত জামা কাপড় পরিনি বলে। আমরা মটরশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিলুম রোদ্দুরে শুকোবার জন্যে। এতদিন আমার সঙ্গে যে বড় দেখা করতে আসেন নি ? বসুন না···[দুজনেই বসলেন] দুপুর বেলা এখানে খাবেন ?

লমফ : না। অনেক ধন্যবাদ। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : সিগরেট খাবেন না ? এই তো দেশলাই···আজকের দিনটা চমৎকার, কিন্তু কাল এমনি জোর বৃষ্টি হল যে মজুররা সমস্ত দিন কিছুই করতে পারলো না। জানেন, আমরা কাল ক'গাদা খড় তুলতে পেরেছি ? বিশ্বাস করবেন না, আমি সব খড় কাটিয়ে নিয়েছিলুম, আর এখন তো আমার প্রায় দুঃখ হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, সব খড় পচে না যায়। হয়তো অপেক্ষা করলে ভালো হত। কিন্তু এসব কি ? আমার মনে হচ্ছে আপনি ধড়াচূড়ো পরেছেন। এ তো নূতন দেখলুম। আপনি কি বল্ নাচ কিংবা অন্য কিছু একটায় যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনি বদলে গেছেন—ভালো দেখাচ্ছে আগের চেয়ে !···কিন্তু, সত্যি, আপনি ধড়াচূড়ো পরেছেন কেন ?

লমফ : [উত্তেজিত হয়ে] ব্যাপারটা কি জানেন, নাতালিয়া স্তেপানভনা···আসলে কি জানেন, আমি মনস্থির করেছি,

আপনাকে···মন দিয়ে শুনুন···আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন, হয়তো বা রাগ করবেন, কিন্তু আমি···[নেপথ্যে] আমি শীতে জমে গেলুম।

নাতালিয়া ঃ কি বলুন তো। [একটু থেমে] বলুন।

লমফ ঃ সংক্ষেপেই বলি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, শ্রীমতী নাতালিয়া স্তেপানভনা, যে, আমি বহুকাল ধরে আপনাদের পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছি—ছেলে বয়েস থেকে, সত্যি বলতে কি। আমার যে পিসিমার কাছে থেকে তিনি গত হলে পর তাঁর জমিদারি পেয়েছি তিনি আর পিসেমশাই দুজনাই আপনার পিতা এবং স্বর্গত মাতাকে গভীর সম্মানের চক্ষে দেখতেন। লমফ আর চুবুকফ পরিবারে বরাবরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এমন কি ঘনিষ্ঠতাও ছিল, বলা চলে। তা ছাড়া, আপনি জানেন, আমার জমিদারী আপনাদের জমিদারীর একেবারে গা ঘেঁষে। আপনার হয়তো মনে পড়বে আমার ভলোভী মাঠ আপনাদের বার্চ বনের লাগাও।

নাতালিয়া ঃ মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনার কথা কাটতে হল। আপনি যে বলেছেন, 'আমার' ভলোভী মাঠ···কিন্তু ওটা কি সত্যি আপনার ?

লমফ ঃ হ্যাঁ, আমার···

নাতালিয়া ঃ তাই নাকি ! এর পর আর কি চেয়ে বসবেন ! ভলোভী মাঠ আমাদের, আপনার নয়।

লমফ ঃ না। ওটা আমার, নাতালিয়া স্তেপানভনা।

নাতালিয়া ঃ এটা আমার কাছে নূতন খবর বলে ঠেকছে। ওটা আপনার হল কি করে ?

লমফ ঃ তার মানে ? আমি তো সেই ভলোভী মাঠের কথা বলছি যেটা আপনাদের বার্চ বন এবং পোড়া-বনের মাঝখানটায়···

নাতালিয়া ঃ হ্যাঁ, সেইটের কথাই তো হচ্ছে···ওটা আমাদের।

লমফ : না, আপনি ভুল করছেন নাতালিয়া স্তেপানভনা, ওটা আমার।

নাতালিয়া : পাগলামি ছাড়ুন ইভান ভাসিয়েলিভিচ ! ওটা ক'দিন ধরে আপনাদের হয়েছে ?

লমফ : 'ক'দিন ধরে' মানে ? যতদিন ধরে আমার মনে পড়ে— ওটা তো চিরকালই আমাদের।

নাতালিয়া : আমাকে মাফ করতে হচ্ছে, আমি একমত হতে পারছিনে।

লমফ : কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলেই দলিল-পত্রে জিনিসটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন। একথা অবশ্যি সত্য, যে ভলোভী মাঠের স্বত্ব নিয়ে এক সময় মতবিরোধ হয়েছিল কিন্তু এখন তো কুল্লে দুনিয়া জানে, ওটা আমার। তা নিয়ে তর্কাতর্কি করার এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাকে জিনিসটা বুঝিয়ে বলছি—আমার পিসীর ঠাকুরমা আপনার প্রপিতামহের রায়তদের ঐ মাঠটা বিনা খাজনায়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করতে দেন; তার বদলে ওরা তাঁর ইটের পাঁজা পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার প্রপিতামহের চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ওটা লাখেরাজ ভোগ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে মনে করে ওটার স্বত্ব ওদেরই। কিন্তু দাস-প্রথা উঠে যাওয়ার পর যখন নূতন বন্দোবস্ত হল···

নাতালিয়া : কিন্তু আপনি যা বলছেন সেটা আদপেই ও রকম ধারা নয় ! আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ জানতেন যে তাঁদের জমিদারীর হদ্দ পোড়া-বন অবধি—কাজেই ভলোভি মাঠ আমাদের সম্পত্তির ভিতর পড়ল বইকি। তা হলে সেটা নিয়ে খামখা তর্ক করছেন কেন ? আমি সত্যি আপনার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছিনে। হক কথা বলতে কি, আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

লমফ : আপনাকে আমি দলিল-দস্তাবেজ দেখাব নাতালিয়া স্তেপানভনা !

নাতালিয়া ঃ না। আমার মনে হচ্ছে, আপনি মস্করা করছেন কিংবা আমাকে চটিয়ে মজা দেখছেন···বাস্তবিক, এটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। জমিটা প্রায় তিনশ' বছর ধরে আমাদের স্বত্বে, আর আজ হঠাৎ একজন বলে উঠলো, ওটা আমাদের নয়। মাফ করবেন, ইভান ভাসিয়েলিভিচ, আমি আমার আপন কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না···অবশ্য আমি ঐ জমিটার কোনো মূল্যই দিইনে। কত আর হবে—পনেরো একরটাক, তিন শ' রুবলের বেশী ওর দাম হবে না, কিন্তু ওটা নিয়ে এই নাহক অবিচার আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়। আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অন্যায় অবিচার বরদাস্ত করতে পারিনে।

লমফ ঃ আপনাকে মিনতি করছি, আমার সব কথা শুনুন। আপনার প্রপিতামহের চাষারা আমার পিসির ঠাকুরমার ইঁট পোড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়—একথা আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আমার পিসির ঠাকুরমা তার বদলে ওদের অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে ··

নাতালিয়া ঃ ঠাকুদ্দা, ঠাকুমা, পিসি···আমার মাথায় ওসব কিছুই ঢুকছে না। মাঠটা আমাদের, ব্যস !

লমফ ঃ ওটা আমার !

নাতালিয়া ঃ ওটা আমাদের ! আপনি ঝাড়া ছদিন ধরে তর্ক করুন, যদি সাধ যায় পনেরোটা ধড়াচূড়ো সর্বাঙ্গে চড়ান, কিন্তু তবু ওটা আমাদেরই, আমাদেরই, আমাদেরই !···আপনার জিনিস আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা আমি হারাতে চাইনে··· আপনার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন !

লমফ ঃ ও মাঠ আমি চাইনে, নাতালিয়া স্তেপানভনা, কিন্তু এটা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের কথা। আপনি যদি চান তবে ওটা আমি আপনাকে উপহার দিতে পারি।

নাতালিয়া ঃ কিন্তু ওটা যদি বিলিয়ে দিতে হয় তো সে হক তো আমার—কারণ ওটা তো আমার জিনিস। আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ইভান ভাসিয়েলিভিচ, আমার কাছে সব-কিছু বড্ডই আজগুবি মনে হচ্ছে। এতদিন অবধি আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী বলেই মনে করেছি, আমাদের বন্ধুরূপেই আপনাকে গণ্য করেছি। গেল বছরে আমরা আপনাকে আমাদের গম-মাড়াইয়ের কলটা ধার দিলুম ; ফলে আমাদের আপন গম তুলতে তুলতে নভেম্বর হয়ে গেল। আর এখন আপনি আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন যেন আমরা রাস্তার বেদে। আমাকে উপহার দিচ্ছেন আমার নিজের জমি! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা কি প্রতিবেশীর আচরণ? আমি বলবো, এটা রীতিমত বেয়াদবা—যদি শুনতেই চান…

লমফ ঃ আপনি বলতে চান, আমি তছরুপ করি। আমি কখনো অন্যের জিনিস চুরি করিনি, ম্যাডাম, আর কেউ এ কথা বললে আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করবো না…[দ্রুতগতিতে জগের কাছে গমন ও জল পান] ভলোভী মাঠ আমার!

নাতালিয়া ঃ কচু! ওটা আমাদের!

লমফ ঃ ওটা আমার!

নাতালিয়া ঃ ডাহা মিথ্যে! আপনাকে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি! আজই আমি আমার লোকজনকে ঐ মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাচ্ছি।

লমফ ঃ কি বললেন?

নাতালিয়া ঃ আমার লোকজন আজই ওখানে কাজ করবে।

লমফ ঃ আমি ওদের লাথি মেরে খেদিয়ে দেব!

নাতালিয়া ঃ আপনার সে মুরদ নেই!

লমফ ঃ [বুক আঁকড়ে ধরে] ভলোভী মাঠ আমার! এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না? আমার!

নাতালিয়া ঃ দয়া করে চ্যাঁচাবেন না। আপন বাড়িতে বসে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু এখানে বাড়াবাড়ি করবেন না!

লমফ ঃ আমার বুকের ভিতর যদি ওরকম মারাত্মক ব্যথা আর ধড়ফড়ানি না থাকতো, ম্যাডাম, আমার রগ দুটো যদি দপদপ না করতো, আমি তা হলে আপনার সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলতুম! [চিৎকার করে] ভলোভী মাঠ আমার!

নাতালিয়া ঃ আমাদের!

লমফ ঃ আমার!

নাতালিয়া ঃ আমাদের!

লমফ ঃ আমার!

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবুকফ ঃ ব্যাপার কি? তোমরা চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

নাতালিয়া ঃ বাবা, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু বুঝিয়ে বলো না, ভলোভী মাঠটা কার—ওঁর, না, আমাদের।

চুবু ঃ [লমফকে] মাঠটা আমাদের, বাবা।

লমফ ঃ মাফ করবেন, স্যর; ওটা আপনাদের হল কি করে? আপনি অন্তত হক্কের বিচার করবেন! আমার পিসির ঠাকুরমা আপনার ঠাকুরদার চাষাদের জমিটা কিছুদিনের জন্য লাখেরাজ ভোগ করতে দেন। চাষারা প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে সেটা ভোগ করে। ফলে আস্তে আস্তে ওদের বিশ্বাস হয়ে যায় ওটা ওদেরই। কিন্তু পরে যখন নূতন বন্দোবস্ত হল...

চুবু ঃ কিছু মনে করো না, বাবা...তুমি ভুলে যাচ্ছো যে ঐ জমিটার স্বত্ব আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঝামেলা ছিল বলেই চাষারা তোমার ঠাকুরমাকে কোনো খাজনা দেয়নি, আর-যা-সব-কি-সব...আর এখন গাঁয়ের কুকুরটা পর্যন্ত জানে যে ওটা আমাদের—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি নিশ্চয়ই জরিপের ম্যাপগুলো দেখোনি।

লমফ: কিন্তু আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব, জমিটা আমার।

চুবু: সে, বাছা, তুমি পারবে না।

লমফ: নিশ্চয় পারবো।

চুবু: কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছো কেন, লক্ষ্মীটি! চ্যাঁচালেই কি কোনো জিনিস প্রমাণ হয়! তোমার যা হক্কের মাল তা আমি চাইনে, কিন্তু যে জিনিস আমার সেটা ছাড়বার বাসনা আমার কণামাত্র নেই। ছাড়বো কেন? অবশ্য আখেরে যদি তাই দাঁড়ায়, অর্থাৎ তুমি যদি ঐ জমি নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া আরম্ভ করতে চাও, আর-যা-সব-কি-সব, তা হলে আমি বরঞ্চ আমার চাষাদের ঐ জমিটা বিলিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে না। এই হল পাকা কথা।

লমফ: আমি তো বুঝতে পারলুম না। পরের সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার কি হক্ক আপনার?

চুবু: আমার কি হক্ক আছে, না আছে সেটা স্থির করার ভার দয়া করে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আর শোনো, ছোকরা, আমি এরকম ধরনের কথা বলা আর-যা-সব-কি-সব শুনতে অভ্যস্ত নই ··আমার বয়েস তোমার ডবল; তবু তোমায় অনুরোধ করছি ওরকম মাথা গরম করে আর-যা-সব-কি-সব ও রকম ধারা আমার সঙ্গে কথা কয়ো না···

লমফ: না। আপনারা ভেবেছেন আমি একটা আস্ত গাড়ল আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন। আমার জমি বলছেন আপনাদের আর তারপর আশা করছেন আমি সুবোধ ছেলেটির মত শান্ত কণ্ঠে আর পাঁচজনের মত কথাবার্তা বলবো। ভালো প্রতিবেশী এরকম কথা বলে না, স্তেপান স্তেপানভিচ মশাই! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি পরের জমির বেদখলকারী!

চুবু: মানে? কি বললে?

নাতালিয়াঃ বাবা এখ্‌খুনি মজুরদের মাঠে ঘাস কাটতে পাঠাও।

চুবু [লমফকে]ঃ আপনি আমাকে কি বলছিলেন, স্যর ?

নাতালিয়াঃ ভলোভি মাঠ আমাদের আর ওটা আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না।

লমফঃ সে আমরা দেখে নেব। আমি আদালতে সপ্রমাণ করে ছাড়ব ও মাঠ আমার।

চুবুঃ আদালতে? আপনি আদালতে যান না, স্যর, আর-যা-সব-কি-সব। যান না, যান। আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি—এতদিন ধরে শুধু অপেক্ষা করেছিলে আদালতে যাবার জন্য একটা মোকা পাওয়ার আর-যা-সব-কি-সব। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাতামাতি করা—ঐ তো তোমাদের স্বভাব তোমাদের পরিবারের সব কজনাই মামলাবাজীতে ওস্তাদ! সব কটা।

লমফঃ দয়া করে আমার পরিবারের লোককে অপমান করবেন না। লমফগুষ্ঠির সবাই ভদ্রসন্তান, আপনার কাকার মত তহবিল তছরূপের দায়ে কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি!

চুবুঃ লমফ পরিবারের সব কটা বদ্ধ পাগল!

নাতালিয়াঃ সব কটা—সাকুল্যে!

চুবুঃ তোমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঁড় মাতাল, আর তোমার ছোট মাসি নাতাসিয়া মিহাইলভনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা—এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে যায়, আর যা-সব-কি-সব।

লমফঃ আর আপনার মা ছিলেন কুঁজো! [হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে] আমার বুকের সেই বেদনাটা চিলিক মারছে···সব রক্ত আমার মাথায় উঠে গেছে···হে ভগবান জল, জল!

চুবুঃ তোমার বাবা ছিলেন জুয়াড়ি আর পেটুকের হদ্দ।

নাতালিয়াঃ তোমার পিসি ছিলেন একটি সাক্ষাৎ নারদ—গাঁ উজাড় করলে ওঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার!

লমফ : আমার বাঁ পা-টা অবশ হয়ে গিয়েছে···আর আপনার পেটে জিলিপির প্যাঁচ···ও, আমার বুকটা গেল···আর সবাই জানে, নির্বাচনের আগে আপনি···আমার চোখের সামনে বিজলি খেলে যাচ্ছে···আমার টুপিটা গেল কোথায় ?

নাতালিয়া : এসব ছোটলোকমি ! ধাপ্পাবাজি ! নোংরামির চূড়ান্ত !

চুবু : আর তুমি কুচুটে, ভণ্ড, ছোটলোক ! হ্যাঁ তা-ই।

লমফ : হ্যাটটা পেয়েছি···ও আমার বুকের ভিতরটা···কোন্ দিক দিয়ে বেরুবো ? দরজাটা কোথায় ? ও, আমি আর বাঁচবো না ···আমার পা যে আর নড়ছে না [দরজা পর্যন্ত গমন]

চুবু : [লমফকে পিছন থেকে চেঁচিয়ে] আমার বাড়িতে আর কক্‌খনো পা ফেলবে না।

নাতালিয়া : আদালতে যান ! আমরাও দেখে নেব !

[টলতে টলতে লমফের প্রস্থান]

চুবু : জাহান্নমে যাক ! [উত্তেজনার সঙ্গে পায়চারি]

নাতালিয়া : এ রকম একটা ছোটলোক দেখেছ কখনো ? এর পরও লোকে বলে প্রতিবেশীর উপর ভরসা রাখতে !

চুবু : আস্ত একটা সং ! বদমাইশ !

নাতালিয়া : পিচেশ ! অন্যের জমি বেদখল করে উল্টে দেয় গালাগাল ?

চুবু : সৃষ্টিছাড়া ব্যাটা চক্ষুশূল—জানো, ব্যাটার বেয়াদপী কতখানি ? এখানে এসেছিল প্রস্তাব পাড়তে, আর যা-সব-কি-সব ! বিশ্বাস হয় তোমার ? প্রস্তাব করতে ?

নাতালিয়া : কিসের প্রস্তাব ?

চুবু : হ্যাঁ, ভাবো দিকিনি, এসেছিল তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে !

নাতালিয়া : বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ? আমাকে বিয়ে করতে ? আমাকে আগে বললে না কেন ?

চুবু : তাইতো ধড়াচূড়ো পরে এসেছিল ! বাঁদর ! খাটাশ !

নাতালিয়া : আমাকে বিয়ে করতে ? বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ? ও ! [চেআরে পতন—গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস ! ওকে ডেকে নিয়ে এস ! ও !—ডেকে নিয়ে এস ?

চুবু : কাকে ডেকে নিয়ে আসবো ?

নাতালিয়া : শিগগির করো, জলদি যাও ! আমি যে ভিরমি যাব। ওকে ডেকে নিয়ে এস ! [ছন্নের মত আর্তরব]

চুবু : কি বলছো ! কি চাও তুমি ? [দু হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে] এ কী অভিসম্পাত ! আমি বন্দুকের গুলিতে মরব ! আমি নিজের হাতে ফাঁস পরবো ! সবাই মিলে আমার সর্বনাশ করেছে।

নাতালিয়া : আমি মরে যাচ্ছি। ওকে ডেকে নিয়ে এস !

চুবু : বাপ্ স্ ! যাচ্ছি, যাচ্ছি। ও রকম হাউমাউ করো না। [ধাবমান]

নাতালিয়া [একা, গুঙরে গুঙরে] : আমরা কি করে বসেছি। ওগো, ওকে ডেকে নিয়ে এস, ফিরিয়ে নিয়ে এস !

চুবু : [দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন] এখ্ খুনি আসছে ও—আর-যা-সব-কি-সব। জাহান্নমে যাক ব্যাটা ! আখ্ ! তুমি ওর সঙ্গে নিজে কথা বলো ; আমার দ্বারা হবে না, পষ্ট বলে দিলুম !

নাতালিয়া : [গুঙরে গুঙরে] ওকে ডেকে নিয়ে এস !

চুবু : [চিৎকার করে] ও আসছে, আসছে, তোমায় বলছি তো ! হে ভগবান, আইবুড়ো মেয়ের বাপ হওয়া কী গব্বযন্তনা ! আমি আমার গলায় দা বসাব ! হ্যাঁ, আলবৎ। আমি আমার গলাটা কেটে ফেলব। আমরা লোকটাকে গালাগাল দিয়েছি, অপমান করেছি, লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছি—আর এসবের মূলে তুমি—তুমিই করেছ এসব।

নাতালিয়া : না, তুমি !

চুবু : ও ! এখন সব দোষ আমার ! আর কি শুনতে হবে তারপর ?

[লমফের প্রবেশ]

লমফ : [অবসন্ন] আমার বুক ভীষণ ধড়ফড় করছে···আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে···বাঁ পাশটায় অসহ্য যন্ত্রণা···

নাতালিয়া : আমাদের মাফ করুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ, আমরা ঝোঁকের মাথায়···আমার এখন মনে পড়ছে, ভলোভী মাঠ সত্যিই আপনার।

লমফ : আমার বুকটায় যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে···মাঠটা আমার··· আমার দুটো চোখ কর কর করছে···

নাতালিয়া : হ্যাঁ মাঠটা আপনার, আপনারই···বসুন···[উভয়েরই উপবেশন] আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

লমফ : আমার কাছে এটা ন্যায়-অন্যায়ের কথা···জমিটার আমি কোনো মূল্য দিইনে, কিন্তু ন্যায়ের মূল্য আমি দি···

নাতালিয়া : সত্যিই তো ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা···ওসব বাদ দিন···অন্য কথা পাড়ুন !

লমফ : বিশেষত আমার কাছে যখন প্রমাণ রয়েছে ! আমার পিসিমার ঠাকুরমা আপনার বাবার ঠাকুরদার চাষাদের···

নাতালিয়া : হয়েছে, হয়েছে, ওসব কথা তো হয়ে গিয়েছে···[স্বগত] কি করে আরম্ভ করবো, বুঝতে পারছিনে···[লমফকে] আপনি কি শিগগিরই শিকারে বেরুচ্ছেন ?

লমফ : ভাবছি, নবান্নের পরই বন-মোরগ শিকারে বেরবো···মনে পড়ল ; আপনি কি শুনেছেন, আমার কি মন্দ কপাল···আমার ট্রাইয়ার বেচারী—আপনি তো ওকে চেনেন—ওর পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।

নাতালিয়া : আহা, বেচারা ! কি করে হল ?

লমফ : আমি ঠিক জানিনে···বোধহয় পায়ের থাবা মচকে গিয়েছে,

কিংবা হয়তো অন্য কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছে…[দীর্ঘনিশ্বাস] আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর, টাকার কথা না হয় বাদই দিলুম ! জানেন, মিরনফকে একশ' পঁচিশ রুবল দিয়ে ওকে কিনি।

নাতালিয়া : বড্ড বেশী দিয়েছিলেন, ইভান ভাসিয়েলিভিচ।

লমফ : আমার তো মনে হয়, সস্তাতেই পেয়েছি। ওর মত কুকুর হয় না !

নাতালিয়া : বাবা তার ফ্লাইয়ারের জন্য পঁচাশি রুবল দিয়েছিলেন। আর ফ্লাইয়ার আপনার ট্রাইয়ারের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

লমফ : ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো ? কি যে বলছেন ! [হাস্য] ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে ভালো !

নাতালিয়া : নিশ্চয়ই ভালো ! অবশ্য স্বীকার করছি, ফ্লাইয়ার বাচ্চা—এখনো পুরো বয়েস হয়নি—কিন্তু যেমন বুদ্ধি তেমনি আর সব দিক দিয়ে। ভলচানিয়েৎস্কিরও এমন একটা কুকুর নেই।

লমফ : মাফ করতে হল, নাতালিয়া স্তেপানভনা, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ও থ্যাবড়া-মুখো, আর থ্যাবড়া-মুখো কুকুর কখ্খনো ভালো করে কামড়ে ধরতে পারে না।

নাতালিয়া : থ্যাবড়া-মুখো ? এই প্রথম শুনলুম !

লমফ : আপনাকে পাকা কথা বলছি, ওর নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে ছোট।

নাতালিয়া : বটে ? আপনি মেপে দেখেছেন নাকি ?

লমফ : হ্যাঁ। শিকার তাড়া করতে অবশ্য সে ভালো, কিন্তু কামড়ে ধরার বেলা ওটাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না।

নাতালিয়া : প্রথমত, আমাদের ফ্লাইয়ার খানদানী কুকুর। হার্নেস আর চিজল ওর বাপ মা ! আর আপনার ট্রাইয়ারের গায়ে এমনই পাঁচমেশালি রঙ যে বলাই যায় না, ওটা কোন্ জাতের কুকুর। বিশ্রী চেহারা, বুড়ো-হাবড়া হয়ে গিয়েছে…

লমফ : ও বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু ওর বদলে আমি আপনাদের পাঁচটা ফ্লাইয়ারও নেব না···স্বপ্নেও না! ট্রাইয়ার যাকে বলে সত্যিকার কুকুর, আর ফ্লাইয়ার···কিন্তু এ-নিয়ে তর্ক করাটাই বেকুবি···আপনাদের ফ্লাইয়ারের মত কুকুর প্রত্যেক শিকারীরই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। ওর জন্য পঁচিশ রুবল দিলেও বড্ড বেশী দেওয়া হয়।

নাতালিয়া : সব কথা প্রতিবাদ করার শয়তান আজ আপনার ঘাড়ে চেপেছে, ইভান ভ্যাসিয়েলিভিচ। প্রথম আরম্ভ করলেন ভলোভী মাঠের উপর খামকা হক্ক বসিয়ে, আর এখন বলছেন, ট্রাইয়ার ফ্লাইয়ারের চেয়ে সরেস। কেউ কিছু বিশ্বাস করে না বললে আমার ভারী বিরক্তি বোধ হয়। যা বলেন, যা কন, আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ফ্লাইয়ার আপনার—কি যেন ওর নাম—ঐ বোকা ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে ভালো। তা হলে খামখা উল্টোটা বলছেন কেন?

লমফ : আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নাতালিয়া স্তেপানভনা, আপনি ভাবছেন আমি কানা কিংবা আহাম্মুখ। আপনি কি কিছুতেই বুঝবেন না যে আপনাদের ফ্লাইয়ার থ্যাবড়ামুখো?

নাতালিয়া : মিথ্যে কথা।

লমফ : ওটা থ্যাবড়ামুখো!

নাতালিয়া [চিৎকার করে] : মিথ্যে কথা!···

লমফ : আপনি চ্যাচাচ্ছেন কেন, ম্যাডাম?

নাতালিয়া : আপনি আবোল-তাবোল বকছেন কেন? পিত্তি একেবারে চটে যায়! ট্রাইয়ারকে গুলি করে মারার সময় হয়ে গিয়েছে আর আপনি ওটাকে ফ্লাইয়ারের সঙ্গে তুলনা করছেন!

লমফ : মাফ করবেন, আমি আর এ আলোচনা করতে পারবো না। আমার বুক ধড়ফড় করছে।

নাতালিয়া ঃ আমি লক্ষ্য করেছি, যে শিকার সম্বন্ধে যত কম বোঝে সে-ই শিকার নিয়ে তর্কাতর্কি করে বেশী।

লমফ ঃ মাদাম, দয়া করে চুপ করুন…আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। …[চিৎকার করে] চুপ করুন!

নাতালিয়া ঃ আমি চুপ করবো না, যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন, ফ্লাইয়ার ট্রাইয়ারের চেয়ে শতগুণে সরেস।

লমফ ঃ শতগুণে নিরেস। ওর এত দিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল— ঐ আপনাদের ফ্লাইয়ারের কথা বলছি। ও, আমার মাথাটা… আমার চোখ দুটো…আমার কাঁধটা!…

নাতালিয়া ঃ আর আপনাদের ঐ হাবা ট্রাইয়ারটা—আমাকে তার মৃত্যু কামনা করতে হবে না; ওটা তো আধমরা হয়েই আছে!

লমফ ঃ [কেঁদে কেঁদে] ঃ চুপ করুন! আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে।

নাতালিয়া ঃ আমি চুপ করবো না।

[চুবুকফের প্রবেশ]

চুবু ঃ এখন আবার কি?

নাতালিয়া ঃ আচ্ছা, বাবা, তুমি খোলাখুলি বলো তো, ধর্ম সাক্ষী করে বলো তো ঃ কোন্‌টা সরেস—আমাদের ফ্লাইয়ার, না, ওঁর ট্রাইয়ার?

লমফ ঃ স্তেপান স্তেপানভিচ, স্যর, আপনার পায়ে পড়ছি, মাত্র একটি কথা আমাদের বলুন, ফ্লাইয়ার থ্যাবড়ামুখো, কিংবা থ্যাবড়ামুখো নয়? হ্যাঁ কি না?

চুবু ঃ হলেই বা? যেন তাতে কিছু এসে যায়! যাই বল, যাই কও, ওর মত কুকুর তামাম জেলাতেও একটা নেই, আর-যা-সব-কি-সব।

লমফ ঃ কিন্তু আমার ট্রাইয়ার ওর চেয়ে সরেস। নয় কি? ধর্ম সাক্ষী করে বলুন।

চুবু ঃ ও রকম মাথা গরম করো না, বাছা আমার···বুঝিয়ে বলছি আমি···তোমার ট্রাইয়ারের বিস্তর সদগুণ আছে, কেউ অস্বীকার করবে না···জাতে ভালো, পাগুলো জোরদার, গড়ন চমৎকার আর-যা-সব-কি-সব। কিন্তু হক্ কথা যদি শুনতে চাও, বাছা, তবে বলি ওর দুটো মারাত্মক খুঁৎ আছে ঃ সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে আর তার প্যাঁচা-নাক।

লমফ ঃ মাপ করবেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে···কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি সেইটে দেখা যাক···আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, আমরা যখন মারুস্‌কিনের মাঠে শিকার করতে গিয়েছিলুম, আমার ট্রাইয়ার কাউন্টের স্পটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে সমান ছুটেছিল, আর আপনাদের ফ্লাইয়ার নিদেন পক্ষে পাকি আধটি মাইল পিছনে পড়ে ছিল।

চুবু ঃ কাউন্টের শিকারী তাকে চাবুক মেরেছিল বলে সে পিছিয়ে পড়ে।

লমফ ঃ সেইটেই তার প্রাপ্য। আর সব কটা কুকুর খেঁকশিয়ালকে তাড়া লাগাচ্ছিল আর ট্রাইয়ার জ্বালাতন করতে লাগলো ভেড়াগুলোকে

চুবু ঃ বাজে কথা! শোনো বাছা, আমি বড্ড সহজে চটে যাই, তাই তোমায় অনুরোধ করছি, এ আলোচনাটা থাক। লোকটা ফ্লাইয়ারকে চাবুক মেরেছিল, কারণ মানুষের স্বভাব অন্যের কুকুরের প্রতি হিংসুটে হওয়া···হ্যাঁ, পরের কুকুরকে কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না! আর আপনিও, স্যর, ওর ব্যত্যয় নন। হ্যাঁ, যেই দেখলে আর কারো কুকুর তোমার ট্রাইয়ারের চেয়ে সরেস, ব্যস্, অমনি জুড়ে দিলে কিছু একটা···আর-যা-সব-কি-সব ···দেখলে, আমার সব মনে থাকে।

লমফ ঃ আমারও।

চুবু ঃ [ভেংচিয়ে] আমারও।

লমফ ঃ বুক ধড়ফড় করছে…আমার পা অবশ হয়ে গিয়েছে…আমি কিছুই…

নাতালিয়া ঃ [ভেংচিয়ে] বুক ধড়ফড় করছে! কি রকম শিকারী মশাই, আপনি? আপনার উচিত শিকারে না গিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে শুয়ে আরশুলা মারা। বুক ধড়ফড় করছে, হুঁঃ!

চুবু ঃ হ্যাঁ, হক্ কথা বলতে কি, শিকার-টিকারে বেরোনো আদপেই তোমার কম্ম নয়। বুকের ধড়ফড়ানি আর-যা-সব-কি-সব নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝাঁকুনি খাওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে বাড়িতে বসে থাকাই ভালো। অবশ্য তুমি যদি সত্যিই শিকার করতে যেতে তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু তুমি তো যাও নিছক তর্কাতর্কি করার জন্য, আর অন্য পাঁচজনের কুকুরগুলোর সামনে পড়ে তাদের বাধা দেবার জন্য আর-যা-সব-কি-সব…আমি বড্ড সহজেই চটে যাই, কাজেই এ আলোচনা বন্ধ করাই ভালো। তুমি আদপেই শিকারী নও, ব্যস্।

লমফ ঃ আর আপনি—আপনি বুঝি শিকারী? আপনি তো যান কাউণ্টকে নিছক তেল মালিশ করার জন্য, আরু পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোটালা পাকাবার জন্য…ওঃ! আমার বুকের ব্যথাটা! আসলে আপনি কুচুটে।

চুবু ঃ কি? আমি—কুচুটে? [চিৎকার করে] চুপ করো!

লমফ ঃ কুচুটে!

চুবু ঃ ভেড়ে, বখা ছোকরা!

লমফ ঃ বুড়ো হাবড়া! ভণ্ড!

চুবু ঃ চুপ করো, না হলে আমি একটা নোংরা বন্দুক দিয়ে তোমাকে তিতির মারার মত গুলি করে মারবো! ফক্কিকার কোথাকার!

লমফ ঃ দুনিয়াসুদ্ধ জানে—ও, ফের আমার হার্টটা!—আপনাকে আপনার স্ত্রী ঠ্যাঙাতো!…আমার পাটা…আমার মাথাটা…

চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে···আমি পড়ে যাব···আমি পড়ে যাচ্ছি···

চুবু : আর যে মাগী তোমার বাড়ি চালায় সে তোমাকে চেপে রেখেছে বুড়ো আঙুলের তলায়।

লমফ : ও, ও, ও! আমার হার্টটা ফেটে গিয়েছে! আমার কাঁধটা যে আর নেই···আমার কাঁধটা কোথায়?···আমি মরলুম [আরামচেআরে পতন] ডাক্তার! (মূর্ছা)

চুবু : ভেড়ে! বকা! ফক্কিকার! আমি জোর পাচ্ছিনে। [জলপান] ভিরমি যাচ্ছি নাকি!

নাতালিয়া : শিকারী, হুঁ! ঘোড়ার উপর কি রকম বসতে হয়, তাই জানেন না আপনি! [পিতাকে] বাবা, কি হ'ল ওর? বাবা! দেখ, বাবা [চিৎকার করে] ইভান ভাসিলিয়েভিচ্। তিনি মরে গেছেন !

চুবু : আমি মূর্ছা যাচ্ছি···আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! বাতাস, আমাকে বাতাস দাও।

নাতালিয়া : ইনি মারা গেছেন! [লমফের আস্তিন ধরে টানাটানি] ইভান ভাসিলিভিচ! ইভান ভাসিলিভিচ! আমরা কি করে বসলুম। ইনি মারা গেছেন! [আর্মচেআরে পতন] ডাক্তার! ডাক্তার! [ছন্নের মত কখনো ফোঁপানো, কখনো হাসি]

চুবু : ব্যাপার কি? কি হয়েছে? তুমি কি চাও?

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] মারা গেছেন···উনি মারা গেছেন!

চুবু : কে মারা গেছে? [লমফের দিকে তাকিয়ে] সত্যি ও মারা গেছে! হে ভগবান জল, জল! ডাক্তার। [লমফের ঠোঁটের কাছে এক গ্লাস জল ধরে] জল খাও!···না, ও জল খাচ্ছে না ···তাহলে মারাই গেছে, আর-যা-সব-কি-সব···হায়, হায়, আমার কী পোড়া কপাল! আমি আমার মগজের ভিতর দিয়ে গুলি

চালিয়ে দিলুম না কেন ? এর অনেক আগেই আমার গলাটা কেটে ফেললুম না কেন ? আমি কিসের জন্য অপেক্ষা করছি ? আমাকে একখানা ছোরা দাও। বন্দুক দাও। [লমফ একটু নড়লো] মনে হচ্ছে, সেরে উঠছে···একটু জল খাও তো, বাছা ! হ্যাঁ, ঠিক···

লমফ : আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ খেলছে···কুয়াসা না কি··· আমি কোথায় ?

চুবু : তুমি যত শিগগির পারো বিয়ে করে ফেলো আর জাহান্নমে যাও···ও রাজী আছে [দুজনের হাত মিলিয়ে দিয়ে] ও রাজী আছে, আর-যা-সব-কি-সব, আমি তোমাদের আশীর্বাদ—আর-যা-সব—করছি। শুধু আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও !

লমফ : এ্যাঁ ? কি ? [দাঁড়িয়ে ওঠে] কে ?

চুবু : ও রাজী আছে। আবার কি হল ? চুমো খাও···আর জাহান্নমে যাও !

নাতালিয়া : [গোঙরাতে গোঙরাতে] উনি বেঁচে আছেন···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজী···

চুবু : এসো, চুমো খাও, একজন আরেক জনকে।

লমফ : এ্যাঁ, কাকে ? [নাতালিয়াকে চুম্বন] আমার কী আনন্দ ! মাফ করবেন, ব্যাপারটা কি ? ওঃ ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি··· আমার হার্ট···বিদ্যুৎ···আমি কি সুখী, নাতালিয়া স্তেপানভনা··· [নাতালিয়ার হস্ত চুম্বন] আমার পা-টা যে অবশ হয়ে গেল···

নাতালিয়া : আমি···আমিও বড় সুখী···

চুবু : ওঃ ! পিঠের থেকে কী বোঝাটাই না নামলো ! আহ্ !

নাতালিয়া : কিন্তু···যাই বলো, তোমাকে এখন স্বীকার করতেই হবে, ট্রাইয়ার ক্লাইয়ারের মত অত ভালো না।

লমফ : সে ভালো !

নাতালিয়া : সে খারাপ।

চুবু ঃ এই লাও ! পারিবারিক সুখ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ! শ্যাম্পেন নিয়ে আয় !

লমফ ঃ সে সরেস !

নাতালিয়া ঃ ওটা নিরেস, নিরেস, নিরেস !

চুবু ঃ [চিৎকার করে দুজনার গলা চাপবার চেষ্টাতে] শ্যাম্পেন্ ! শ্যাম্পেন নিয়ে আয় !

যবনিকা

শেষ চিন্তা

উল্‌টা-রথ

অবতরণিকা

কত না কসরৎ, কত না তকলীফ বরদাস্ত করে কত চেষ্টা দিলুম, দেশে নাম কেনবার জন্য,—আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল। পরের কথা বাদ দিন, নিতান্ত আত্মজনও আমার লেখা বই পড়ে না। গিন্নীকে—না, সে কথা থাক, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে হয়, ওঁয়াকে চটিয়ে লাভ নেই। অথচ আমার জীবনে মাত্র একটি শখ ছিল, সাহিত্যিক হওয়ার। আপনাদের মনের বেদনা কি বলবো—তবে হ্যাঁ, আপনারাই হয়তো বুঝবেন, কারণ সিনেমায় দেখেছি, নায়িকা যখন 'হা নাথ, হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায় গেলে?' বলে হন্যে-পারা স্ক্রীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটোছুটি লাগান তখন আপনারা হাপুস হুপুস করে অশ্রুবর্ষণ করেন (যে কারণে আমি হলের ভিতরেও রেনকোট্ খুলিনে) তাই আপনারা বুঝবেন।

যখন দেখি প্রখ্যাত সাহিত্যিক উচ্চাসনে বসে আছেন, তাঁর গলায় মালার পর মালা পরানো হচ্ছে, খাপসুরৎ মেয়েরা তাঁর অটোগ্রাফের জন্য হদ্দমুদ্দ হচ্ছে, তাঁর জন্য ঘন ঘন বরফ জল শরবৎ আসছে, সভা শেষে হয়তো আরো অনেক-কিছু আসবে তখন আমার কলিজার ভিতর যেন ইঁদুর কুরকুর করে খেতে থাকে, আমার বুকের উপর যেন কেউ পুকুর খুঁড়তে আরম্ভ করে। সজল নয়নে বাড়ি ফিরি। পাছে গিন্নী অট্টহাস্য করে ওঠেন তাই দোরে খিল দিয়ে বইয়ের আলমারির সামনে এসে দাঁড়াই—তাকিয়ে থাকি আপন মনে আমার, বিশেষ করে আমার নিজের পয়সার মরক্কো লেদারে বাঁধানো সোনার জলে আমার নাম ছাপানো আমার বইয়ের দিকে।

আমার মাত্র একজন বন্ধু—এ সংসারে। কিন্তু আর কিছু বলার

পূর্বে আগে ভাগেই বলে নি ইনিও আমার বই পড়েন নি। তিনি এসে আমায় একদিন শুধোলেন, 'ব্রাদার, 'আমিয়েলের জুর্নাল' পড়েছ ?

'সে আবার কি বস্তু ? বই-ই হবে। না ? তা সে কি আমার বই পড়েছে যে আমি তার বই পড়বো ?'

'আহা চটো কেন ? জল্লাদ যখন কারো গলা কাটে তখন তার মানে কি এই যে, সে-লোকটা আগে জল্লাদের গলা কেটেছিল ? অভিমান ছাড়ো। আমার কথা শোনো। এই আমিয়েল সায়েব প্রফেসর ছিলেন। তার বাড়া আর কিছু না। যশ প্রতিপত্তি তাঁর কিছুই হয় নি। নিঃসঙ্গ জীবনে নির্জনে তিনি লিখলেন তাঁর জুর্নাল।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'জুর্নাল জুর্নাল করছো কেন ? উচ্চারণ হবে 'জার্নেল!' উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি বড্ডই পিটপিটে।

বন্ধু বললেন 'কী উৎপাত ! ওটার উচ্চারণ ফরাসীতে 'জুর্নাল'। এসেছে 'ডায়ার্নাল' থেকে, সেটা এসেছে লাতিন 'দিয়েস' থেকে—যেটা সংস্কৃতে 'দিবস'। ফরাসীতে তাই 'দিন দিন প্রতি দিন' নিয়ে যখন কোনো কথা ওঠে তখন ঐ 'জুর্নাল' শব্দ ব্যবহার হয়। তাই দৈনিক কাগজ 'জুর্নাল', আবার প্রতিদিনের ঘটনা লিখে রাখলে সেটাও 'জুর্নাল' অর্থাৎ 'ডাইরি'। ফার্সীতে 'দিন'কে বলে 'রোজ', তাই প্রতিদিনের ঘটনার 'নাম' যেখানে লেখা থাকে সেটা 'রোজনামচা'। আবার—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম 'হয়েছে, হয়েছে।'

'সেই আমিয়েল লিখলেন তাঁর জুর্নাল। মৃত্যুর পর সে-বই বেরতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বসত শহর জিনীভাতে হয়ে গেলেন লেখক হিসেবে প্রখ্যাত। বছর কয়েকের ভিতর তামাম ইয়োরোপে। ইস্তেক তোমাদের রবি ঠাকুর সে বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাই বলি কি না, তুমি একখানা জুর্নাল লেখ।'

আমি শুধালুম, 'তুমি পড়বে !'

বন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। ছাতা খানা বগলে চেপে বললেন, 'চললুম, ভাই। শুনলুম পাড়ার লাইব্রেরিতে পাঁচকড়ি দের কয়েকখানা অপ্রকাশিত উপন্যাস এসেছে। পড়তে হবে।'

ভালোই করলেন। না হলে হাতাহাতি হয়ে যেত।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, তার সেই মোস্ট ইনসেন সাজেশনের পর থেকে এই জুর্নালের চিন্তাটা কিছুতেই আমি আমার মগজ থেকে তাড়াতে পারছিনে। যে রকম অনেক সময় অতিশয় রদ্দি একটা গানের সুর মানুষকে দিবারাত্তির হন্ট করে। এমন কি ঘুম থেকে উঠে মনে হয়, ঘুমুতে ঘুমুতেও ঐ সুর গুণ গুণ করেছি।

কিন্তু জুর্নাল লিখতে যাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত অসুবিধে রয়েছে—আমার।

সংস্কৃতে শ্লোক আছে :—

শীতেঽতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভং কুবলয়দৃশং যৌবনান্তে বিবাহম্।
শীতকাল গেলে শীত-বস্ত্র পরিধান
আহার গ্রহণ যবে দিন অবসান
রাত্রিকাল শেষ হলে প্রেম আলিঙ্গন !
বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন !

(কবিভূষণ পূর্ণচন্দ্র)

একশ' বছর বয়সে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অন্তর্জলি অবস্থায় সাততলা এমারৎ বানাবার জন্য কেউ টেণ্ডার ডাকে না।

জুর্নাল লেখা আরম্ভ করতে হয় যৌবনে। তাহলে বহু বৎসর ধরে সেটা লেখা যায়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে পর পাঠক তার থেকে লেখকের জীবনক্রমবিকাশ তার সুখ-দুঃখ, আশানিরাশার দ্বন্দ্ব পড়ে পরিতৃপ্ত হয়।

আজ যদি আমি জুর্নাল লিখতে আরম্ভ করি তবে আর লিখতে পাবো কটা দিন ? তাই কবি বলেছেন, এ যেন যৌবনান্তে বিবাহম্!

তাহলে উপায় কি ?

তখন হঠাৎ একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

এক বেকার গেছে সায়েব বাড়িতে। কাচুমাচু হয়ে নিবেদন করলে, 'সায়েব, আপনার এখানে যে কি ভয়ে ভয়ে এসেছি, কী আর বলবো। এক পা এগিয়েছি কী তিন পা পেছিয়েছি,।' সায়েব বললে, 'ইউ গাগা, তাহলে এখানে পৌঁছলে কি করে ?' বেকারটি আদৌ গাগা—অর্থাৎ যে বদ্ধ পাগল শুধু 'গাগা' করে গোঙরায়—ছিল না। বরঞ্চ বলবো হাজির-জবাব—অর্থাৎ সব জবাবই তার ঠোঁটে হাজির। বললে, 'হক কথা কয়েছেন, হুজুর। আমিও তাই মুখ করলুম আপন বাড়ির দিকে। এক পা এগুই তিন পা পেছোই। করে করে এই হেথা হুজুরের বাঙলোয় এসে পৌঁছে গেলুম।'

তাই যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, জুর্নাল লেখবার মত দীর্ঘ দিনের ম্যাদ যমরাজ আমায় দেবেন না তখন ঐ কেরানীর মত পিছন ফিরলে কি রকম হয় ? অর্থাৎ বিগত দিনের জুর্নাল ? সে-ই বা কি করে হয় ? পোস্ট ডেটেড চেক্ হয়, কিন্তু প্রা-ডেটেড দলিল করার নামই তো জাল। আজ আমি তো আর লিখতে পারিনে :—

> জন্মাষ্টমী, ১৩১১
> আজ আমার জন্ম হল। মা তখন তাঁর বাপের বাড়িতে। হায়, আমাকে দেখবার কেউ ছিল না। কী হতভাগ্য আমি।

পুলিশে ধরবে না তো !

বিবেচনা করি আপনারা ক্ল্যাসিক্স পড়েছেন—ঋগ্‌বেদ, মেঘনাদ, হ য ব র ল ইত্যাদি। শেষোক্ত খানাতে একবুড়ো ত্রিশ না চল্লিশ হতে না হতেই বয়েসটা ঘুরিয়ে দিতো। তখন তার বয়েস যেত 'কমতির'—ফটকা বাজারে যাকে বলে 'মন্দি' বা 'বেয়ার'—দিকে। তখন তার বয়েস হত ত্রিশ, উনত্রিশ, আটাশ করে করে আট হয়ে গেলে ফের 'বাড়তি' বা 'তেজী'র দিকে চালিয়ে দিয়ে নয়, দশ, এগারো করে বয়েস বাড়াত।

কিন্তু এ কৌশল রপ্ত করার জন্য মুষ্টিযোগটা শিখি কার কাছ থেকে? হ য ব র ল স্বষ্টিকর্তা ওপারে যাবার সময় তাঁর ব্যাটা বাবাজী সত্যজিৎকে কি এটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? তাতেই বা কি? বাবাজী তো তারো আগে ওঁরই কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন 'গেছোদাদা' হওয়ার পন্থাটি—আমি যদি তাঁর সন্ধানে যাই মতিহারি তখন তিনি ছিকেষ্টপুর। আমি ফিলাডেলফিয়ায় তো তিনি ভেরমণ্টে। উঁহু হল না।

ইরানের কবি অন্য মুষ্টিযোগ বাৎলেছেন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সে:

'আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই
জোয়ান হইব; এ জীবন তবে গোড়া হতে দোহরাই॥'
'শবী আগর আজ লবে ইয়ার বোসে এ তলবম
জওয়ান শওম জসেরো জিন্দেগী দু বারা কুনম্॥'

পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল ছুঁড়বে।

আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ তাহলে কি বলেন?—

'শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব একটানে;
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।'

তারপর তিনি করবেন?

'জমিয়ে ধূলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরী হবে আমার খেলা—'

সর্বনাশ! এই বৃদ্ধ বয়সে যদি সকলের সামনে তাই করি তবে ডাঃ ঘোষ আমাকে রাঁচী পৌঁছিয়ে দেবেন।

মোদ্দা কথায় তা হলে ফিরে যাই। আমাকে খামাখা মেলা বকর বকর করাবেন না। অবশ্য আমার মা বলতো, আমার দোষ

নেই। আমাকে টিকা দেবার সময় ডাক্তার ছুরি আনেনি বলে একটা গ্রামফোনের নীড্‌ল্‌ দিয়ে টিকা দিয়েছিল।

তাহলে একটা মাস চিন্তা করতে দিন। সামনে হোলি। গায়ে রঙ মাখাবো। মনেও।

স্লিস্টলার অর্থ নিম-উকীল। উকীলের কাছে যাবার পূর্বে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। সেটি হয় তো পূর্বেও কোনো-কোথাও উল্লেখ করেছি। তাই সেটি আবার বলছি। কারণ মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যা সে পূর্বেও একাধিকবার শুনেছে—নয়া কথা তার ভালো লাগে না। তাই দেখুন—এটাও আমি আরেকবার বলেছি—একই প্লট নিয়ে ক' গণ্ডা ফিলিম নিত্যি নিত্যি বেরুচ্ছে তার হিসেব রাখেন ?

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই :—

নরক আর স্বর্গের মধ্যিখানে মাত্র একটি পাঁচিলের ব্যবধান। নরক চালায় শয়তান, আর স্বর্গ চালান সিণ্ট পীটার। পাদ্রীসায়েবের মুখে শোনা, তাঁরই হাতে থাকে স্বর্গদ্বারের সোনার চাবি।

পাঁচিলটি ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে দেখে পীটার একদিন শয়তানকে ডেকে বললেন, 'দেয়ালটা এজমালি। তাই এটার মেরামতী আমি করবো এক বছর, তুমি করবে আর বছর। আসলে তোমারই করা উচিত প্রতি বছর। কারণ তোমার দিকে সুবো-শাম জ্বলছে আগুনের পেল্লাই পেল্লাই চুলো। তারই চোটে দেয়াল হচ্ছে জখম। আর আমার দিকে সর্বক্ষণ বয় মন্দ মধুর মলয় বাতাস। দেয়াল বিলকুল-জখম হয় না।

বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, ইনি এ বছর আর উনি আর বছর দেয়াল মেরামত করবেন। শেষটায় বিদায় নেবার সময় শয়তান ঘাড় চুলকে বললে, 'দাদা, কিছু যদি মনে না করো, তবে এ বছরটায় তুমিই মেরামতীটা করাও। আমি একটু অভাবে আছি।'

পীটার মাই ডিয়ার লোক। রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর এক বছর যায়, দু'বছর যায়, পাঁচ বছর যায়, দেয়াল পড়ো পড়ো—শয়তানের সন্ধান নেই। পীটার রেজেস্ট্রি করে চিঠি লিখলেন। ফেরং এল। উপরে লেখা, 'মালিক না পাইয়া ফেরৎ।' পীটার তখন একাধিকবার শয়তানের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠ বেরলো—'কত্তা বাড়ি নেই।' পীটার বাড়ির সামনে 'লটকাইয়া লটকাইয়া শমন জারী' করলেন। কোনো ফায়দা ওৎরালো না।

এমন সময় পীটারের বরাৎ জোরে হঠাৎ শয়তানের সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাৎ। শয়তান অবশ্য তড়ি ঘড়ি পাশের গলিতে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এঞ্জেলদের ডানা থাকে। ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে পার্ফেক্ট ল্যাণ্ডিং করে দাঁড়ালেন তার সামনে। খপ্ করে হাত ধরে বললেন, 'বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? দেয়াল মেরামতীর কী হবে?'

শয়তান গাঁইগুঁই টালবাহনা আরম্ভ করলে। পীটার চেপে ধরলেন, 'পাকা কথা দিয়ে যাও।'

তখন শয়তান শেষ কথা বললে, 'কিছু মনে কোরো না ভাই, কিন্তু আমি আমার উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো পাকা কথা দিতে পারবো না।'

নিরাশ হয়ে পীটার শয়তানের হাত ছেড়ে দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাড়ি ফেরার মুখ করে বললেন, 'ঐখানেই তো তোর জোর। সব কটা নিয়ে বসে আছিস। আমার যে একটাও নেই।'

আমার উকিল অবশ্য নরকে যাবেন না। তিনি বলেন, 'নরক নেই, স্বর্গ আছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! লোকে হয় দুটোতেই বিশ্বাস করে, নয় একটাতেও না।'

উকিল বললেন, 'ঐখানেই তো ভুল। তোমরা দর্শনের কিছুই

জানো না। বুঝিয়ে বলছি। স্বর্গ জিনিসটের কল্পনা আমি করতে পারি। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। তোমাদের পরশুরামই তো বলেছেন, ঝোপে-ঝাপে চপ কাটলেট ঝুলছে। পাড়ো আর খাও, খাও আর পাড়ো। হুরী পরীদের সঙ্গে হু'দণ্ড রসালাপ করো, কেউ কিছু বলবে না। অতএব স্বর্গ আছে। কিন্তু এই পৃথিবীর চেয়ে বেদনাময় জায়গা আমি কল্পনাই করতে পারিনে। অতএব সেটা নেই। যে জিনিস আমি কল্পনা করতে পারিনে সেটা থাকবে কি করে?'

যুক্তিটা আমার কাছে কেমন যেন ঘোলাটে মনে হল। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে গিয়ে মুনিঋষিরা যে-সব যুক্তি দেন তার চেয়ে অবশ্য বেশী ঘোলাটে নয়। কিন্তু সে-কথা থাক। ওটা নিয়ে আমার শিরঃপীড়া নয়। কথায় বলে, বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—আমার উকিলটি নরকে না গেলেও শয়তান তার বাঁ হাতের তেলোতে জল রেখে তাতে ডুবে আত্মহত্যা করবে না। বরঞ্চ, একটা উকিলকে যদি কোনোগতিকে স্বর্গরাজ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলেই তো চিত্তির। ক্লাইভ তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না। এক ক্লাইভে যা করলে, তার ধকল আমরা এখনো কাটাচ্ছি। দ্যাখতো না দ্যাখ, সেণ্ট পীটারের পেটের ভাত চাল হয়ে যাবে, তন্দুরী মুর্গী ডেনা গজিয়ে পেটের ভিতর ফুরুৎ ফুরুৎ করতে থাকবে।

আমার শিরঃপীড়া ঃ—আমি যদি প্রি-ডেটেড্ চেক সই করি, অর্থাৎ শুঁটকিকে তাজা মাছ বলে পাচার করি, অর্থাৎ প্রাচীন দিনের ডায়ারি নবীন বলে চালাই তবে কি আমি ভেজালের ভিটকিলিমিতে ধরা পড়বো না?

উকিল পরম পরিতোষ সহকারে বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই। তবে যা লিখবে তার ন' আনার বেশী যেন সত্য কথা না হয়। মিথ্যে লিখতে হবে নিদেন সাত আনা। নূতন আইন।'

আমার মিথ্যে বলতে কণামাত্র আপত্তি নেই। লেখক মাত্রই

মিথ্যেবাদী। এবং মিথ্যেবাদীকেও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, 'যে-লোক দুর্ভাগ্যক্রমে লেখক হওয়ার সুযোগ পেল না,'—হতাশ-প্রেমিকের মত হতাশ-লেখক। তবু অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা ?'

উকিল বললে, 'ক্যারেট্ কারে কয় জানো ? ২৪ ক্যারেটে খাঁটি সোনা হয়। এখন আইন হয়েছে, চোদ্দ ক্যারেটের বেশী সোনা দিয়ে গয়না গড়ানো চলবে না। বাকি দশ ক্যারেটের বদলে দিতে হবে খাদ।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি স্যাকরা যে আমাকে এ-আইন শোনাচ্ছেন !'

উকিল আমার দিকে অনেকক্ষণ-ধরে তাকালে। যেন আমি 'ফিয়ারলেস নাদিয়া' বা কাননবালার চেয়েও খাপসুরৎ। নিজের চেহারার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল।

বললেন—এবারে অতিশয় শান্তকণ্ঠে—'সোনা ভারতবাসীর চোখের মণি, জিগরের টুকরো, কলিজার খুন। তাই দিয়ে যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন সর্বত্রই এটা ছড়াবে। যাও, আর মেলা বকর বকর করো না। আর শোনো, তোমার মাথায় যা মগজ তা দিয়ে পুঁটি মাছেরও একটা টোপ হবে না। তুমি নির্ভয়ে লেখো। কেউ পড়বে না তুমিও পড়বে না—অর্থাৎ ধরা পড়বে না।'

আঁতে ফের লাগল। তবে খুব বেশী না। আমার আঁতে গণ্ডারের চামড়ার লাইনিং।

তা সে যাক্‌গে। আইন বাঁচিয়ে লিখব।

* * * *

আমার শত্রু চতুর্দিকে। বরঞ্চ আমাকে 'অজাতশত্রু' না বলে 'অজাতমিত্র' বলা যেতে পারে। তারা যে আমার কী বদনাম করে বেড়াচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। না, ভুল বললুম। পাড়ার ছোঁড়াদের কাছে আছে। 'তৃষ্ণান্ত ছাত্রদের বিয়ারদান সমিতিতে' চাঁদা দি নি

বলে তারা সেগুলো জিগির বা স্লোগান রূপে ব্যবহার করে। মহরমের 'হায় হাসন, হায় হোসেন' রোদন রব এর তুলনায় অট্টহাস্য।

তারই একটা—আমি নাকি অতিশয় সুপুরুষ। আপনারা অবশ্য এ-কথা শুনে সরল চিত্তে শুধোবেন, 'এটা আবার কুৎসা হ'ল কি প্রকারে?'

ঐ তো! ছোঁড়াদের পেটে কী এলেম তা তো আপনারা জানেন না। সূক্ষ্ম তালেবরদের দুষ্টবুদ্ধি। বেদে নাকি আছে, 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—তার এক অর্থ নাকি, 'দেবতা শুভ বুদ্ধি দ্বারা আমাদের সংযুক্ত করুন—এক করুন।' অশুভ বুদ্ধি যে আরো কত বেশী সংযুক্ত করে, ঋষি সেটা জানতেন না। কারণ আমাদের বড়শে ব্যালার বুদ্দু খানসামা লেনের ছোঁড়াদের ঐক্য তিনি দেখেন নি।

তাহলে আরো বুঝিয়ে বলি। রবীন্দ্রনাথের লেখাতে আছে, এক হাড়কিপ্টেকে শিক্ষা দেবার জন্য পাড়ার ছোঁড়ারা কাগজে মিথ্যে মিথ্যে ছাপিয়ে দেয়, তিনি নাকি অমুক চ্যারিটি ফাণ্ডে বিস্তর টাকা খয়রাৎ করেছেন। আর যাবে কোথা? চ্যারিটি না করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে চ্যারিটি ম্যাচের ভিড়।

হুবহু ঐ একই মৎলব।

তখন স্থির করলুম, একটা ফটো তুলে এই 'উল্টো-রথের' সঙ্গে ছাপিয়ে দেব। শুনলুম, কালীঘাটের কাছে 'ফোটো ফ্ল্যাশের' নাকি বার্সটিং বিজিনেস—ফেটে পড়ার উপক্রম। গিয়ে দেখলুম, কথাটা খাঁটি, ছাব্বিশ ক্যারেট খাঁটি। আমার ছবি তুলতে গিয়ে তাদের তিনখানা লেন্‌স্ বার্স্‌ট্ করলো। আমার শ্যাটারিঙ সৌন্দর্য সইতে না পেরে।

সেই যে নব্বুই বছরের থুরথুরে ফরাসী বুড়ির কাছে বাজ পড়াতে তিনি ভিরমি যান। হুঁশে ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'বাজের কি দোষ? আমি যে বড্ড বেশী এ্যাট্রাক্‌টিভ্।'

ফোটো হল না। অইল পেন্টিং-ওলা বললে, 'কালো হলেও চলতো, তা সে যত মিশই হোক্ না। কিন্তু এ যে, বাবা, খাজা রঙ। কালো কালির উপর পিলা মসনে। তার উপর কলাইয়ের ডালের পিছলে-পারা, না-সবুজ, না-নীল, না-কিচ্ছু। আমার প্যালেট লাটে।'

সেই থেকে ভাবছি কি করি?

তা হলে আবার একটা মাস ভাবতে দিন।

কিন্তু তাতেই বা কি? দশ ঘণ্টা বাতি জ্বালিয়ে রাখার পর সেটা নিভিয়ে দিলে ঘরে যে অন্ধকার, এক মিনিট জ্বালিয়ে রাখার পর নিভিয়ে দিলেও সেই অন্ধকার।

এক মাস চিন্তা করলেই বা কি, আর এক মিনিট চিন্তা করলেই বা কি?

সুখী হবার পন্থা

সুখী হবার পন্থা? সর্বনাশ! সে পন্থাটা এ অধমের যদি জানাই থাকতো তবে—যাক্‌গে। ইতিমধ্যে একটা গল্প মনে পড়লো। এক ছোকরার বিয়ে করার বড় শখ। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না। ওদের পরিবারে একমাত্র শ্রীহনুমানের পূজো হয়—অন্য কোনো দেবতা সেখানে কল্কে পান না—তাই ত্রিসন্ধ্যা তাঁরই পূজো করে আর কাকুতি-মিনতি করে, 'হে ঠাকুর আমার একটি বউ জুটিয়ে দাও।' ওদিকে এরকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে হনুমানের পিত্তি চটে গিয়েছে। শেষটায় একদিন স্বপ্নে দর্শন দিয়ে হুঙ্কার দিলেন, 'ওরে বুদ্ধু, বউ যদি জোটাতে পারতুম, তবে আমি নিজে বিয়ে না করে Confirmed bachelor হয়ে রইলুম কেন?'

তাই বলছিলুম, সুখী হবার পন্থাটা যদি আমার জানাই থাকতো তবে আমি এই টক্ দিতে যাব কেন? স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আমি যে টক্ দিচ্ছি সেটা হয় আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য, নয় অর্থাগমের জন্য, কিংবা উভয়তঃ। আপনাদের আনন্দ দেবার ইচ্ছাটা তৃষ্ণা বিশেষ এবং বুদ্ধদেব সেটাকে তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা বলেছেন, এবং এই তন্‌হা থেকেই সর্ব দুঃখের উৎপত্তি। এই তন্‌হাজনিত দুঃখ নিবারণই সুখ। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'ভারাদ্যপগমে সুখী সংবৃত্তোঽহমিতিবৎ, দুঃখাভাবেন সুখিত্বপ্রত্যয়াৎ।' বাঙলা কথায়, আমার ঘাড়ে বোঝা ছিল, সেটা নেবে যেতেই বললুম, আহা কি আরাম, এসো ক্ষুদিরাম: তাহা কী সুখ ঘুচে গেছে দুখ। অর্থাৎ দুঃখের অভাবই সুখ বলে প্রতীয়মান হয়। তাই পরদুঃখকাতর ফরাসী গুণী ভলতের এক অন্ধ মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লেখেন, Nous avons un grand sujet a traiter : it sagit de

bonheur on du moins d'etre le moins malheureux qu'on peut dans ce monde ;

আমাদের আলোচনার বস্তু বিপুলাকার এবং মহত্বপূর্ণ : প্রশ্ন এই, 'সুখী হওয়া যায় কিসে, কিংবা অন্ততপক্ষে এ সংসারে অল্পতর দুঃখী হওয়া যায় কি প্রকারে ?'

এটাকে আরো সোজা করে বলি। এক ক্ষ্যাপা ক্রমাগত মাথায় হাতুড়ি ঠুকছে। আমি শুধালুম, 'ওরে পাগল মাথায় হাতুড়ি ঠুকছিস কেন ?' এক গাল হেসে বললে 'যখন ঠুকি না তখন কী আরাম।' সেই সংস্কৃত প্রবচনেই ফিরে এলুম, 'ঘাড়ের বোঝা নেবে যাওয়াতে কী আরাম।' মহাকবি হাইনেকে আমি বড্ডই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এস্থলে তিনি যেটা বলেছেন সেটা আমাদের পাগলার হাতুড়ি পেটার চেয়ে অনেক ফিকে। তিনি বলেছেন, 'কড়া ঠাণ্ডার রাত দুপুরে লেপের তলা থেকে পা বের করাতে বেজায় শীত লাগলো। ফের পা দু'খানা ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, আঃ কী সুখ !'

কিন্তু এরকম নেতিবাচক সুখ—অর্থাৎ দুঃখের অভাবে সুখ—এটাতে সবাই সন্তুষ্ট নন্। তাই অনেকেই সুখ বলতে কি বোঝেন সেটা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন। সর্বপ্রথমই অবশ্য মনে পড়ে ওমর খৈয়াম। কান্তি ঘোষ অনুবাদ করেছেন,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে
গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু অনুবাদটা আক্ষরিক নয়। বরঞ্চ সত্যেন দত্তের

সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ, আমার
তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

ফিট্জিরাল্ডেও তাই আছে

Beside me singing in the wilderness
And wildnerness is paradise enow!

কান্তিবাবুর 'বিজন ছায়া' নয়, উল্টে বলা হয়েছে, মরুপ্রান্তরেও তুমি, সাধ্বী, যদি থাকো তবে সেই স্বর্গ।

এইবারে মূল ফার্সীটা শুনুন :

গর দস্ত্ দহদ্ মগজ-ই গন্দুমে নানী—
ওয়াজ ময় দোমনী জ গোসফন্দি রানী—
ওয়া আনগেহ মন্ ওয়া তো নিশস্তে দর ওয়রাণী
এ্যায়শী বূদ আন না হদ্দ্-ই-হর্ সুলতানী—

ফার্সী ফিরিস্তিতে খৈয়াম চেয়েছেন, 'ভালো গমের উত্তম রুটি ; দুই মণ মদ ধরে এরকম একটি পাত্রভরা মদ্য—হ্যাঁ বিশ্বাস করুন, ফার্সীতেই আছে 'দো মণী' এবং যেটা ফিটজিরাল্ড নিতান্ত গদ্যময় ভেবে অনুবাদ করেন নি—আছে, একখানা আস্ত দুম্বার ঠ্যাং। এবং সর্বশেষে বলেছেন, তখন যা সুখ, সেটা কদাচ কখনো কোনো সুলতানের ভাগ্যে জোটে কি না সন্দেহ।'

এগুলো আমাদের অজানা নয়। কারণ আমাদেরই মহর্ষি চার্বাক সুখী হওয়ার নির্ঘণ্ট আরো সস্তায় সেরেছেন ; তিনি বলেছেন,

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!

অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও। ফেরৎ তো দিতে হবে না, কারণ এ দেহ

ভস্মীভূত হবে, পুনর্জন্ম তাই হতে পারে না, পুনরাগমনং কুতঃ ? এখানে কিন্তু খৈয়ামের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। খৈয়াম বার বার বলেছেন, পরের মনে কষ্ট দিয়ে সুখী হওয়া যায় না।

কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন—যদিও আমি আদপেই চিন্তাশীল নই এবং আমি খৈয়ামের ফিরিস্তিতেই সুখা—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, এ আবার কি সুখ ? লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, 'আমি যে-সে সুখ চাইনে।'

সামান্য একটি মেয়েছেলে। বহু যুগ পূর্বে তাঁর স্বামী যখন তাঁকে বিস্তর ধনদৌলত দিয়ে বনে যেতে চাইলেন তখন তিনি তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।' যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, পাব না, সে দিয়ে আমার কি হবে ?

দেখুন দিকি, মেয়েছেলের কী বায়নাক্কা ! সুখ পেয়েও সুখী হতে চায় না—অথচ দেখুন চীনারা কী সুবুদ্ধিমান। লিন য়ুটাঙ বলছেন, 'রাত্রের অন্ধকারে ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে আছি। চতুর্দিকে আমার মহামূল্যবান প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ শুনি একটা ইঁদুর কুটকুট্ করে সেগুলো কাটছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় শুনি, আমার বেড়ালটা হুঙ্কার দিয়ে ম্যাও করে উঠেছে—আহ্—কী সুখ।'

কিন্তু না,—ভারতবর্ষ অমৃত চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ। আনন্দটা তবে কি ? অমৃত। চণ্ডীদাসও বলেছেন, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।' এবং সুখের পরও শ্রীরাধা চেয়েছিলেন অমৃত, অমিয়া, তাই, 'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

অমৃতের অত্যুত্তম বর্ণনা পেয়েছি আমি একটি শ্লোকে।

কেচিদ্ বদন্তি অমৃতস্তি সুরালয়েষু,
কেচিদ্ বদন্তি বণিতাধর পল্লবেষু,

ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা,
জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডে ॥

আহা হা! 'কেউ কেউ বলেন অমৃত আছে সুরালয়ে—মদের দোকানে। কেউ কেউ বা বলেন, না, অমৃত বণিতার অধর পল্লবে। আর আমরা—আসলে 'আমি' এখানে সম্মানার্থে বহুবচন আমরা, কারণ আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি—সকল শাস্ত্র বিচারদক্ষা—আমরা বলি জম্বীরনীর পূরিত—অর্থাৎ নেবু, জম্বীর, জামীর—সিলেটিতে—নেবু—নেবুর রসে পূরিত—ভর্তি—মৎস্যখণ্ডে! সোজা বাংলায় মাছের উপর কষে ঠেসে নেবুর রস—সেই অমৃত।

এ কবি শুধু কবি নন্—মহর্ষি, দিব্যদ্রষ্টা—কী করে সেই যুগেই জানলেন, বাঙলাদেশে এমন দিন আসবে যেদিন শুধু লক্ষপতিরাই শ্বশুরবাড়ি এলে মাছ কিনবেন। আর ইতরজনা—আমরা মাছের কাঁটাটি পর্যন্ত পাবো না, সধবার একাদশী ভাঙবার জন্যে!

আরেকটি কথা। কালিদাস ভবভূতি পড়ে আমেজ করতে পারিনে, এঁরা কোন প্রদেশের লোক। কিন্তু যে গুণী জম্বীরনীরপূরিত মৎস্যখণ্ডকে অমৃত বলে সে নিশ্চয়ই বাঙালী। মাছের তত্ত্ব কি বিহারী, মারওয়াড়ী, গুজরাতি ব্রাদাররা জানেন?

সুখ বলুন, আনন্দ বলুন, অমৃত বলুন সেটা পাবো কোথায়? একটি মাত্র পথ নির্দেশ করি।

মহাকবি গ্যোটে বলেছেন,

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো?
সুখ তো আছে হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে,
সুখ সে তো রয় সদা কাছে কাছে!

Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.

Lerne nur das Gluck ergreifen,
Denn das Gluck ist immer da !

আর আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী লালন ফকীর বলেছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর !

বিষের বিষ

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোর বেলা থেকে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে, 'ডাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশ বার শুনতে হয় না। আর গয়নাগাটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিন-মজুর ; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরুমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার!

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ও'য়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নাই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে

সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত ? কেউ কি আর সাহস করে আসত ? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসে নি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকাল বেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে ?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে।'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা গতর পানি করে গর্তটা তৈরী করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তোর চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউতো বটে। তাকে

ওরকম মেরে ফেলাটা— ? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয় নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে ? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশ্‌মন্‌টাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্‌গে, ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য্য ! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহম্মদ দেখে—বাপরে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর-গোখরো সাপ ! সে তখনো চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে 'তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে এত ভয় কিসের ?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধ্যত্তর তোর প্রাণ ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে ! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মদ্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরবার কোনো পথ খুজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল চ্যাচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন ওঝা? ওসব পাগলামি রাখ। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা, নয় সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ে গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এন্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম ?
সাপের দ্বারা ভালো কাম ?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেষছে না, রলছে উনি মা মনসার বাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বিদ্যি হদ্দ হল এখন ফার্সী পড়ে আগা! কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরী—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইরার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্‌টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ীর দিকে,

হাতের কাছে ওঝা,
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি লোভ ভালো না,—সাপ সরাতে একবারের বেশী না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়!'

আগাকে জোর করে পাল্কীতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশী আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচ শ ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে।

মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্পায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী, রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখম দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহরদারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়ালনন্দিনী অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুণতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম, তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো,—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপরে, মারে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানা সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাঈ-তে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার 'মরাল' কি, বলো তো।'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমনী যে কি রকম খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল' থাকে। এই যে-রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার 'মরাল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য 'মরাল'টা গভীর ঃ—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না।

কারণ খল তার পরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে তবে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ ?'

রাজহংসের মরণগীতি

॥ ১ ॥

জর্মানির চরম শত্রু ফ্রান্সের একাধিক লেখক সবিস্ময়ে স্বীকার করেছেন যে, এমন দিন আসবে, যেদিন রণবিদ্যার চর্চাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই যে রকম ফ্রিডরিক দি গ্রেট ও নেপোলিয়নের রণকলা অক্ষরে অক্ষরে অধ্যয়ন করে থাকেন, ঠিক তেমনি হিটলারের রণকলাও অধ্যয়ন করবেন।

আমরা রণচর্চা করি না; তৎসত্ত্বেও আমাদের মনেও এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন, যে হিটলার দু বৎসরের ভিতর ইংলিশ চ্যানেল থেকে প্রায় মস্কো অবধি রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি যখন তিন বৎসরের ভিতর তাঁর মাটির তলার আশ্রয় ('বুংকার') থেকে খবর পেলেন যে, বিজয়ী রুশ-সেনা সে আশ্রয় থেকে মাত্র পাঁচশ গজ দূরে, আর চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরই, রক্তলোলুপ কেশরীর মত তাঁর বুংকারে এসে প্রবেশ করবে, তখন তাঁর মনে কি চিন্তার উদয় হয়েছিল? সঞ্জয় যখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিলেন যে, দুর্যোধনের পরাজয় ঘটেছে, তখন তাঁর ব্যালাডের (আমার বিশ্বাস, চারণদের মুখে গীত এই ব্যালাডকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে বিরাট মহাভারত রচিত হয়) ধুয়ো ছিল, 'যখন অমুকটা ঘটল, তখন আমরা জয়াশা করিনি, যখন তমুকটা ঘটল, তখন আমরা জয়াশা করিনি',—এবং মূল ধুয়ো ছিল, 'তখন আমরা জয়াশা করিনি, তখন আমরা জয়াশা করিনি।' হিটলারের বেলাও কি তাই ঘটেছিল? —কারণ তাঁর পরাজয়ও তো এক দিনে হয়নি—তিনি কি দিনে দিনে বুঝতে পেরেছিলেন, 'এখন আর জয়াশা নেই', 'এখন আর জয়াশা নেই', না, তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দূরাশা পোষণ ক'রে কোন

অলৌকিক পরিবর্তনের আশা করেছিলেন?—দুর্যোধন যেরকম উরু-ভঙ্গের পরও অশ্বত্থামাকে জয়াশা করে পঞ্চপাণ্ডবের গোপন নিধনের জন্য পাঠিয়েছিলেন?

আরো ছোটখাট কত প্রশ্নেরই না মনে উদয় হয়।

যেমন মনে করুন, হিটলার যখন পোল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স, ওদিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিরাম জয় করে ফেলেছেন, বাঙলা কথায় একমাত্র রুশ ছাড়া এমন কোনো শক্তি ইউরোপে আর নেই যে তার মোকাবেলা করতে পারে এবং পরাজিত ইংলণ্ড আপন দ্বীপে ফিরে গিয়ে এমনি ক্লান্ত যে, জখমগুলো পর্যন্ত চাটতে পারছে না, তখন হিটলার ইংলণ্ড অভিযানে বেরলেন না কেন? স্বয়ং চার্চিল স্বীকার করেছেন, তখন হিটলার সে অভিযান করলে ইংলণ্ড অনায়াসে জয় করতে পারতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন বহু ঐতিহাসিক, বহু জঙ্গীলাট, বহু কূটনীতিবিদ্, এমন কি, হিটলারেরই বহু সাঙ্গোপাঙ্গ। তাঁর সেনাপতিরা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে হাজার হাজার না হোক, শত শত পুস্তক লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে তবু কৌতূহল জাগে, স্বয়ং হিটলার কি ভেবেছিলেন? অবশ্য তাঁর উত্তরই যে শুদ্ধ হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমাদের বন্ধুবান্ধব যখন পরীক্ষায় ফেল করবার পর দফে দফে ফেল মারার কারণ দর্শায়, তখন আমাদেরই দু'একজনা তার অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রকৃত কারণ দর্শিয়ে দেয়, তখন আমরা অনেক স্থলেই ওদেরই বিশ্বাস করি বেশী—সর্বস্থলে না হোক, অনেক স্থলেই 'স্পেকটেটর সীজ মোর অব দি গেম।'

তবু মনে বড়ই কৌতূহল হয়, নেপোলিয়ন কি ভেবেছিলেন, হিটলার কি ভেবেছিলেন?

অধুনা তারই খানিকটে উত্তর মিলেছে।

১৯৪১-৪২-এর শীতে হিটলার গৌরবের মধ্য গগনে। ফ্রান্স

পদানত—তিনি মস্কো লেনিনগ্রাদের দরজায় সদম্ভে ধাক্কা দিচ্ছেন। আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হিটলার তখন লাঞ্চ ডিনার খাওয়ার পর সমবেত ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন—জর্মন মনের উপর বহিরাগত খৃষ্টধর্মের প্রভাব, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেহরু না সুভাষ, বর্ণসঙ্করের কুফল, কুকুর মনিবের খাটের নিচে শোবে না অন্য কোথাও,—বস্তুত আকাশ-পাতালে হেন বস্তু নেই, যা নিয়ে তিনি তখন আলোচনা করেননি। 'আলোচনা' বলে ভুল করলুম—আসলে ইয়ার-দোস্ত দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে না করতেই হিটলারের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতো। এ যেন নব গীতা—শুধু আমাদের গীতাতে প্রশ্ন করেন একা অর্জুন, এখানে অর্জুন একাধিক।

হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান তখন হিটলারের অনুমতি নিয়ে ঘরের এক কোণে স্টেনো রাখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর টাইপ-করা কাগজের উপর তখন বরমান তাঁর মন্তব্য ও মেরামতি করে দিলে পর শেষ সরকারী কপি তৈরি হত।

হিটলার যুদ্ধে জয়ী হলে পর এগুলো কি ভাবে প্রকাশিত হত, আদৌ প্রকাশিত হত কি না, সেকথা বলা কঠিন। যুদ্ধের পর যখন চতুর্দিকে লুঠতরাজ, তখন এ-হাত সে-হাত ঘুরে শেষটায় সে পাণ্ডুলিপি প্রথম জর্মনে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদে—'হিটলারজ টেবিল-টক্' নামে প্রকাশিত হয়। প্রায় সাত শ পাতার বই।

হিটলার 'মাইন কাম্ফ' কিংবা বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন বিশ্বজনের সম্মুখে সরকারিভাবে, কিন্তু এই টেবিল-টক্ ঘরোয়া। এতে হিটলার-মনের অন্য একটা দিক দেখতে পাওয়া যায়।

হিটলারের অনুচরবর্গ বলেন, যখন পরাজয় আরম্ভ হল, তখন হিটলার যে-কোনো কারণেই হোক তাঁর জেনারেল, কর্নেল, ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে খানা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খেতে লাগলেন, নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্তা তাঁর পাচিকা এবং তাঁর মহিলা টাইপিস্টদের সঙ্গে।

তাই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত 'টেবিল-টক' প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই হিটলারের কাছে না হোক তাঁর শত্রু-মিত্র বহুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আর জয়াশা নেই। তাঁর সেক্রেটারি বরমান অন্তত সে-সম্ভাবনাটার আতঙ্ক ভালো ভাবেই অনুভব করেছিলেন। খুব সম্ভব, তাঁরই অনুরোধে হিটলার ফের 'টেবিল-টক্' দিলেন। কিন্তু এগুলোকে আর 'টক' বলা চলে না। তাঁর শেষ বাণী, তাঁর শেষ 'টেস্টামেণ্টে' বললেই ভালো বলা হয়।

এগুলোও এ-হাত সে-হাত ঘুরে ঘুরে প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্রান্সে ১৯৫৯-এ; ইংরিজিতে ১৯৬১-তে। এ-দেশে এসে পৌঁচেছে দিন কয়েক হল।

চটি বই, কিন্তু তা হলেও এর ভিতর মানব মনের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব, জয়াশা নিরাশা এবং সর্বশেষে আর্তকণ্ঠে বিশ্বজনের প্রতি অভিসম্পাত সহ ভবিষ্যদ্বাণী—এসবই রয়েছে কর্কশ হতে কর্কশতর ভাষায়।

তবে একথা ঠিক, আর কিছু না হোক, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলছে![1]

॥ ২ ॥

প্রথম প্রশ্ন: ফ্রান্সের পরাজয়ের পর হিটলার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না কেন? পূর্বেই বলেছি, এ বিষয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন: এবারে হিটলারের মুখে শুনুন:

'জুলাইয়ের (১৯৪০) শেষের দিকে, অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের একমাস পরে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, শান্তি আবার আমাদের মুঠোর

(1) The testament of Adolf Hitler, (February-April 1945). The Hitler-Borman Documents, Cassell, London, pp. 115.

বাইরে চলে গেল। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে শরৎ-হেমন্তের ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বে আমরা ব্রিটন অভিযান করতে পারবো না কারণ আকাশ-যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে পারিনি। তার সরল অর্থ, আমরা ভবিষ্যতেও আর কখনো ব্রিটন অভিযানে সক্ষম হব না।'

(টীকা: হিটলার এবং গ্যোরিঙের চাল ছিল, ইংলণ্ডের উপর বেধড়ক বোমা বর্ষণ করলে ইংলিশ জঙ্গী বিমান আকাশে উঠবে জর্মান বোমারু বিমান নিধন করার জন্য। তখন সেগুলোকেও বিনাশ করা হবে। ফলে আকাশে ইংলণ্ডের আর কোনো আধিপত্য থাকবে না বলে তখন সহজেই সমুদ্রপথে ব্রিটন অভিযান সম্ভবপর হবে। ইংরেজ এই চালটি বুঝতে পেরে, বরঞ্চ বেধড়ক বোমার মার খেল, কিন্তু জঙ্গী বিমান আকাশে তুললো অত্যল্পই—বাকিগুলো বাঁচিয়ে রাখলো হিটলারের সমুদ্র অভিযানের জাহাজগুলোকে ঘায়েল করার জন্য।)

হিটলার পুনরায় অন্যত্র বলছেন,

'ইংলণ্ড-অভিযান ও ফলে যুদ্ধ শেষ করে শান্তি স্থাপনের আশা ত্যাগ করেছিলুম। কারণ ইংলণ্ডের মূর্খ নেতারা কিছুতেই ইয়োরোপে আমাদের একচ্ছত্রাধিপত্য স্বীকার করে নিত না—যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আমাদের সঙ্গে বৈরীভাবাপন্ন শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রও (অর্থাৎ রুশ) বেঁচে থাকতো। যুদ্ধের তা হলে শেষই হত না—চলতেই থাকতো। এবং ইংরেজের পিছনে মার্কিন এসে জুটে তার কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে তুলতো। মার্কিনের আবার যুদ্ধ করার জন্য সব বলই প্রচুর, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তারাও আমাদেরই মত প্রচুর এগিয়ে যেত; ইংলণ্ড থেকে কণ্টনেন্টি দূরে নয় (অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তারাও কন্টিনেণ্টে নেমে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে)—এ সমস্ত কারণে আমাদের পক্ষে ইংলণ্ড অভিযান করে এক সুদীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ের দ'য়ে মজে যাওয়া মোটেই

সমীচীন হত না। কারণ স্পষ্ট দেখতে পারছো, সময়—কাল, ক্রমেই আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সাহায্য করে যেত বেশী। ইংলণ্ডের শেষ আশা ছিল রুশ—কারণ রুশ আমাদেরই মত শক্তিশালী—এবং তাকে খাড়া করানো আমাদের বিরুদ্ধে! এই রুশকে ঘায়েল করতে পারলেই ইংরেজ বুঝতো, যে তার আর আশা নেই, এবারে সন্ধি করতেই হবে।'

হিটলার এস্থলে পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন, কেন ইংলণ্ড আক্রমণ না করে তিনি তখন রুশ আক্রমণ করলেন।

এ যুক্তিগুলো কতখানি বাস্তব তার বিচার রণ-পণ্ডিতেরা করবেন। ঈষৎ অবান্তর হলেও অন্য একটি যুক্তির কথা এ-স্থলে উল্লেখ করি, কারণ সেটি জানা থাকলে ভারতের ইতিহাস বুঝিতে অনেকখানি সুবিধা হয়।

একাধিক রণ-পণ্ডিত বলেছেন, হিটলার এমন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যার সঙ্গে সমুদ্র ও সমুদ্রাভিযানের যোগসূত্র বা ঐতিহ্য ছিল না। অষ্ট্রিয়াকে ইংরেজ, স্পানীয় বা আরবের মত ম্যারিটিম্ নেশন বলা চলে না। তাই ইংলণ্ড অভিযানের সব-কিছু তৈরী করেও (১) হিটলার শেষ মুহূর্তে কিন্তু কিন্তু করে থেমে গেলেন।

অর্থাৎ জলাতঙ্ক না থাকলেও হিটলারের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল—অন্তত সমুদ্রপ্রীতি যে ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য মানতে হবে এইটেই সর্বপ্রধান কারণ নয়।

পাঠান মোগল বংশের রাজাদের ও হিটলারের অবস্থা ছিল। এরা এসেছিলেন ল্যাণ্ড-লকট্ দেশ থেকে। সমুদ্রের সঙ্গে তাদের

(১) যারা হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্মানের বই 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড', পড়েছেন তাঁরাই জানেন, ইংলণ্ড অভিযানের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর কথা ছিল, এক বিশেষ সন্ধ্যায় রাত দশটায় হিটলার অভিযান আরম্ভের ফাইনাল অর্ডার দেবেন। হিটলার হফ্মান ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে রাত বারটা অবধি গাল-গল্প করে শুতে গেলেন। কোনো অর্ডারই দিলেন না। অভিযান নাকচ হল।

কণামাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমার যতদূর জানা আছে, মোগলদের ভিতর প্রথম আকবরই গুজরাত জয় করে চাক্ষুষ সমুদ্রদর্শন করেন। 'আকবর-নামের' ইংরিজী অনুবাদক সেই সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সমুদ্র আকবরের মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে নি। তাও আকবর প্রভৃতি বাদশারা যদি সমুদ্রপারে কিংবা অদূরে রাজধানী করতেন তা হলেও না হয় কিছুটা হত। তাঁরা থাকতেন আগ্রা দিল্লীতে যেখানে সমুদ্রের লোনা হাওয়া পর্যন্ত পৌঁছয় না।

ফলে এদের বিপুল ঐশ্বর্য জনবল থাকা সত্ত্বেও আমাদের নৌবহর তৈরী হল না।

হোয়াট এ ট্র্যাজেডি! এ'রা যদি নৌবহর তৈরী করতেন, তবে পর্তুগীজ ইংরেজ এদেশে যে এক রত্তি পাত্তা পেত না তাই নয়, আমাদের পণ্যসম্ভার আমাদের জাহাজে করে দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত। আজ আমরা মার্কিন ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতুম। এবং পরম পরিতাপের বিষয়, আজও আমাদের মন সমুদ্র সচেতন নয় —রাজধানী সেই দিল্লীতে যে।

অথচ আমরা সবাই জানি, সমুদ্র-যাত্রায় ভারতের খ্যাতি একদা ছিল।

সে দীর্ঘ কাহিনী তুলবো না। মহাভারতের মাত্র সামান্য একটি কথার উল্লেখ করি। শান্তি পর্বে ভীষ্ম রাজ্যচর্চার সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য প্রজাপতিকৃত লক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক বিরাট শাস্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন, "ঐ বিরাট শাস্ত্রে...নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নৌকার পথরোধ...সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে (শান্তিপর্ব)।" অর্থাৎ কয়েক বৎসর পরে অ্যাণ্টনি ইড্‌ন সুয়েজ কানালের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে যে-ভাবে খালের মুখ বন্ধ করলেন! এ-সংসারে নূতন কিছুই নয়।

নৌবহর বাবতে ভারতের তখনই সর্বশক্তি গেছে যখনই কেন্দ্রীয় সরকার নৌশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ কারণ তখন তাঁরা বাঙলা, গুজরাত এবং

প্রদেশকে নৌবহর তৈরী করার জন্য অর্থ দিতেন না—এর মূল্য জানেন না বলে সেকথা পূর্বেই বলছি। অথচ ঐ সময়ে, যেমন মনে পড়ে তীমুর অভিযানের পর আকবর-জাহাঙ্গীর পর্যন্ত বাঙলা, গুজরাত স্বাধীন। নৌবহরের মূল্য জানেন বলে গুজরাতের স্বাধীন সুলতান মাহমুদ বেগড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সকলেই নৌবহর রেখেছেন এবং একাধিকবার নৌসংগ্রামে পর্তুগীজদের বেধড়ক মার মেরেছেন। গুজরাতের শেষ স্বাধীন বাদশা বাহাদুর শাহ মারা যান, তিনি যখন হুমায়ুন এবং শের শা'র ভয়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে তাদের জাহাজে যান। পর্তুগীজদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন—পর্তুগীজরা বৈঠার ঘায়ে তাঁকে খুন করে।

বাঙলাও যখন স্বাধীন তখন পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়েছে। যদিও তারা সুন্দরবন অঞ্চল ছারখার করেছে, তবু বাঙলায় গোয়া দমন দিউ-র মত রাজ্য স্থাপন করতে পারে নি।

আকবর থেকে আওরঙজেব পর্যন্ত বাঙলা গুজরাত আর্তকণ্ঠে বার বার চিৎকার করে কেন্দ্রের হুজুরদের জানিয়েছে, পর্তুগীজরা সর্বনাশ করছে। আমাদের পণ্যসম্ভার হারমদদের ভয়ে বিদেশে রপ্তানি হতে পারছে না। বাধ্য হয়ে জলের দরে পর্তুগীজদেরই বেচে দিতে হচ্ছে। আমরা যখন স্বাধীন ছিলুম তখন আমাদের আপন টাকা দিয়ে আমরা নৌবহর গড়েছি। এখন কুল্লে টাকা চলে যায় কেন্দ্রে। দয়া করে টাকা দিন ; নৌবহর গড়ি।

কিন্তু কেবা শোনে কার কথা। হুজুররা হিটলারের চেয়ে অধম ল্যাণ্ড লক্‌ট দেশের লোক, এবং এখন থাকেন দিল্লীতে। নৌবহরের মূল্য কি বুঝবেন !

ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি আজও যদি কেন্দ্র বাঙলাদেশকে বাণিজ্য-নৌবহর তৈরী করবার জন্য বিশেষ মোটা টাকা না দেয়, তবে বুঝব ইতিহাস বৃথাই পড়ছি।

১৯৪১।

হিটলার আত্মহত্যা করার এক মাস পূর্ব পর্যন্ত বারবার করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি চাইনি, আমি চাইনি, আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলুম জর্মনির জন্য তার বেঁচে থাকার মত (লেবেন্‌স্‌রাউম) 'ভুই বিঘে জমি'। জমিটা আসবে চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড ও উক্রানিয়া থেকে। তাতে ইংলণ্ডের কি, ফ্রান্সেরই বা কি? আমি তো ফ্রান্স কিংবা তার উপনিবেশে হাত দিতে চাইনি। ইংরেজকেও শতবার বলেছি, তার বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিও কণামাত্র লোভ আমার নেই। রুশরা বর্বর, তারা বিশ্বশান্তির শত্রু। তারা পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিতে পারলে তার শক্তিক্ষয় হয়ে যাওয়ায় সে বিশ্বশান্তি নষ্ট করতে পারবে না; জর্মনরাও খেয়ে পরে বাঁচবে, ফ্রান্সের উপানবেশ বা ব্রিটনের বিশ্বরাজ্যের দিকে হ্যাংলার মত তাকাবে না।

কিন্তু ফরাসী ইংরেজ চায় না, আমরা খেয়ে পরে বাঁচি। তারা বোঝে না, রুশ বিশ্বশান্তির কত বড় দুশমন। তাই যুদ্ধ করলো তারা। আমি যুদ্ধ করিনি।

এবং এই ফ্রান্স, ব্রিটন ও মার্কিনের পিছনে রয়েছে বিশ্বইহুদি-সম্প্রদায়। আমি যেদিন (জানুয়ারী ১৯৩৩) জর্মনির কর্ণধার হলুম সেদিন থেকেই ইহুদিরা আমার ও জর্মনির বিনাশ চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলো। আমিও তাদের একাধিক বার স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলুম, তারা যদি জর্মনিকে নিধন করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আহ্বান করে তবে আমি তাদের সমূলে নির্মূল করবো। বেদরদ হৃদয়ে। মানুষ যে রকম ছারপোকা মারার সময় দয়া মৈত্রীর কথা ভাবে না।

(ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় গ্যোরিঙ, কাইটেল, রিবেনট্রপ ও অধুনা আইষমান যখন বলেন ইহুদি-নিধন ইত্যাদি ব্যাপারে স্বয়ং হিটলার

সম্পূর্ণ স্বাধীন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তখন তাঁরা কণামাত্র অতিরঞ্জন করেননি।)

যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে হিটলারের এইটেই মোটামুটি বক্তব্য।

ছনিয়ার কুল্লে অশান্তি, বিশ্ব-জোড়া লড়াই এসব-কিছুর জন্য একমাত্র ইহুদি সম্প্রদায়ই দায়ী এ কথা একমাত্র অত্যন্ত গোঁড়া নাৎসি ভিন্ন কেউ স্বীকার করবে না, (অবশ্য আরবরা প্যালেস্টাইন হারিয়ে যাওয়ার ফলে করতে পারে, কিন্তু তাদের সরকারও ইহুদিদের আপন ভিন্ন ভিন্ন আরব রাষ্ট্র থেকে ব্যাপকভাবে তাড়াবার চেষ্টা করেনি—নিধন করার তো কথাই ওঠে না) কিন্তু আমাদের মনে তবু প্রশ্ন জাগে, সত্যই কি ইহুদিরা কতখানি শক্তি ধরে, বিশ্বযুদ্ধের জন্য তারা কতখানি দায়ী? আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এর সদুত্তর কেউ কখনো পাবে না—উপস্থিত শুধু এইটুকু বলতে পারি, সুদ্ধমাত্র টাকার জোরে প্যালেস্টাইনের মত একটা রাজ্যস্থাপনা করা ইহুদি ভিন্ন আর কেউ কখনো করতে পারেনি।

এখানে আরেকটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যাপারের উল্লেখ করি।

সকলেরই বিশ্বাস ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ম্যুনিকে ফরাসী ইংরেজ যখন অকাতর চিত্তে চেকোস্লোভাকিয়ার অংশবিশেষ হিটলারের হাতে তুলে দেন তখন এদের মানমর্যাদা উচ্ছন্ন যায়, এবং হিটলারের পরিপূর্ণ বিজয় ও বিশ্বজোড়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এই জয়ে গোটা জর্মনির জনসাধারণ তখন এমনি উল্লসিত, হিটলারের জয়গানে এমনি মুখরিত যে জর্মনির ভিতরে যে-সব জর্মন হিটলারের পতনের জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত নিরাশ হয়ে তাঁদের চক্রান্ত কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রাখেন।

এই ম্যুনিক-ব্যাপারে হিটলারের মত কি?

তিনি খাপ্পা হয়ে বলছেন,

'সেই কট্টর ক্যাপিটালিস্ট বূর্জুয়া চেম্বারলিন যখন তার ভণ্ডামির ছাতাখানা নিয়ে সর্ব তকলীফ বরদাস্ত করে সেই সুদূর বের্গহফে

(হিটলারের নিবাস) হিটলারের মত হঠাৎ-নবাবের (আপস্টার্ট) সঙ্গে পরামর্শ করতে এল, তখন সে বিলক্ষণ জানতো যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ চালানো। আমার সন্দেহ মোচনের জন্য সে তখন যা খুশি তাই বলবার জন্য তৈরী। বের্গহফে আসার তখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কোনো গতিকে সময় পাওয়া (অর্থাৎ যুদ্ধটা মুলতুবি করা)। আমাদের তখন উচিত ছিল ১৯৩৮-এই যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়া। কিন্তু তারা (চেম্বারলেন সম্প্রদায়)—সেই নির্বীর্য কাপুরুষের দল—আমরা তখন যা চাইলুম তাই দিতে লাগলো। এ-অবস্থায় গায়ে পড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা যায় কি প্রকারে (অর্থাৎ জর্মনির জনসাধারণ বলতো, ইংরেজ ফরাসী যখন আমাদের সব খাঁইই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন আমরা খামকা লড়াই করতে যাবো কেন ?) ? তাই আমরা ম্যুনিকে অতি সহজ ও দ্রুত লড়াই জেতার স্নুবর্ণ স্নুযোগ হারালুম। যদিও আমরা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম না, তবু শত্রুর চেয়ে বেশী প্রস্তুতি আমাদের ছিল। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততম সময় ছিল।'

মুস্সোলীনির মধ্যস্থতায় যে ম্যুনিকপর্ব সমাধান হয়েছিল সে-কথার উল্লেখ হিটলার করেননি। এ স্থলে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য—১৯৩৯-এ হিটলার পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে বলেন, 'আশা করি এবারে আবার হঠাৎ কোনো বদমায়েশ (শুয়াইন-হুণ্ট) ম্যুনিকের মত শেষ মুহূর্তে এসে সব-কিছু না ভণ্ডুল করে দেয়।'

* * *

এবারে শেষ প্রশ্ন।

যুদ্ধ হারার জন্য তিনি কাকে দায়ী করলেন ?

ইতিপূর্বেই আমাদের জানা ছিল, ন্যুরনবের্গের মকদ্দমার সময় যে-সব দলিল-পত্র পেশ করা হয় তাতে হিটলারের উইলটিও ছিল।

এ-উইলের সততা সম্বন্ধে শত্রু মিত্র কেউই কোনো প্রকারের সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এটি তিনি তৈরি করেন আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। জর্মনির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এটি লিখিত।

এ উইলে হিটলার নৌসেনার প্রশংসা করেছেন (বস্তুত তিনি মৃত্যুর পূর্বে নৌবহরের বড় কর্তাকেই তাঁর পদে বসিয়ে যাবার জন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন নাকি বড় কর্তা স্বয়ং), যে বিমানবহরের অকৃতকার্যতার জন্য অন্তত অংশত তাঁকে পরাজয় মানতে হল তারও প্রশংসা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন তাঁর 'ব্লিৎসক্রীগ' করনেওলা ল্যাণ্ড-আর্মির জেনারেল ফীল্ড্-মার্শালদের। সাধারণ সৈনিকের উচ্চ প্রশংসা তিনি করেছেন, কিন্তু তাঁর সর্ব ক্রোধ আর্মি আপিসারদের উপর।

তারাই তাঁর সর্বনাশ করেছে। তারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে। তারা প্রতিক্ষণে পরাজয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পদে পদে সপ্রমাণ করেছে, তারা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়ছে। অর্থাৎ নূতন যুগে নূতন লড়াইয়ে যে নূতন কায়দায় লড়তে হয় সেটা তারা আদপেই বুঝতে পারেনি।

হিটলারের যদি সুকুমার রায় পড়া থাকতো তবে নিশ্চয়ই বলতেন, এ যেন 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!' সোজা বাঙলায়, জাঁদরেলরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ছায়ার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছেন?

তা হলে প্রশ্ন: পোলাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে সম্পূর্ণ জয় করে মস্কৌর চৌকাঠ পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল কারা? ঐ জেনারেলরাই তো।

তবে?

১৯৫১।

শাঁসালো জর্মনি

এ রকম ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি আমি এ-জীবনে কখনো দেখি না।

ত্রিশ বত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপ যাওয়া-আসা করছি। সব-কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ধনদৌলত এবং তার বণ্টন-ব্যবস্থা সুইটজারল্যাণ্ডেই সব চেয়ে ভালো। ১৯২৯।৩০ সালের কথাই ধরুন। ইংলণ্ডের তখন প্রচুর কলনি, বিস্তর দৌলত বিদেশ থেকে আসছে। সুইটজারল্যাণ্ডের কলনি নেই; সে পয়সা কামায় মালপত্র রপ্তানী করে। কিন্তু ইংলণ্ড বেশী ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার সে ধনের অনেকখানি চলে যায় গুটিকয়েক পরিবারের হাতে, কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে সে ধনের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় অনেক বেশী ধর্মানুমোদিতরূপে। সে-দেশেও লক্ষপতি কোটিপতি আছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ ধনের হিস্যা পায় আপামর জনসাধারণ।

ফ্রান্স খুব ধনী দেশ নয়। কিন্তু সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দেশ।

আর জর্মনি যেন জুয়াড়ীর দেশ। কখনো তার সামনে হুদোহুদো টাকা আর কখনো সে লাটে উঠি উঠি করছে। কখনো রেস্তরাঁ-কাবারে গমগম করছে, কখনো রাস্তায় রাস্তায় জোয়ান মেয়ে-মদ্দে কাজের সন্ধানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমনই যখন তার দুর্দিন প্রায় চরমে তখন, ১৯২৯ সালে, প্রথম আমি জর্মনি যাই। তার দুরবস্থা চোখে পড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করলুম যে, এরা একদিন রীতিমত ধনী ছিল। ঘরের আসবাবপত্র সেই প্রাচীন দিনের খানদানী মজবুৎ সালে তৈরী এবং রুচিসঙ্গত। ওয়ালপেপার পর্দা, টেবলক্লথ পুরনো হয়ে এসেছে বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় এগুলো দামী এবং একদা এরা বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। ১৯২৯-এ কিন্তু রিপুকর্মের পালা।

আর ১৯৬২তে দেখি—দাঁড়ান একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বাঙলায় যখন বলি, 'অমুক কাকের ছানা কিনছে' তার অর্থ সে দু হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। জর্মনে বলা হয়, সে জানলা দিয়ে পয়সা ছুড়ছে।

এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সম্বন্ধে নানা রকমের আহাম্মুখীর কেচ্ছা শুনতে পাওয়া যায়। জর্মন ভাষাভাষী দেশগুলোতে আহাম্মুখের রাজার নাম পল্ডি।

ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পল্ডি দেখে এক দুদিনের চ্যাংড়া ছোকরা জব্বর দামা একখানা স্পোর্টস মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। পল্ডি শুধোলে, 'কে ও?' ল্যাণ্ডলেডি বললে, 'রেখে দিন ওর কথা। বাপ মরেছে। ছোকরা দেদার টাকা পেয়েছে। এখন জানলা দিয়ে পয়সা ছুড়ছে।'

পলডি বেজায় উত্তেজিত হয়ে বার বার শুধোয়, 'কোথায় থাকে সে?' ঠিকানা কি?'

এবারে জর্মান গিয়ে দেখি, সবাই জানলা দিয়ে টাকা ছুড়ছে। কুড়োবার লোক নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট, জর্মনির কুত্রাচ কোনো রেল স্টেশনে আর পোর্টার, মুটে নামক নিরতিশয় প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নেই। আমারই চোখের সামনে আমারই আড়াই মণী ইয়া লাশ ভাতিজা নামল এক ঢাউস সুটকেস নিয়ে। মুটে নদারদ্। ওপারে যেতে হবে ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে। বাবাজী সুটকেশ টানছে আর বলছে, 'দুটো সুটকেসে ভাগাভাগি করে নিয়ে এলে তবু না হয় ব্যালান্স্ড হয়ে চলতে পারতুম।' বাবাজী ওপারে যখন পৌঁছলেন তখন পিঠের ঘাম কোটের বাইরে চলে এসেছে—হামবুর্গে সে-সন্ধ্যায় টেম্পারেচার ছিল পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। ধকল কাটাতে বাবাজীকে খেতে হয়েছিল তিন লিটার বিয়ার। অবশ্য জর্মনিতে বিয়ার সস্তা।

আর দাসী চাকরানী? তবে শুনুন

সবশুদ্ধ আটটি পরিবারে ডিনার লাঞ্চের নিমন্ত্রণ খেয়েছি—কারো বাড়িতে দাসী দূরে থাক, একটি হেলপিংহ্যাণ্ডও দেখতে পাইনি। কেন নেই, সেই প্রশ্ন শুধালে পর আমার অধ্যাপকের বিধবা বললেন, 'মেড্? তা রাখা যায় বই কি! চার শ পাঁচ শ টাকা মাইনে। তাঁকে একখানা ঘর দিতে হবে—রেডিয়োটা অবশ্য তিনি নিজেই আনবেন। সিনেমায় ক'দিন যাবেন, ছুটি ক'দিন দিতেই হবে সেটাও আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া হবে, পাকাপোক্ত। তারপর তিনি নেমে এলেন রান্না ঘরের কাজে—নখে ঝাঁ-চকচকে নেলপলিশ, এই মাত্র লাগানো হয়েছে, এখনো পেন্টের গন্ধ বেরচ্ছে। তাই কাজ করেন অতি সন্তর্পণে, পাছে বার্নিশে জখম লাগে। খানিকক্ষণ বাদে দেখবে তিনি নেই। বীবী আপন কামরায় গেছেন সিগারেট খেতে সেটা দিনে ক'বার হয়, না হয়, সে তোমার কপাল। তার উপর মোটা দড় কাজ তিনি করবেন না—যেমন মনে করো জানালার শার্শিগুলো জল দিয়ে ধুয়ে পোছা। তার জন্য সপ্তাহে একবার করে তোমাকে অন্য লোক আনাতে হবে। কি হবে অত সব বয়নাক্কার ভিতরে গিয়ে।'

* * * *

ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধোলুম, 'ওটা কি হে?' দেখি হামবুর্গের মত শহরে—যেখানে কি না প্রতি ইঞ্চি জমি মহামূল্যবান—সেখানে এক জায়গায় হাজার খানেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বললে, 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কার্। একটা কিনবেন? মাত্র হাজার থেকে আরম্ভ। গত বছর, জোর আগের বছরের মডেল। টিপ্‌টপ্ কণ্ডিশন। ট্যাঙ্ক পেট্রলে ভর্তি। দুটি কথা কইবেন—সাঁ করে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে যাবেন।'

বলতে না বলতে সে ঢুকে গেছে ঐ মোটরের মেলায়। ওর কথা ঠিক। গাড়িগুলো যেন কাল পরশু কেনা। আমি শুধোলুম 'তা গাড়িগুলো এই খোলামেলায় জলঝড় খাচ্ছে?'

বললে, 'ঐ তো, স্যর, রগড়। হামবুর্গে গাড়ি পাবেন সহজে—গারাজ পাবেন খুব যদি কপালের জোর থাকে।' তারপর শুধোলে, 'আপনার দেশে হাল কি রকম ?' আমি বললুম, 'আমাদের দেশের অনেক লোক পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে'।—পূর্বজন্মটা কি চীজ্ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হল। শেষ করলুম এই বলে, 'সেই পূর্বজন্মে যদি অশেষ পুণ্য করে থাকো, তবে এ জন্মে তোমার কপালে মোটর থাকলে থাকতেও পারে। মোটরই যখন নেই তখন গারাজের তো কথাই ওঠে না।'

পরের ঘটনা, কিন্তু এই সুবাদে বলে ফেলি। এর কিছুদিন পর গিয়েছি সেই বন্ শহরে যেখানে ছাত্রজীবনের কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, সামনে অগুনতি মোটর। আমার সতীর্থ—এখন নামজাদা স্লিস্টার—সঙ্গে ছিল। শুধোলুম, 'পরবটরব আছে নাকি রে? হ্যার আডেনাওয়ার এলেন নাকি? তিনি না কাছে পিঠে কোথায় যেন থাকেন ?'

শুধোল 'কেন ?'

'ঐ যে অত মটর গাড়ি।'

'সে তো স্টুডেন্টদের।'

বলে কি! ত্রিশ বত্রিশ বছর পূর্বে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ' তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনার মোটর গাড়ি আছে আমরা আঙুলে গুণে বলতে পারতুম। আর আজ!

হামবুর্গে ফিরে যাই।

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন আমার চেয়ে বছর পনরো বড়। তিনি যুদ্ধের পর গত হন। উঠেছিলুম তাঁরই বিধবার বাড়িতে। তাঁরই এক মেয়ে কথায় কথায় বললে, 'জানেন, আজকাল এ দেশে অনেক ছেলে মেয়ে স্টুডেন্ট থাকাকালীনই বিয়ে করে ফেলে। কর্তাগিন্নী চললেন মোটর হাঁকিয়ে কলেজে—যেমন মনে করুন মেডিকেল কলেজ। পিছনের সীটে একটি বাচ্চা, কোলে আরেকটি।

কলেজে পোঁছে ছোটটি রাখলেন ধাইয়ের জিম্মায়, অর্থাৎ ক্রেশে। বড়টা গেল বাগানে খেলতে।'

ওদের খেলার জন্য নাকি স্পেশাল বাগান আছে। সত্যি আছে কি না সেটা আমি চেক্ আপ্ করার সুযোগ পাইনি। তবে এ-কথা সত্য এখন বেশ-কিছু ছেলেমেয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই বিয়ে করে।

বললুম, 'আগে তো এরকম ছিল না, এখনই বা হল কি করে?'

বললে, 'আগে বাপমায়ের এতটাকা ছিল কোথায় যে ছেলেকে বলবে "তুই বিয়ে কর। নাতি পোষার পয়সা আমার আছে।" আমিও বলি, সেই যখন বিয়ে করবেই একদিন তখন শুকিয়ে শুকিয়ে পুঁইডাঁটাটি হয়ে যাবার কি প্রয়োজন?'

আমার মনে পড়ল এক বিয়েতে স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী একটা জোয়ান ছোকরাকে বললেন, 'দেখ দিকিনি, ছেলেটা কি রকম বুদ্ধিমানের মত বিয়ে করে ফেলল। তোরা তো পিত্তি না চটিয়ে খেতে পারিসনে।'

কিন্তু এ স্থলে বলে রাখা ভালো, জর্মনিতে কোনো ছেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাপের সঙ্গে থাকে না—ভিন্ন বাসা বাঁধে।

অতএব বাপ দুটো সংসার পুষবে। এন্তের টাকা না থাকলে পারে কেডা?

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি এই ভারতবর্ষে বাল্য বিবাহে আমরা পৌঁচেছিলুম এই পদ্ধতিতেই—ধাপে ধাপে! কারণ জানি, অতি প্রাচীন যুগে এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল না। তারপর বোধ হয় হঠাৎ একদিন ধনদৌলত বেড়ে যায়—আজ যে-রকম জর্মনিতে। তখন আমরাও ছেলেছোকরাদের বিয়ে দিতে লাগলুম, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার পূর্বেই। ক'রে ক'রে, আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে গৌরীদান!

এ পৃথিবীতে নূতন কিছুই নেই।

হিটলার

এই গত রবিবারের 'আনন্দবাজারেই' দেখি, আমাদের শিবুদা হিটলারকে নিয়ে একখানা 'পান্' ছেড়েছেন। 'হের হিটলার নাকি নিজের গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে বহাল তবিয়তে আর্জেন্টিনায় বিরাজ করছেন।' এর উপর শিবুদার 'পান্'—'তার গোঁ গেছে, এখন গোঁফও গেল।, (১)

আমি কিন্তু পান্টার দিকে নজর দিচ্ছি না। আমার নজর ঐ তত্ত্ব কথাটির দিকে যে হিটলার এখনো বেঁচে আছেন।

সত্যি নাকি ?

আমি এবার জর্মনীতে বেশী লোককে এ প্রশ্ন শুধোইনি। তার কারণ আমি নিজে যখন নিঃসংশয় যে হিটলার বেঁচে নেই তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার লাভ কি ? যে দু'একজনকে শুধিয়েছিলুম তারাও নিঃসংশয়—বেঁচে নেই।

তা হলে প্রশ্ন, তিনি যে বেঁচে আছেন এ-গুজোবের উৎপত্তি কোথায় ?

হিটলার মারা যাওয়ার মাস তিনেক পর বার্লিনের কাছের শহর পৎসদামে মিত্রশক্তির এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাকি স্তালিন বলেন, তাঁর বিশ্বাস, হিটলার মারা যাননি, গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

---

(১) হিটলার গোঁফ কামালেই যে তাঁর পক্ষে সেইটেই সব শ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ এই নিয়ে ১৯৩৩ চৌত্রিশেই একটি কাঁচা রসিকতা চালু ছিল। একদা হিটলার গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস ও রোম ছদ্মবেশে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠাহর করার জন্য বেরলেন। হিটলার গোঁফ কামালেন, গ্যোরিঙ সিভিল ড্রেস পরলেন, গ্যোবেলস কথা বন্ধ করে দিলেন ও রোম একটি প্রিয়দর্শন তরুণ সঙ্গে নিলেন। এস্থলে বলে দেওয়া প্রয়োজন গ্যোরিঙ বড্ড বেশী য়ুনিফর্ম ভালো বাসতেন, গ্যোবেলস প্রপাগাণ্ডা চীফ বলে সমস্তক্ষণ বকর বকর করতেন আর রোম সমরতিগামী অর্থাৎ হোমোসেকসুয়েল ছিলেন।

এর কিছুদিন পর রাশান এনসাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণের প্রকাশ হয় এবং তাতে বলা হয়, হিটলার অদৃশ্য হয়েছেন—তিনি যে মারা গেছেন এ-কথা রুশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে অস্বীকার করলেন। ইতি-পূর্বে দুনিয়ার সর্বত্র কত রকমের যে গুজোব রটল তার ইয়ত্তা নেই। আর্জেন্টাইন সউদী আরব কোনো জায়গাই বাদ পড়লো না, যেখানে হিটলার নেই। এমন কি এক কাষ্ঠরসিক প্রকাশ করলেন, তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাঝখানে বিরাজ করছেন। সে যুগে স্পুটনিক জাতীয় কোনো কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। না হলে হয়তো বলা হত, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চন্দ্রের লাতিন নাম লুনারিস—যার থেকে লুনাটিক—উন্মাদ—শব্দটা এসেছে এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন যে পরাজয়ের চরম অবস্থায় হিটলার নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তবে বদ্ধ উন্মাদ নয়, মুক্ত উন্মাদ। তাই আপন আদি বাসভূমে চলে গেছেন।

তা সে যাই হোক, ইংরেজ ভাবলে, হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে না এক নূতন লীজেণ্ড সৃষ্টি হয়—১৯১৮ সালে জর্মনীতে যে-রকম এক লীজেণ্ড চালু হয় যে জর্মন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে হারেনি, ঘর শত্রু বিভীষণ (অর্থাৎ ইহুদি, সোশাল ডেমোক্রেট, কম্যুনিস্ট—যার যাকে অপছন্দ) যদি তার 'পিছন থেকে পিঠে ছোরা' না মারতো। হিটলার স্বয়ং এ লীজেণ্ডের প্রচুরতম 'সদ্ব্যবহার' করেন। ইংরেজের তাই ভয় হল, হিটলারকে কেন্দ্র করে নয়া এক লীজেণ্ড যেন সৃষ্ট না হয় যার জোরে এক নব-নাৎসি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অতএব উত্তমরূপে তদন্ত করা হোক, হিটলার বেঁচে আছে কি নেই।

এ কাজের ভার এক অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। ট্রেভার রোপার সাহেব খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

দীর্ঘ দিন ধরে অতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তাঁর তদন্ত চালান। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাঠক পাবেন তাঁর লেখা 'লাস্ট ডেজ অব হিটলার' পুস্তকে। অতি উপাদেয় সে পুস্তক। এক দিক দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিকের মত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্য তিনি যাচাই করেছেন অতিশয় সন্তর্পণে, অন্য দিক দিয়ে তিনি সে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের মত সরল ভাষায়, মনোরম শৈলীতে। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে কি করে উৎকণ্ঠিত উদগ্রাব অবস্থায় পৌঁছিয়ে সর্বশেষে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তিতে রসসৃষ্টি করতে হয়, ঐতিহাসিক হয়েও ট্রেভর-রোপার এই কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত এরকম রোমাঞ্চকর পুস্তক আমার জীবনে অল্পই পড়েছি।

কোনো কোনো অরসিক অবশ্য বলেছেন, বইখানা লুরিড, অর্থাৎ রগরগে, কিংবা বলতে পারেন, পুস্তকে বীভৎস রসের প্রাধান্য। এটা অবশ্য রুচির কথা; তবে আমার বিশ্বাস, বিষয়বস্তু নিজের থেকেই তার রসরূপ নির্ণয় করে। প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট সে-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। সে যেন নিতান্ত মিডিয়াম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রানী চন্দ যেভাবে ঘরোয়া লিখেছেন। এস্থলে অবশ্য অবন ঠাকুরের স্থলে ঘটনা-প্রবাহই তার রসরূপ নির্ণয় করে দিয়েছে।

তৎসত্ত্বেও বহুতর লোক বিশ্বাস করতে নারাজ হলেন যে, হিটলার গত হয়েছেন। এরা যেসব আপত্তি তুললেন, ট্রেভার-রোপার তাঁর বইয়ের দ্বিতায় সংস্করণে সেগুলোকে দফে দফে হালুয়া করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করতেও জানেন। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এই: শীতকালে যখন য়ুরোপের লোক গরম জায়গায় যেতে চায় তখন দেখা গেল যাঁরা—এঁদের অধিকাংশই খবরের কাগজের রিপোর্টার —ট্রেভার-রোপারের রায়ে সায় দিচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন হিটলারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে আর্জেন্টিনায়, এবং গ্রাষ্মকালে বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (গ্রীষ্মে, শীতল, মনোরম) সুইজারল্যাণ্ডে!

ট্রেভার-রোপার বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন, অতএব পত্রিকার পয়সায় শীতে গরম জায়গা এবং গরমে শীতল জায়গায় দিব্য কয়েকটা দিন পরমানন্দে কেটে গেল।

তবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বইখানাকে কেউ সিরিয়াসলি চ্যালেঞ্জ করেননি। এবং ট্রেভার-রোপার তাঁর সর্বশেষ শিরোপা পেলেন রাশার কাছ থেকে। হালে রাশান এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার যে নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হিটলার মৃত।

শুধু এই বই নয়, হিটলারের সঙ্গে যাঁরা তাঁর 'বুঙ্কারে' (বোমারু বিমানের বোমা থেকে আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়গৃহ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের জীবিতজন মাত্রই পরবর্তী কালে বই লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন অথবা খবরের কাগজে মাসিক প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এঁদের সকলে মিলে একজোট হয়ে হিটলারের মৃত্যুর একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নানা ঘড়েল পুলিস, রিপোর্টার ইত্যাদির ক্রস এগজামিনেশনে পাস করে এখনো সেটা আঁকড়ে ধরে আছেন, এটা অবিশ্বাস্য। আরো নানাবিধ কারণ আছে এবং ট্রেভার-রোপার সেগুলো সবিস্তর আলোচনা করেছেন। হালে শায়রার (Shirer) নামক একজন মার্কিন কর্তৃক লিখিত হিটলারের রাজত্ব সম্বন্ধে বিরাট একখানা বই বেরিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার জর্মন অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। বইখানা মোটের উপর ভালোই। কিন্তু ওভার সিম্‌প্লিফিকেশনের দোষে দুষ্ট। শায়রার ও হিটলারের অন্যান্য জীবনী-লেখকগণও ঐক্যনাদে স্বীকার করেন, হিটলার মৃত।

কিন্তু হিটলার জীবিত না মৃত সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, জর্মন জনগণ হিটলার সম্বন্ধে কি ভাবে, আবার যদি অন্য রঙ ধরে আরেক হিটলার দেখা দেন তবে সে তার অধুনালব্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্জন করে পুনরায় গড্ডলিকাস্রোত বওয়াবে কিনা? এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সে যে এক বিরাট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেল সে সম্বন্ধে তার মতামত কি?

যাদের বয়েস পঁচিশ ত্রিশের চেয়ে কম তাদের জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের কারো কারো কিছুটা মন আছে বটে, কিন্তু হিটলারের চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি আপন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মত বয়েস তাদের তখনো হয়নি। যাদের বয়েস তার চেয়ে বেশী তারা একদম চুপ ; কোনো কিছু বলতে চায় না। এরা যে ভয়ে মুখ খুলে না তা নয়, কারণ আমি যাদের চিনি তাদের অধিকাংশই ছিলেন সোশাল ডিমক্রেট, কিংবা ক্যাথলিক সেন্টার (আজ আডেনাওয়ার যার দলপতি) এবং হিটলার-বৈরী। ১৯৩৭।৩৮-এ বরঞ্চ এঁরা ফিসফিস করে আমার কানে কানে হিটলার রাজ্যের তীব্রতম নিন্দা করেছেন। কিন্তু আজ আর কোনো জর্মনই অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে, এটাকে নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ কি ?

আমার কোনো পাঁড় নাৎসি বন্ধু ছিল না, একজন মোলায়েম নাৎসির সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা হয়েছিল। তার সন্ধান পেলুম না। তার আমার দুজনার, অন্য এক বন্ধু বললে খুব সম্ভব মারা গিয়াছে।

তবু আমি প্রাচীন পরিচয়ের একাধিক জর্মন মিলিত হলে কথার মোড় ঐ দিকে ঘোরাতুম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হত না। পাঁচ মিনিটের ভিতর সবাই যুদ্ধ বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করত। তাতে আর যা হোক, হিটলার দর্শনের উপর নূতন কোনো আলোকপাত হত না।

একদা যারা কট্টর নাৎসি ছিল তাদের বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই নাৎসিবাদ ত্যাগ করেছে কিন্তু বেশ কিছু নাৎসি এখনো গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে—চিন্তার জগতে ; বাইরে অবশ্য আর পাঁচজনের মত তারাও দরকার হলে হিটলারের নিন্দা করে, কারণ নাৎসি-উইচ-হান্টিং, অর্থাৎ ডিনাৎসিফিকেশন এখনো শেষ হয়নি

(এই তো মাস তিনেক পূর্বে ইয়োরোপ-বিখ্যাত এক শহর-প্ল্যানার জর্মনকে ধরা হয়েছে—সে নাকি ১৯৪৫ সালে প্রায় ত্রিশজন ইটালিয়ান মজুরকে গুলী করে মারার আদেশ দেয়)। (১) এরা পুনরায় এক নূতন হিটলারের পিছনে জড়ো হবে সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুবাদ জিনিসটা একবার শিকড় গাড়লে সমূলে সম্পূর্ণ বিনাশ পায় না—হিটলারকে জর্মনি যেভাবে পূজা করেছে আমাদের চরম কর্তাভজারাও এতখানি করেনি।

উপস্থিত এদের কথাও কেউ শুনবে না—অবশ্য সাহস তাদের এখনো হয়নি, হতে হলে বেশ কিছুদিন লাগবে। কারণ জর্মনি এখনো অবসন্ন। রাজনৈতিক উত্তেজনা তার যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।

---

(১) ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্মনিতে একটি কেন্দ্রীয় বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একমাত্র কাজ পাঁড় নাৎসিদের ধরে সাজা দেওয়া। এর পূর্বে জর্মনির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেখানকার সাধারণ বিচারালয়ে এদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলতো। এদের প্রধান অসুবিধা : যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পূর্ব থেকেই ঘড়েল নাৎসিরা 'খাঁটি', 'অকৃত্রিম' সরকারী পাসপোর্ট জাল নামে তৈরী করিয়ে নেয়। এবং এখন আপন বাসভূমি থেকে—জর্মনিতেই—গা ঢাকা দিয়ে বসবাস করছে। দ্বিতীয় অসুবিধা : একাধিক পরদেশী রাষ্ট্র তাদের দেশে আশ্রয়প্রাপ্ত নাৎসিদের ধরে ধরে জর্মনিকে ফেরৎ দেয় না।

হালে জর্মনির বেতার কেন্দ্রের প্রশ্নে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চীফ জাস্টিস বলেন, এই প্রতিষ্ঠান কবে গুটনো হবে তার স্থিরতা নেই।

নব-হিটলার

আত্তিলা, চেঙ্গিস, নাদির যখন রক্তের বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন, তখন অসহায় মানব সন্তান কাতরকণ্ঠে রুদ্রকে স্মরণ করে তাঁর দক্ষিণ মুখের কামনা করেছে, কিংবা হয়ত ভগবানকে অভিসম্পাত দিয়েছে। কিন্তু সাহস করে এ-আশা করতে পারেনি, ভবিষ্যতের আত্তিলা নাদিরকে ঠেকানো যায় কি প্রকারে?

আজ কিন্তু মানুষের চিন্তা, এমন কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে আবার যেন আরেকটা হিটলার দেখা না দিতে পারে? কারণ এই 'সুসভ্য' বিংশ শতাব্দীতে হিটলার যে রক্তপাত করে গেলেন, তার সামনে খুব সম্ভব চেঙ্গিস নাদির হার মানেন। তাই আমি যে হিটলার নিয়ে আলোচনা করি সেটা কিছু একাডেমিক ইন্‌ট্রেস্ট্‌ নয়—অর্থাৎ 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান নয়',—(১) সমস্যাটা শত লক্ষ নিরীহ মানুষের জীবনমরণ নিয়ে।

হিটলারকে আমি যে বিশেষ করে বেছে নিয়েছি তার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি এমন সব 'কীর্তিকর্ম' করে গেছেন যা আত্তিলা চেঙ্গিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বোধ হয় রুদ্রের 'নবমাবতার' হিটলারের পর 'দশমাবতার' চীনের গোকুলে বাড়ছেন—নেফার সংবাদ থেকে আমার এই অনুমানটি হয়েছে)। এখানে সামান্য একটি উদাহরণ দি। পাঠককে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—অপরাধ নেবেন না—এটা অন্ধের অশ্বডিম্বের অনুসন্ধান নয়।

---

(১) আমার শব্দগুলো ঠিক মনে নেই তবে শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বোধ হয় মোটামুটি এই বলেছেন:

The search of a blind man in a dark night for a black cat —which is not there.

চেঙ্গিস নাদির যখন কোনো শহর দখল করে পাইকারি কচু-কাটার হুকুম দিতেন তখন দেখা যেত তাঁদের সৈন্যরা তলোয়ার দিয়ে যুবা-বৃদ্ধ-শিশুর গলা কেটে কেটে শেষটায় হয়রান হয়ে গিয়ে ক্ষান্ত দিত; শুধু তাই নয়, যুদ্ধের উত্তেজনাহীন-আপন-জীবনমরণ-সমস্যাবিহীন এরকম একটানা কচুকাটা কেটে কেটে তাদের এক অদ্ভুত মানসিক অবসাদ দেখা দিত, যার ফলে নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু—পিপাসারও তো একটা সীমা আছে—বর্বরও নিস্তেজ হয়ে যেত। এ তত্ত্বটি বুঝতে হিটলারের বেশী সময় লাগেনি। হিটলার, হিমলার, হাইড্রিষ··· আইষ্‌ম্যান (২) গোড়ার থেকেই লক্ষ্য করলেন যে যদিও বাছাই বাছাই ব্ল্যাক কোট পল্টনের পর-পীড়ন-উল্লাসী (স্যাডিস্ট)দের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বালবৃদ্ধবনিতা ইহুদিদের গুলি করে মারার—তারাও শেষ পর্যন্ত মানসিক অবসাদের স্নায়বিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন হিটলার হিমলার বের করলেন এক নয়া কল—যে কল চেঙ্গিস নাদিরের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না, কারণ সে যুগে বিজ্ঞান তার বাল্যাবস্থায়। বিরাট এক একখানা এ্যারটাইট ঘরে ইহুদিদের ঢুকিয়ে দিয়ে ছাতের উপর থেকে ভেন্টিলেটরপানা ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট এক টিন বিষে-ঠাসা গ্যাস ফেলে দেওয়া হত—দশ মিনিটেই ঘরের সব-কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা। এতে করে যে গ্যাসের টিনটা ফেলল তার কোনো মারাত্মক স্নায়বিক 'ঝামেলা' হওয়ার কথা নয়।

হালে আইষমান সম্বন্ধে একখানা বাঙলা বই পড়েছিলুম। তাতে লেখক বলেছেন, পাঁচ লক্ষ ইহুদির প্রাণহরণের জন্য হিটলার সম্প্রদায়

(২) পাঠক ভাববেন না, পরবর্তী যুগে ইহুদিরা আর কাউকে না পেয়ে চুনোপুঁটি আইষমানকে বলির পাঁঠা (স্কেপ-গোট্) বানিয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করেছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে যখন আইষমান দক্ষিণ আমেরিকায় অজ্ঞাতবাসে তখন প্রকাশিত জর্মন এনসাইক্লোপীডিয়ায় 'ইহুদি' অনুচ্ছেদে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থকর্তাগণ অবশ্য যদি জানতেন যে আইষম্যান তখনো জীবিত তা হলে হয়তো নামটা উল্লেখ করার আগে আরেকবার চিন্তা করে নিতেন।

দায়ী। পাঁচ লাখ নয়, হবে পঞ্চাশ লাখ। ফাইভ মিলিয়ন পাঁচ লাখ নয়। হয়তো লেখক আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন, পঞ্চাশ লাখ কি কি করে হয়—এত অসংখ্য লোক মেরে ফেলা অসম্ভব—পাঁচ লাখই হবে। আমরাও আশ্চর্য হই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একাধিক সহানুভূতিশীল এবং একাধিক নিরপেক্ষ জন বহু গবেষণার পর যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার থেকে দেখা যায়, আমেরিকার প্রকাশিত হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ আঠাত্তর হাজার, প্যারিসের হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার, লণ্ডনের হিসেবে চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। অন্য আরেক হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বুই হাজার। নাৎসিরা যে-সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি সেগুলো ন্যুরনবের্গের মোকদ্দমায় মিত্রপক্ষ পেশ করেন। সেগুলো থেকেই অনায়াসে চল্লিশ লক্ষের হিসেবে পৌঁছন যায় (আত্মহত্যা, অনাহার ও অকালরোগে যারা মরেছে তাদের হিসেব এতে বা অন্যান্য হিসেবে ধরা হয়নি)।

তাই আমি হিটলারকেই বেছে নিয়েছি। আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন, এই বিরাট নরমেধ যজ্ঞ কি আবার অনুষ্ঠিত হতে পারে? কিংবা বিরাটতর?—এটম বমে যখন হাত বাড়ন্ত নয়? সে সম্ভাবনা যদি থাকে তবে আগে ভাগে সময় থাকতে এমন কোনো এক কিংবা একাধিক ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে কি গ্রহণ করা যায়?

চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি, আরেক হিটলার খাড়া হয়ে উঠছেন। এবং ইনি হিটলারেরও বাড়া। কারণ হিটলার মেরেছেন প্রধানত ইহুদিদের, এবং শেষের দিকে যুদ্ধে পরাজয়ের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়ে হন্যে হয়ে গিয়ে জর্মন জাতকে—১৩।১৪ বছরের বালকরাও বাদ যায়নি—পাঠিয়েছেন রণক্ষেত্রে, জয়ের আশা যখন সমূলে নির্মূল হয়ে গিয়েছে তখনো। আর এই চৈনিক নব হিটলার গোড়ার থেকেই পাঠাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ চীন যুবককে লস্ অব ম্যান পাওয়ারের কোনো চিন্তা বিবেচনা না করে। আমাদের অফিসাররাই

বলেছেন, ওরা নেমে আসে একেবারে পিঁপড়ের মত। আফটার অল্ হাউ মেনি আর ইউ গোয়িং টু কিল্, হাউ মেনি ক্যান ইউ কিল্! আমি শুনেছি, কোরিয়াতেও চীনেরা এইভাবে নেমে এসেছিল। শুনেছি, প্রথম সারির হাতে বন্দুক থাকে, দ্বিতীয় সারির হাতে তাও না। শত্রুপক্ষ প্রথম সারিকে কচুকাটা (মো ডাউন, আমি শব্দার্থে 'কচুকাটা' বলছি, কারণ এদের ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে মেশিন গানের মোকাবেলা করতে, তাতে করে সামান্য একটা ঘাটি দখল করতে কত হাজার আপন সৈন্য অযথা মারা গেল বিলকুল তার কোনো পরওয়া না করে) করে ফেললে দ্বিতীয় সারি সেই সব বন্দুক তুলে নিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কচুকাটা হয়। কোরিয়াতে নাকি একটা সুরক্ষিত ঘাটি থেকে শ' তিনেক মার্কিন সেপাই—এখানেও মেশিনগান বনাম রাইফেল—চানাদের কচুকাটা করতে করতে শেষটায় তাদের প্রায় নার্ভাস্ ব্রেকডাউন্ হতে চললে কমাণ্ডার আদেশ দেন, ঘাটি ত্যাগ করে পিছনে হটে যেতে। অর্থাৎ যেখানে লস্ অব ম্যানপাওয়ার সম্বন্ধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুযুধান নব হিটলার অগ্রসর হতে চান সেখানে তার উপস্থিত জয় হবে, কিন্তু আখেরে সমূলস্ত বিনশ্যতি—কিন্তু অগণিত আপনজন ও বিস্তর পরজনকে মৃত্যু, অনাহার, মহামারার কবলে তুলে ধরে ও বহু বহু গৃহে শোকের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়ে।

হিটলারের একাধিক সেনানায়ক শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর বলেন, 'যেদিন আমি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করলুম, লস্ অব্ জর্মন মেন-পাওয়ার হিটলার আর হিসেবে নেন না সেদিন থেকেই আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা আরম্ভ করি।' স্তালিনগ্রাদে পাউলুস তাই করেছিলেন—যদিও হিটলারের কড়া হুকুম ছিল কচুকাটা হয়ে মরার। স্পের কলকারখানা, পুল ধ্বংশ করতে নারাজ হয়েছিলেন ও মোডেলের মত একাধিক সেনানায়ক আত্মহত্যা বরণ করেন।

মৃত্যুর আঠাশদিন পূর্বে হিটলার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। চীন যে একদিন মারমূর্তি ধারণ করবে সেটা তিনি জানতেন। তবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এ তত্ত্বটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি বলেছিলেন, From the point view of both justice & history they (চীনারা) will have exactly the same arguments, or lack of arguments to support their invasion of the American continent as had the Europeans in the sixteenth century. Their vast and undernourished masses will confer on them the sole right that history recognizes—the right of starving people to assuage their hunger—provided always that their claim is well backed by force.

হিটলারের এই শেষ ভবিষ্যদ্বাণী। এরপর তিনি কিছু বলে থাকলে সেটা আমাদের কাছে পৌঁছয়নি।

হিটলারের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ এক মত নই। তিনি মনে করেছিলেন, রুশ এবং মার্কিনে লড়াই লাগবে। ফলে আমেরিকা ছারখার হবে। তখন চীনারা সে দেশ দখল করবে। সেই দখল করার ভিতর অন্যায় বা অধর্ম কিছু নাই। কারণ ইতিহাস মাত্র একটি সত্য স্বীকার করে—ক্ষুধিত পঙ্গপালের মত যে জনসমাজ কাতর সে যত্রতত্র বেদখলী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার হক ধরে।

অর্থাৎ হিটলারের মতে ইতিহাস ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে না। আমরা করি। শাস্ত্রে আছে,

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, মঙ্গল দেখা যায়, শত্রু (সপত্ন=প্রতিদ্বন্দ্বী, সপত্নী এরই স্ত্রীলিঙ্গ এবং বাঙলায় চলিত) পরাজিত হয়, কিন্তু সমূলে বিনাশ পেতে হয়

এই তত্ত্বকথাটি অভিজ্ঞতাপ্রসূত—আ পস্তেরিয়োরি—এবং অভিজ্ঞতা থেকে নীতিসূত্র বের করা ইতিহাসের কর্ম, অথবা ইতিহাসের দর্শন (ফিলজফি অব হিষ্ট্রি) এটি করে।

হিটলার ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ইত্যাদি এমন কি রুশের বহুলাংশ জয় করতে ভদ্র, মঙ্গল দেখেছিলেন, সপত্নগণকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু বিনাশ যখন এল তখন সেটা সর্বস্ব সমূলে উৎপাটন করলো।

এর আরেকটি গৌণ অর্থ আছে। আমরা যে ছোটখাট পাপ, অবিচার করে থাকি তার জন্য এই পৃথিবীতেই অল্পস্বল্প সাজা পাই— কারণ আমরা হিটলার কিংবা লাই সায়েবের মত ডাঙর প্রাণী নই। আমাদের বিনাশ সমূলে হয় না। কিন্তু ওদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আদ্যন্ত গৌরবময় নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুধার তাড়নায় বা অন্য কোনো কারণেই স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে পররাজ্য আক্রমণ করিনি।

বড়া হিটলার, চোটা হিটলারদের ডরাবার কারণ নেই।

কিন্তু বারুদ শুকনো রাখতে হবে।

হাসির অ-আ-ক-খ

॥ ১ ॥

হাসির অ-আ, ক-খ।

হাসির 'চুটকিলা' (উইট্, হিউমার, এনেকডোট) নিয়ে যে-সব সঙ্কলন বেরোয়, সেগুলো বেশীর ভাগ আপনার আমার মত সাধারণ জনই করে থাকে। অবশ্য এদের নির্মাতারা, অর্থাৎ যারা সব উইট্ বা রসিকতা প্রথম পাঁচজনকে হাসিয়ে কিংবা একজনকে চটিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ওয়াইল্ডের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কিংবা হুইস্লারের মত চিত্রকর নন। আবার এ-কথাও অতি সত্য যে, বেশীর ভাগ চুটকিলাই অতি সাধারণ জনই করে থাকে—সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, এমনকি, সমাজেও তাঁরা বিখ্যাত নন। পাড়ার চায়ের দোকানে যে-লোক রসিয়ে গল্প ব'লে, কারো কথার উত্তরে হাজির-জবাব দিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে মারে, সে-লোকটি দোকানের বাইরে হয়তো কোনো-কিছুতেই সার্থক হয়নি—হয়তো বা পাড়ার মুরুব্বি তাঁকে 'বিশ্ব-বকাটে' পদবী দিয়ে বসে আছেন, কারণ চায়ের দোকান থেকে ছেলের মারফত থ গৃহিণী তাঁর কয়েকটি রসিকতা তাঁর কানে এসে পৌঁচেছে, এবং হয়তো বা তারই দু-একটি মুরুব্বিটিকে নিয়েই।

অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ চুটকিলা নির্মাণ করেছে এরাই। লোকমুখে ঘুরে ফিরে এ দেশ ও দেশ হয়ে হয়ে বিশ্বময় এরা ছড়িয়ে পড়ে। বরঞ্চ ওরই মত যে-লোক-সঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের ও নির্মাতার সন্ধান কোনো-কোনো স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বৃহৎ অংশের মূল অনুসন্ধান কেউ করে না, করে কোনো লাভও নেই।

লোকসঙ্গীত, রূপকথার মত এইসব হাসির চুটকিলার স্রষ্টিকর্তা

প্রধানত জনগণ। অবশ্য গুণী, জ্ঞানী, রসিক সাহিত্যিকরাও এতে আপন আপন মৃদুহাস্য, অট্টহাস্য, বিদ্রূপ ব্যঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছেন।

তা ছাড়া এমন সব ঘটনাও ঘটে, যা দেখে বা শুনে মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যারা ঘটনাটা দেখলো বা শুনলো, তাদের কারো একজনের সামান্যতম রসবোধ থাকলে এবং সে ঘটনাটি 'ব্রডকাস্ট' করলেই হল। যেমন, আইনস্টাইনের গৃহিণী ছিলেন অতিশয় সরল নারী (১)। কী-এক পরব উপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে একা গেছেন আমেরিকার বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে দৈত্য-দানবের মত ভীষণ-দর্শন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি। বিমূঢ়ের মত এটা-সেটা দেখতে দেখতে একজন কর্তা ব্যক্তিকে তিনি শুধোলেন 'এগুলো—এগুলো দিয়ে কি হয়?' কর্তাব্যক্তি বিগলিত হয়ে সুমধুর মৃদুহাস্য হেসে মুরুব্বির সুরে বললেন, 'কেন ম্যাডাম, এইসব যন্ত্রপাতি দিয়েই তো আপনার স্বনামধন্য স্বামীর সব থিয়োরি সপ্রমাণ করা হয়।' ম্যাডাম তো 'দশ হাত বরফ-পানিমে'। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কিন্তু, কিন্তু, আমার স্বামী তো এসব টোকেন পুরনো খামের উল্টো দিকে!'

এ গল্প বানানোর ভিতর কারো কোনো কেরদানী নেই।

এই রকম দুনিয়ার যত রকমে হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, তারই একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন জর্মনির এক উত্তম সাহিত্যিক। পূর্বেই বলেছি, সাধারণত এরকম সঙ্কলন করে থাকেন আপনার আমার মত সাধারণ জন, তাই সঙ্কলনগুলো অসাধারণ হয় না। এটা অবশ্য একটা paradox পূর্বে যখন বলেছি, পৃথিবীর বেশীর ভাগ চুটকিলাই নির্মাণ করে সাধারণ জন, তখন তার সঙ্কলন করবে সাধারণ জন—এতো বাঙলা কথা। কিন্তু এইখানেই প্যারাডকস।

(১) এঁর সরল হৃদয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও আমাদের ছেলেবেলায় কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বারান্তরে সে-কথা হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে।' এক ইরানী কবিও বলেছেন, 'যে-শুক্তি মুক্তোর জন্ম দিয়েছে আপন প্রাণরস দিয়ে, সে-শুক্তিকে তো মুক্তার মূল্যবিচারের সময় ডাকা হয় না—ডাকা হয় জহুরীকে।' কিংবা বলতে পারি, নেপোলিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী যে তাঁর জননীই লিখবেন, এমন কোনো কথা নয়।

বর্তমান পুস্তকের নাম, 'আ, বে ৎসে ডেস লাখেনস্'—'হাসির অ-আ, ক-খ। (এক্স ওয়াই জেড—যদি কখনো বেরয়, তবে 'দেশে'র পাঠককে জানাব।) লেখকের নাম জিগিসমুণ্ট ফন রাডেকি। ল্যাটাভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে এঁর জন্ম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। পড়াশুনা করেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, পরে এঞ্জিনীয়ারিং পাস করেন জর্মনিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা কাটান তুর্কিস্থানে এঞ্জিনীয়ার রূপেই। সাহিত্য-রস কিন্তু বরাবর ছিল। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিনে আসার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা চিত্রকার এবং সাহিত্যিকরূপে। উত্তম ইংরিজী জানেন। জি কে চেস্টারটনের ইনি পরম ভক্ত এবং হিলের বেলকের উৎকৃষ্ট জর্মন অনুবাদ তিনি করেছেন—যদিও জর্মনীতে অনুবাদকরূপে তাঁর সর্বোত্তম খ্যাতি রুশ ঔপন্যাসিক গগলের বই জর্মনে তর্জমা করার ফলে।

এ'র জীবনীকার বলেন, রাডেকির বীণার প্রচুর কোমল এবং অতিকোমল। তাঁর প্রতিটি ধ্বনিতে তত্ত্ব-দার্শনিকের ক্ষীণ মধুর মৃদুহাস্য।

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপায় ক্লাসিকস্ নখাগ্র-দর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সঙ্কলন 'হাসির অ-আ, ক-খ, সত্যই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালা-কত্তাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগিপিয়ানো কোনো যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'-একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সঙ্কলনটি আপনি

যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনো লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না হতে পারে, আপনার সঙ্কলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সঙ্কলনের সঙ্কলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নাই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিস্‌মিল্লা করি ঃ—

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনো কোনো মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেণ্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই জলও কম, আর খাবার সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অপিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন—শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম্— আজ ডিনারে তা হলে কর্নড বীফ।'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্‌নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ মরি! ওয়াটসন।'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'একথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা হোমস্‌পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানত তাঁদের জন্যই! আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকম্বা। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

হাসির অ আ, ক খ।

সিগিসমুণ্ট্ ফন রাডেকি তাঁর হাস্য-রস সঙ্কলনের পুস্তিকায় একটি ক্ষুদ্র অবতরণিকা দিয়েছেন। সে অবতরণিকায় আর পাঁচজন মোকা-বেমোকা-উদাসীন জর্মনের মত তিনি পাণ্ডিত্য ফলাতে যাননি। জর্মনদের যে পাণ্ডিত্য ফলাবার ব্যামোটা আছে সে-বিষয়ে স্বয়ং জর্মনরাই সচেতন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা যে-রকম হক না-হক গল্প বানাই—মারোয়াড়ীদের পয়সার লোভ, পূর্ববঙ্গবাসীদের খামোখা চটে যাওয়া নিয়ে—ইয়োরোপীয়েরাও সে রকম করে থাকে। গ্যোরিঙ যখন ন্যুরমবের্গ মোকদ্দমার জন্য সেখানকার হাজতে তখন তিনি মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ কেলিকে নিম্নের চুটকিলাটি বলেন ঃ

একজন ইংরেজ—একটা আস্ত ইডিয়ট। দুজন ইংরেজ একত্র হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লাবের পত্তন। তিনজন হলে নূতন এক সাম্রাজ্যজয়।

একজন ইতালিয়ান—উত্তম গাইয়ে। দু'জন হলে ডুয়েট! তিনজন হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন। (এটা যে কি রকম খাঁটি কথা সেটা গত বিশ্বযুদ্ধে বারবার সপ্রমাণ হয়েছে)।

একজন জর্মন, পণ্ডিত। (১) দুজন জর্মন—একটা রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে বসবে। তিনজন হলে যুদ্ধ ঘোষণা।

---

(১) রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'জার্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই।' এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে 'জর্মন' লিখতেন—যদিও এখানে 'জার্মান' লিখেছেন। হালে জনৈক পত্র লেখক 'জর্মন' লেখায় জন্য আমাকে বিদ্রূপ করেছেন বলে এ-কথাটি বলতে হল। 'জর্মন' লেখার অন্য কারণও অবশ্য আছে।

অন্যান্য জাতও গ্যোরিঙের গল্পে স্থান পেয়েছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে উপস্থিত আমাদের প্রয়োজন নেই। তা সে যা-ই হক রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় অহেতুক পাণ্ডিত্য ফলাননি।

'ইহ সংসারে আমাদের কত জিনিসেরই না অভাব, এবং তাই নিয়ে একমাত্র মানুষই রোদন করে কিন্তু ঐ অভাবের ক্ষতি পূরণ হিসেবে একমাত্র মানুষই হাসতে জানে। মানুষের যে দেহাতীত সত্তা আছে সে-ই আমাদের দেহ থেকে অশ্রুজল ঝরায় এবং সে-ই আমাদের দেহের ত্বপাশ এবং ভুঁড়ি ছুলিয়ে দিয়ে হাসায়। কিন্তু এই পৃথিবীতে সে জিনিস কি, যা হাস্যকৌতুক রসের সৃষ্টি করে?'

উত্তরে রাডেকি বলছেন, 'সব, সব-কিছুই'''যেমন সব কিছুই কাঁদাতেও পারে। তারা, ফুল, পশুপক্ষী এদের নিজেদের সত্তা দিয়ে কৌতুক-রস সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া মাত্রই এগুলো কৌতুকরসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে—কারণ এই মানুষই বিশ্বসংসারের হাসি এবং কান্নার কেন্দ্র। কারণ এই মানুষ নির্মিত হয়েছে অর্ধেক পশু থেকে এবং অর্ধেক চৈতন্য দিয়ে। এই যে কাদামাটি আর সৃষ্টিকর্তার মুখের ফুঁ দিয়ে তৈরী মানুষ—তার হাসি এবং কান্না উভয়ের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার খেলে মানুষ কাঁদে—এ কান্না অতি সাধারণ সরল,—আর গভীর মনোবেদনায় যখন মানুষ কাঁদে তখন তার সে-রোদন সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। হাসির বেলাও তাই। মানুষ যখন ফুর্তিতে থাকে তখন সে হাসে কিন্তু কৌতুক রসের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষ অকস্মাৎ যে অট্টহাস্য করে ওঠে সে ভিন্ন হাসি। কিন্তু ফুর্তিতে থাকলেই যে কৌতুকের সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা নয়। সেখানে মানুষ হাসে সে ফুর্তিতে আছে বলে, আর এ স্থলে তার উল্টোটা—এ স্থলে মানুষ হেসে ফুর্তি পায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে রাডেকির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন! তিনি বলছেন, 'সুখে (অর্থাৎ যখন ফুর্তিতে আনন্দে আরামে—লেখক) আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া

উঠি। একটি আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক !' এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরেকটি তত্ত্বও যোগ দিয়েছেন—'আমি বোধ করি, যে কারণ ভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য ও কৌতুকহাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।' (২)

আর বর্তমান লেখক শুধোয় তাহলে বেদনাজনিত অট্টহাস্যও কি ঐ একই পর্যায়ে পড়বে ? কিংবা দেখবো, আকাশের জল, চোখের জল আর গোলাপের জল একই কারণে ঝরছে ?

মূল কথায় ফিরে যাই। রাডেকি বলেছেন, 'একদা সর্বপ্রকারের কাব্যই আবৃত্তি করা হত কিংবা গাওয়া হত। এর বহু পরে মানুষ এগুলো লিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলো। এবং এরও পরে ছাপাখানায় সে কৃষ্ণমৃত্যু প্রাপ্ত হল (আমরা বলবো মা কালী কালির চরণাশ্রয় পেল) এবং আজ সে শুধু মানুষের চিত্তাকাশেই জাগরিত হতে পারে। একমাত্র কৌতুকরসই এখনো মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপাখানায় সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না। এ যেন কলকল উচ্চহাস্যে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঝরণা—মাঝে মাঝে এক পাশে গুটি কয়েক পাথরের মাঝখানে যে সে স্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই হল তার ছাপায় প্রকাশিত রূপ, কিন্তু সে অতি সামান্য এবং তার উদ্দাম

---

(২) পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড ৬১৭। পঞ্চভূত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। তারপর ১৩২৮ এবং ১৩৩৩-এর মাঝামাঝি কোনো সময়ে "আমরা হাসি কেন ?" এই নিয়ে বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় আলোচনা করেন। তার অনুলেখন আমার কাছে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য আরো বহু অনুলেখনের সঙ্গে এটিও কাবুল বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। সে-সভায় ক্ষিতিমোহন সেন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কিংবা হয়তো ঐ সময়কার "শান্তিনিকেতন" পত্রিকায় এর অনুলেখন পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে জনৈক লেখক একটি অত্যুত্তম প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন, হাস্যের কারণ সম্বন্ধে আঁরি বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বের্গসোঁর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

গতিবেগকে কণামাত্র ব্যাহত করে না। এবং অন্য সর্ব কাব্যকলা যেমন যেমন ছাপার গোরস্তানে নীরব হতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক কথিকা এগুলো নিজের ভিতর সংহরণ করে তাদের পুনর্জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলো। তাই কৌতুক-কথিকা চুটকিলা কখনো বা কথক ঠাকুরের রূপকথা, কখনো বা (বিষ্ণু শর্মার) উপকথা, দশছত্রের উপন্যাস, কাহিনী, কবিতা এমন কি রোমাঞ্চকর নাট্য। সংবাদপত্রের শক্তি এ ধরে এবং কয়েকটি শব্দের সাহায্যে যত্রতত্র যখন তখন এক লহমায় নাট্যশালার বাতাবরণ সে সৃষ্টি করতে পারে। সে একাধারে রাজদূত-লোকদূত চারণ এবং নাট্যকার। কৌতুক-কথিকা হাস্য-গাথা রচনা পেশাদারের একচেটিয়া নয়, বরঞ্চ বলতে হবে এটি পাঞ্চজন্য রসসৃষ্টি। "হাস্যরস-লেখক বলতে যা বোঝায় তাঁদের মত একটি ছত্র না লিখেও মানুষ তার জীবনে হাস্যরস সঞ্চয় করতে পারে ও সৃষ্টি করতে পারে—"জ্যাঁ পল বলেন।'

লোকমুখে এই হাস্যরস সৃষ্টির ঐতিহ্য বেঁচে রইল কি করে ?

রাডেকি বলেন. 'সমাজের বাঙ্ময় রূপ নিত্য প্রয়োজনীয়। স্ফুট বাক্য দ্বারা মানুষ আপন মনের চিন্তা হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। তার লীলাভূমি—রাজনৈতিক সভা-সমিতি, থিয়েটার, বারোয়ারী পূজা ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচেতনা প্রকাশ পায় তখনই যখন রামাশ্যামা সবাই সমান অংশীদার হয়ে হাস্যকলার সৃষ্টি করে। (এস্থলে বর্তমান লেখকের টীকা শুধু তাই নয়, এখানে গণতন্ত্রের এমনই কট্টরতা যে অতি সাধারণ জনও আকছারই ছোট্ট একটি টিপ্পনী কেটে গেরেমভারী মাতব্বরজনকে ডিগবাজি খাইয়ে দেয়)।' তারপর রাডেকি এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে :—'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে!'

আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ

আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাইনে। কিন্তু সবাই যদি এক সঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অতি অবশ্যই যাই।

এ বড় অদ্ভুত সমস্যা। দুঃখ-বেদনা আমরা দেখতে চাইনে কিন্তু কাব্যে ঠিক সেই জিনিসটেই আমরা খুঁজি।

কৌতুক-হাস্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও 'পঞ্চভূতে' লিখেছেন, 'রামায়ণের সীতা বিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত।' এতখানি বলার রবীন্দ্রনাথ সূত্র দিচ্ছেন 'বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি।' আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবে তিনি যে কারণ দিয়েছেন—'কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে'—সেখানে সবাই একমত নাও হতে পারেন।

আজ যে বাঙলা দেশে রাজশেখরের এত খ্যাতি তার কারণ 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়—তার কারণ তাঁর 'চলন্তিকা', রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ, হয়তো বা তাঁর প্রবন্ধাবলী। যদিও আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর হাস্যরস অতুলনীয়, কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবার মত—তা সে শ্রেষ্ঠতর কিংবা নিকৃষ্টতরই হক—লেখন বাঙলা দেশে আছে। চলন্তিকার চেয়ে ভালো অভিধান ইংরিজীতে আছে কিন্তু হাস্যরসিক রাজশেখর জেকব, জেরম, উডহাউসের বহু বহু উর্ধ্বে।

তা সে যাক্। কিন্তু এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবং আমরাও

স্বীকার করলুম, 'দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি'—তাই যদি হয় তবে ফিলিমওলারা কেন বলেন ট্রাজেডি অচল, দর্শক কমেডি দেখতে চায়, এবং শুধু এ-দেশে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি অল্প বিস্তর তাই ?

তার কারণ বোধ হয় এক হতে পারে যে শিশুর রূপকথা কখনো ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয় না, এবং যেহেতুক সিনেমা-দেখনেওলারা ত্রিশ বছর বয়সেও শিশু মন ধরেন তাই তাঁরা ট্রাজেডি পছন্দ করেন না। কিন্তু এস্থলে সে আলোচনা কিঞ্চিৎ অবান্তর।

* * * *

রাডেকি তাঁর অবতরণিকায় আরো অনেক মধুর এবং জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। এবং শেষ করেছেন এই বলে, 'হাস্যকথিকার (চুটকিলার) প্রাণরস কিন্তু ঐ বস্তু শব্দের মাধ্যমে বলাতে—ছাপাখানার মারফতে নয়।' তুলনা দিয়ে বলছেন, 'প্রথমটা যেন উচ্ছল প্রাণরসে সঞ্চারিত উড়ন্ত প্রজাপতি—ছাপাখানার মাল যেন পিন দিয়ে বেঁধা কাঁচের বাক্সের ভিতর মৃত প্রজাপতি।'

রাডেকি অবতরাণকা শেষ করেছেন তাই এই বলে, 'আমি হালে একটি চমৎকার রসিকতার গল্প শুনতে পেলুম। তদ্দণ্ডেই সেটি লিখে নিলুম। পরে সেটি ছাপায় প্রকাশিত হল। যিনি সেই গল্পটি বলেছিলেন সেই কথক সেটি পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ হয়েছে—কিন্তু স্বরলিপি কই ?'

অর্থাৎ এ যেন কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত না গেয়ে আবৃত্তি করে শোনালে।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী। তিনি নাকি এরই কাছাকাছি অন্য একটি তুলনা দিয়েছেন। অনুবাদ যেন কাশ্মীরী শালের উল্টো পিঠ। ডিজাইনটা বোঝা যায় কিন্তু অন্য সব কিছু লোপ পায়।

হাসি-কান্না

তরুণ লেখককে সাবধান করে দি তিনি যদি ইহজগতে অজরামর যশ অর্জন করতে চান তবে যেন তিনি হাস্যরসের বেসাতি না করে ঢালেন অঢেল করুণ রস। আর বাঙালীর হৃদয়ের উপর যদি 'জগরনটের' মত তিনি মোক্ষম আসন চেপে বসে থাকতে চান তবে যেন সেটিকে চেপটে, থেৎলে, নিংড়ে, চটকে একদম সমূচহ তিক্তের চেয়েও তেতো করে পরিবেশন করেন। দেবদাস রক্ত বমি করছে আর গাড়োয়ানকে বার বার শুধোচ্ছে আর কত বাকি, কিংবা অরক্ষণীয়ার 'সাজ' দেখে বাচ্চা বলছে, 'পিসিমা সং সেজেছে'—ছাড়ুন এ-রকম কিছু মাল, আর দেখতে হবে না, আপনি আমাদের ডিহি শ্রীরামপুর সেকেণ্ড বাইলেন কম্বল বিতরণী সভা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে 'ভায়া' মাপরা কালী বাড়ি প্রসাদ-বিতরণী সমিতি হয়ে নাক বরাবর পৌঁছে যাবেন পদ্মশ্রী, আকাদেমি প্রাইজে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আহা, বাঙালী বড্ডই কোমল হৃদয়। শুনেছি, এক বাঙালী ছোকরা লণ্ডনে বাসকালীন তিনটি বছর মাত্র অবশ্য কর্তব্য ব্যারিস্টারি ডিনারটি খাবার জন্য—ভুল বললুম, খাবার জন্য নয়, নিছক এটেণ্ড করার জন্য হস্টেল থেকে বেরতো ; ফিরে এসে ফের ধুতি গেঞ্জি পরে লেপের তলায় ঢুকে দেবদাস পড়তো আর তার তলায় যতখানি সম্ভব ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে কেঁদে কুমড়ো গড়াগড়ি দিত।

আল্লা রসূলের কসম খেয়ে আমি মুসলমানের ব্যাটা বাঙালী মুসলমান ফের বলবো, রাজশেখরের খ্যাতিপ্রতিপত্তির কারণ তাঁর 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী' নয়। তাঁর খ্যাতির কারণ, 'চলন্তিকা' এবং রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। অথচ চলন্তিকার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় অভিধান ইংরিজী জর্মনে আছে, ইংরিজীতে গ্রীক কাব্যের অনুবাদ করে একাধিক লেখক রাজশেখরকে আগের থেকেই ছাড়িয়ে বসে আছেন।

অথচ হাস্যরসে রাজশেখরের যে কৃতিত্ব তার সঙ্গে তুলনা করি কার সঙ্গে? সেরভান্তেস, মলিয়ের, জেরম, উডহাউস কেউই কাছে দাঁড়াতে পারেন না—গ্রীকের কথা তুলছিনে, সেখানে আছে ব্যঙ্গ, সেটায়ার, বিশুদ্ধ হাস্যরস নয় এবং সেগুলোও রাজশেখরের কাছে আসতে পারে না। এটা ডবল কসম খেয়ে বলছি।

বাঙলা কথা শুনুন। আপনাকে একটা সোনার মোহর দিলে আপনি খুশী হবেন, কিন্তু ভুলে যাবেন দুদিন বাদেই। ওদিকে কেউ যদি পাঁচ টাকা হাওলাত নিয়ে শোধ না করে তবে সে কলিজার ঘা দগদগ্ করবে বহু বহুকাল অবধি। শারীরিক স্তরে নেবে বলতে পারি, আপনাকে কেউ সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাতে চাইলে আপনি বিরক্ত হবেন কিন্তু কেউ যদি শরীরে পিন ফোটায় তবে মারমুখো হবেন।

আরেকটি কথা; করুণ রস বুঝতে হলে বিদ্যেবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন নেই। হাস্যরসের বেলা ভাষাজ্ঞান (বিশেষ করে 'পান্' বোঝবার বেলা), ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, অনেক-কিছুই জানতে হয়। যেমন মনে করুণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ছোট হাস্যরসের চুটকিলাটি।

একটি ছেট্ট মেয়ে ঠিকমত হাঁটতে পারছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ তার কড়ে আঙুলটি বাড়িয়ে দিলেন, সে যেন ওটি ধরে সোজা হয়ে চলে। মেয়েটি খপ করে তাঁর গোটা হাত ধরে নিলে। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'দেখলে, মেয়েকে একটি আঙুল দিয়েছ কিনা সে তখ্খুনিই পাণিগ্রহণ করতে চায়।' এ স্থলে পাণিগ্রহণের অর্থ যদি কেউ না জানে তবে সে বুঝতেই পারবে না, এর রস কোথায়।

এরই পিঠ পিঠ একটি মার্কিন রসিকতা আছে, কিন্তু অতখানি সূক্ষ্ম নয়। তারা বলে 'গিভ এ ডেম এন ইঞ্চ···এ্যাণ্ড শী উয়োন্টস টু বী এ রুলার।' মেয়েছেলেকে এক ইঞ্চি (লাই) দিয়েছ কি, সে অম্নি রুলার হতে চায়। এখানে রুলারের যে দুটো অর্থ আছে সে তত্ত্ব যদি শ্রোতার জানা না থাকে তবে সব গুড় বরবাদ।

এদেশে উত্তম ক্লাস রসিকতা করে গেছেন আরেকটি ব্যক্তি। তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—পুণ্যশ্লোক, সায়ংসন্ধ্যা স্মরণীয়। তিনি তাঁর ঠাট্টা মস্করা ছদ্মনাম, 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' নিয়ে করেছেন বলে অনেকেই এ-তত্ত্ব জানেন না। তাঁর একটি গল্প অতুলনীয়—দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী হাতের কাছে নেই। মোটামুটি যা বলেছেন তা এই, 'অমুককে আমি নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়ার পর শুনিতে পাইলাম অন্য অমুককে ইহার পূর্বেই নদীয়ার চাঁদ উপাধি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমি মহা ফাঁপরে পড়িলাম--কারণ আকাশে এক সঙ্গে দুইটি চাঁদ কখনই দেখা যায় না। এক্ষণে এই উপাধি লইয়া দুইজনে হাতাহাতি গুতাগুঁতি হউক তাহা আমি চাহি না। বিদ্যা-বুদ্ধিতে অবশ্য দুইজনই একই প্রকার (অর্থাৎ দুটোই আস্ত পাঁঠা—লেখক)। অতএব, স্থির করিয়াছি, আকাশের চাঁদটি লইয়া, সেইটিকে দুই ভাগ করিয়া, দুইজনকে দুইটি অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিব।'

অর্ধচন্দ্র এস্থলে কেউ যদি শুধু 'ক্রেজ্‌ন্ট্‌ মূন' অর্থে নেন তা হলেই তো চিত্তির!

এ-পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত হই-চই হয়েছে—অর্থাৎ ধর্ম যে রকম সম্মান পেয়েছে সে-রকম গালাগাল খেয়েছেও সে বিস্তর—অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ে অতখানি হয়েছে বলে জানিনে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকখানি খুঁটিনাটি না জানলে তাদের নিয়ে একে অন্যকে যে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছে সেগুলো ঠিকমত রসিয়ে রসিয়ে চাখা যায় না।

প্রথম একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দি।

'মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্।' শ্রীযুত সুশীল দে এটিকে 'বাঘে মোষে (রাজায় রাজায়) যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়' এরই সমার্থে ধরেছেন। শ্রীযুত দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থখানা রচনা করে আমাদের যে কী উপকার সাধন করেছেন সেটি অবর্ণনীয়;

কাজেই আমি যদি এ-স্থলে আমার জানা অন্য অর্থটি নিবেদন করি তবে তাঁর পাণ্ডিত্যজ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হবে না।

মোল্লাকে কড়া কথা শোনালে বা তার উপর চোটপাট করলে সে তো আর জমিদার নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার দাদ নেবে। সে বেচারী ছুটে যায় মসজিদে। সেখানে গিয়ে আল্লার কাছে সে তার ফরিয়াদ জানায় ও অপরাধীর সাজা কামনা করে। কিন্তু কথায় বলে, 'শকুনের শাপে কি গরু মরে' (সুশীল দে, ৭৮১১)—অপরাধীর কিছুই হয় না। মোদ্দা কথা তা হলে দাঁড়ায়, মোল্লার আর কী মুরদ! সে ঐ মসজিদ তক্ ছুটে গিয়ে চেল্লাচেল্লি মাত্রই করতে জানে; তাতে কারো ক্ষয়ক্ষতি হয় না।

ঠিক ঐ রকম শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়াঝাঁটি জানা না থাকলে নিচেরটার বুঝবেন কি করে?

(শাক্ত-বৈষ্ণব উভয়ের কাছে সবিনয় ক্ষমা-ভিক্ষা করতঃ)

বৈষ্ণব: আচ্ছা, ভাই তোমরা তো বলো, 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'-তবে পাঁঠাটাকে যখন বলি দাও তখন তার ভিতরের 'শক্তিটাকে' কি বলি দেওয়া হয় না? লক্ষ্য করোনি পাঁঠার কী অসাধারণ প্রাণশক্তি—লম্ফঝম্ফ!'

শাক্ত: না, ভাই, তা নয়। পাঁঠাকে যখন ধরে বেঁধে হাড়িকাঠে পুরি তখন সে নির্জীব। তখন আর তার শক্তি কই? আছে শুধু চৈতন্য। তখন শুধু ওইটুকুকেই বলি দি।

এ বছরে প্রতিটি লেখার সময় স্বামীজীর কথা মনে পড়ে। তিনি যে শুষ্ককাষ্ঠ অরসিকজন ছিলেন না সেইটে এই সুবাদে মনে পড়ল। নিম্নের রসিকতাটি ঈষৎ দীর্ঘ কিন্তু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দীর্ঘতর শুনতেও কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

(মুসলমানদের শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে গোস্তাকীর বেহদ্ মাফ চেয়ে)

'লক্ষ্ণৌ শহরে মহরমের বড় ধুম। বড় মসজেদ ইমামবাড়ায় ঝাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে। বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু-মুসলমান, কেরানী, য়াহুদী ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ মিয়াদের রাজধানী। আজ হজরত হাসান-হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতি ফাটান মরসিয়ার কাতরানি কার না হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের—যেমন পাঁড়াগেয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ।

যে মোসলমনি সভ্যতা, কাফগাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় ত ফাটুক পার হয়ে মসজেদের মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ্ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসান-হোসেনকে মেরে ফেলে; তাই আজ এ রোদন, শোক প্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ ত নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টা সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদগদ স্বরে স্তুতি—"ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি? অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল বাবা অজিদ্ দেবতা তো তুঁহি

হায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক্ রোবত। (ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে !!")'। (১)

রস তো পেলেনই, কিন্তু পাঠক স্বামীজীর গল্প বলার টেকনিকটি লক্ষ্য করুন ॥

---

(১) বেসুমার=অগুনতি ; আদমশুমারী তুলনীয়। মর্সিয়া=শোকগীতি। কাফগাফের উচ্চারণ=কাফ আরবী বর্ণমালার অক্ষর। আরব ইহুদী ছাড়া অন্যের পক্ষে উচ্চারণ কঠিন। গাফ উচ্চারণ সহজ। তবে কাফ-গাফ সংযুক্তভাবে সমষ্টি অর্থে ব্যবহার হয়। জবান=ভাষা। আবা কাবা=ঝোলা জামা। চুস্ত=টাইট। তাজ মোড়াসা=বাঁধা তৈরী পাগড়ি। শহরপসন্দ=শহরের সকলই যে বস্তু পছন্দ করে। জমামরদ=জওয়ান মর্দ। ইয়েজিদ=আজকাল এজিদই লেখা হয়, কিন্তু ইয়েজিদ মূল উচ্চারণের অনেক নিকটবর্তী।

রসিকতা

হাসতে হয়, না হেসে উপায় নেই। এমন কি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তের' নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণ খুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপেটোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি সরেস গল্প মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলা দেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানিস ভাই "প্রাভদা" কাগজ সবচেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে বলে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড ?'

প্রথম কম্যুনিস্ট : 'কুড়ি বচ্ছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টস অ্যাণ্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আরেক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌টিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস ? কেন ?'

'কি আর হবে ? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে ? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজী হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে সব কর্তাব্যক্তিরা রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির উপর বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে

মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয়—চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সব চেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন ও বাধ্য হয়ে অর্ধ-দিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই এগুলো সম্বন্ধে হাড়ে হাড়ে এমনই সচেতন যে, এ নিয়ে মস্করা করে তবু সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নূতন অক্টোবর রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরাম-দায়ক অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলাণ্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠরসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরো তিনটে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মৃণ্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সক্কলের আপন আপন সলুন, মোটর গাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধোলে, 'কোথায় চললি কমরেড?'

'তুই যদি আমার পিছু না নেস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো হ'ল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সঙ্গে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার

সময়! ওদিকে যে রেশন শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে।'

সত্যই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু নেবু তো আর নিত্যিনিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবণ্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কি? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদল করুন। ঢের কম হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে :—

ক্লাস টীচার শুধোলেন, 'লেনিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছ?

'আজ্ঞে, কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রী মশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, ১৯৬০-এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৬১তে ১৬০ গুণ। এ বছরে দু শ' গুণ—দাঁড়ান, কি হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, কমরেড, স্টুডিয়ো অ্যাসিস্‌টেন্‌ট্, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি।'

তবে কোনো কোনো বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানিনে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন,

'তোমার পাতলুন আর শার্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরো পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মত কাজ করছে তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাৎলে দেয় কিভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সক্কলকে হপ্তায় দু দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মারবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব !]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোর বেলা—এ দেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশী বরদাস্ত করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'কমরেড অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা,

'কি বললে ? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে ? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।' কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশী আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবেদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরী হয় কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীন ও খ্রুশ্চফকে গালাগাল দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে) ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন-চিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্র-ধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষা-মন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সব চেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্য কাজ করতে।' সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা, আপনি কি কাজ করেন?' আজ্ঞে, 'আমি গোর খুঁড়ি।' কিংবা,

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হরকরা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, 'রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কণ্টাক্টর: 'এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা "মশাইরা" নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।'

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দু'জনা ওয়াক্ থুঃ, ওয়াক্ থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজীতেও বলে, 'নীরবতা হিরন্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশী। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যত দূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও 'অন্তরে অন্তরে আন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কিভাবে আলাপ করে?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা,

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনো আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা।

তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয় গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়াবাড়ি নেই। তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়! তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খুশ্চফ্ ও পুলিশকর্তা[১] (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাখারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডিদের অলঙ্কারগুলো লক্ষ করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, 'না কই, দে তো।'

---

১ 'ভেল্টভখে'র (ৎসুরিখ) ১৪৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

নানাপ্রশ্ন

যতই বয়েস বাড়ছে, কোথায় না মনের ভিতর যে-সব প্রশ্ন জাগে তার সংখ্যা কমবে, উল্টে তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিনপূর্বে বাঙলায় লেখা কয়েকখানি মুসলমানী কেতাব বা পুঁথি হাতে পড়লো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য। বিষয়বস্তু ফার্সী যদিও নায়ক-নায়িকা কোনো কোনো মূল কাব্যে আরব দেশের— ফার্সীর মাধ্যমে বাঙলা দেশে এসে পৌঁচেছেন। সঙ্গে এনেছেন ইরানী মেজাজ। সেটা মধুর,—আরবী কাব্যের মূল সুর দার্ঢ্য।

বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, যে-সব কবি বাঙলায় এ-সব কাব্য 'স্বাধীন অনুবাদ' করেছেন এঁদের অনেকেই উত্তম ফার্সী জানতেন। কেউ কেউ ভালো আরবী ও সংস্কৃত জানতেন, এবং প্রায় সকলেই তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা কাব্যের ভাষা জানতেন। ছন্দও হয় পয়ার নয় ত্রিপদী। এমন কি কবিদের একজন পয়ার লিখতে লিখতে এমনই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেছেন যে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য যে মাঝে মাঝে ত্রিপদী ভী আমদানী করতে হয় সে বাৎ বেবাক ভুলে গেছেন এবং কাব্য সমাপ্তির পর যখন কানে জল গেল তখন কুছ্ কুছ্ ত্রিপদী-ভী-বগ্‌হার দিয়ে কবি-ধর্মের ইমান দুরুস্ত রাখলেন। ১

তাই প্রশ্ন, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা বাঙলা কাব্যে বিদেশী সুর আনলেন তাঁরা উত্তম ফার্সী এবং আরবী শব্দ বাঙলাতে আমদানী করলেন না কেন ?

দর্শনের অনুশাসন, যে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে তোমার কণামাত্র ধারণা নেই, যে উত্তর কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে না আসতে পারে

---

(১) ইনি অবশ্য অনেক পরের কবি। সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য পৃঃ ১১০, ১১১ পশ্য।

সে সম্বন্ধে তুমি কণামাত্র কল্পনা করতে পারো না, সে প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সে প্রশ্ন বাতিল ইনভ্যালিড। তাই আমার মনে যে কাল্পনিক 'উত্তর' এসেছে সে-দুটির ইঙ্গিত দিই।

প্রবন্ধান্তরে বলেছি, বাঙলা দেশ চিরকালই বিদ্রোহী। এ-দেশ মুসলমান আগমনের পর থেকে সুভাষ বসু পর্যন্ত একমাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে কেন্দ্রের অর্থাৎ দিল্লি-আগ্রার হুকুম তামিল করেছে। বস্তুত পাঠান মোগল প্রায় সব বাদশাকেই এ-দেশে আসতে হয়েছে 'বিদ্রোহ দমন করতে'—আমরা অবশ্য বলবো, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে। বিশেষত বাঙলার স্বাধীন পাঠান রাজাদের আমলের তো কথাই নেই। তখন বাঙলা দেশ চীনের সঙ্গে রাজদূত বিনিময় করছে, প্রতিবেশী জৌনপুরী রাজাদের সঙ্গে কখনো লড়াই করছে, কখনো আশ্রয় দিচ্ছে, এবং জনশ্রুতি যে, বাঙলা দেশের স্বাধীন রাজা ইরানের কবি হাফিজকে বিস্তর সওগাৎ পাঠিয়ে দাওয়াৎ করছেন এদেশে। অবশ্য নৌপথে।

এখানেই হয়তো রহস্যদ্বারের গুপ্ত কুঞ্চিকা।

স্থলপথে ইরান যাবার কথাই ওঠে না। মাঝখানে জৌনপুর, 'দিল্লি, লাহোর, কান্দাহার হিরাত কত না স্বাধীন রাজত্ব! একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে হরবকৎ। নিরীহ কবি, চিত্রকর, গায়কের তো কথাই ওঠে না, ইরান-তুরানের ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারা পর্যন্ত মেরে কেটে হয়তো দিল্লি অবধি দু'একজন এসে পৌঁচেছে, 'দিল্লি দূর অস্ত' বরঞ্চ দিল্লি নজ্‌দীক্ মীশওদ' (দিল্লি কাছে এল), কিন্তু 'বাঙলা দূর অস্ত' শুধুই নয় 'দূরন্তর অস্ত।'

এদিক বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতানদের মাতৃভাষা ফার্সী নয়, ফার্সী তাদের কোর্ট লেনগুইজমাত্র—এমন কি স্টেট লেনগুইজও নয়—যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁরা সে ভাষা ভুলে যাচ্ছেন, ওদিকে ফার্সী ভাষাও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে বিদেশাগত নূতন কবি নূতন লেখক সে ভাণ্ডারের মাল নিয়ে আসছেন না, রাজদরবারেই যখন ফার্সী দিনের

পর দিন শুকিয়ে আসছে তখন জনসাধারণে সে-ভাষা প্রচলিত ও প্রসারিত হবে কি করে?

দু-চারজন পণ্ডিতদের কথা সব সময়ই আলাদা। রামমোহন হীব্রু জানতেন, হরিনাথ দে না জানি কটা বিদেশী ভাষা সে-সব দেশে না গিয়ে এমন কি সে-সব ভাষার পণ্ডিতদের সংস্পর্শে না এসেও শিখতে পেরেছিলেন। অবশ্য স্বাধীন বাঙলায় তার চেয়ে অনেক বেশী আলিম-ফাজিল ছিলেন কিন্তু এঁদের প্রায় সকলেরই ছিল 'কাফিরদের' ভাষা বাঙলার প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা (ঐ যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরও বাঙলার প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ছিল না)। এঁরা বাঙলায় কাব্য এমন কি ধর্মালোচনা করতেও কড়া বারণ করতেন। কিন্তু যেখানে স্টেটের খানিকটে উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে চর্চাকে কিছুটা উপেক্ষা করা যায়। তাই দৌলত কাজী, আলা-ওল, সৈয়দ সুলতান ইত্যাদি কবিদের আবির্ভাব। (২) পূর্বেই বলেছি এরা ফার্সী জানতেন উত্তম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটিও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে তাঁদের পাঠকমণ্ডলী, কি মুসলমান কি হিন্দু কেউই বিদেশী আরবী ফারসীর সঙ্গে সুপরিচিত নন। কাজেই আসল উদ্দেশ্য সমাধান হবে না আদপেই।

(এর সঙ্গে আজকের দিনের একটি তুলনা দিতে পারি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখি, কোনো পশ্চিমবঙ্গবাসী ঢাকার কোনো উটকো খবরের কাগজ থেকে আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাঙলা উদ্ধৃত

---

(২) 'সৈয়দরা' নিজেদের মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধর বলে দাবী করেন। মুসলমান ধর্মে যদিও সৈয়দদের বিশেষ কোনো সম্মান দেখাবার নির্দেশ নেই তবু কার্যত এঁরা অনেকটা ব্রাহ্মণদের সম্মান পান। তার কারণ অবশ্য অংশত এই যে এঁদের ভিতরই ইসলামী শাস্ত্রচর্চার প্রচলন ছিল বেশী। এবং ঠিক যে রকম, ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্র বানায়, এবং শাস্ত্র ভাঙ্গে তারাই—রামমোহন বিদ্যাসাগরে কথা স্মরণ করুন—ঠিক সেই রকম ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য সৃষ্টিতেও সৈয়দদের ভাঙ্গা-গড়ার সাহস বেশী। হিন্দুর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যে মুসলমান কবি সম্মানের সর্বোচ্চ আসন পেয়েছেন তাঁর নাম সৈয়দ মোর্তুজা।

করে আর্তরব ছাড়ছেন, এত বেশী আরবী ফার্সী শব্দ যদি ঢাকার লেখকরা ব্যবহার করেন তবে এক নূতন ভাষার উদ্ভব হবে এবং বঙ্কিম-রবির বাঙলা 'দ্বিখণ্ডিত' হয়ে যাবে। এঁরা যদি অনুগ্রহ করে ঢাকার নিত্যকার খবরের কাগজ পড়েন, লেখকদের সাহিত্য রচনা পড়েন তবে দেখতে পাবেন ঢাকা সেই বাঙলাই লিখছে কলকাতা যে বাঙলা লেখে—দু'চারটি 'আব্বা,' 'আম্মা', 'ফজরের নামাজে'র কথা হচ্ছে না, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ আলাল হুতোমে আছে—এবং তার কারণ দৌলত কাজী, আলাওলের বেলায় যা হয়েছিল তা-ই। ঢাকার উত্তম ফার্সী জাননেওয়ালা লেখকও বোঝেন যে তিনি ফার্সী জানলে কি, তাঁর পাঠকের অধিকাংশই যে ফার্সী জানেন না। এস্থলে অবশ্য মডার্ন কবিদের মত যাঁরা মনে করেন, যত দুর্বোধ লেখা যায় ততই 'সুবোধ পাঠক' প্রশংসা করবে বেশী, তাঁদের কথা হচ্ছে না)।

আকবরের আমলেই প্রথম অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। কিন্তু তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে।

ইংরিজি শব্দ যখন প্রথম বাঙলাতে ঢুকতে আরম্ভ করে তখন লেখা হয়েছিল 'লভ', 'কালেজ, ইত্যাদি; আজ আমরা লিখি 'লাভ' 'কলেজ'। আজ আবার দেখতে পাই, 'স্যুটিং'' শুটিং' 'হাসপাতাল', 'হাঁসপাতাল' একই শব্দ দুই বা তিন রকমে লেখা হচ্ছে। তার উপর জুটেছে এসে আরেক আপদ। ছেলে-ছোকরারা ফরাসি, জর্মন ভাষাতে ওকীব-হাল হয়ে উঠেছে; 'পারি' 'পারী' 'প্যারিস' এমন কি দু-আঁসলা 'প্যারি' পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে,— 'প্যাঁসনে', 'পাঁশনে' আরো কত কী!

দৌলত কাজী ইত্যাদি লেখকগণ মাত্রাধিক আরবী-ফারসী শব্দ বে-এক্তেয়ার ভাবে গ্রহণ করেননি সত্য কিন্তু কিছু পরিমাণে তো করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁরা আমাদেরই মত এলোপাতাড়ি যাঁর যা খুশী করেছিলেন, না কতকগুলো সুস্পষ্ট আইন বেঁধে নিয়ে সেগুলো যতদূর সম্ভব মানাবার চেষ্টা করেছিলেন?

যেমন মনে করুন এ যুগের মরমিয়া কবি হাসন রাজা গাইলেন,

"মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমিন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দিন ।"

এখানে 'দিন'-কে যদি বাঙলা 'দিবস' অর্থে নেওয়া হয় তবে ছত্রটির কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে শব্দটি আরবী 'দীন' অর্থাৎ ধর্ম। অর্থ দাঁড়ালো 'আমার কানে এসে মুসলমানী ধর্মের খবর পৌঁছল বলে সে ধর্ম তার অস্তিত্ব পেল, যেরকম আমি যখন আঁখি মেলে চাইলুম তখনই দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টি হল।' কট্টর আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট স্কুল) মত হাসন রাজা বলেছেন, 'ত্রিলোকের চিন্ময় মৃন্ময় জগৎ তাদের অস্তিত্বের জন্য আমার চিত্ত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করছে। আমি না থাকলে এসবের অস্তিত্ব নেই।'

পুনরায় বলেছেন,

"আমা হইতে আসমান জমিন, আমা হইতে সব
আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে রব।"

এখানে 'রব' আওয়াজ, এই অর্থে নিলে সদর্থ হয় না। আরবী 'রব্' শব্দের অর্থ 'ভগবান'। হাসন রাজা বলতে চান, 'আমার চৈতন্য যদি ভগবানের অস্তিত্বের কল্পনা না করতো তবে তার স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বই হত না।'

॥ ২ ॥

টকির কল্যাণে আমরা একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টকি আসার পূর্বে আমরা ভাবতুম, আমরা রকে বসে বেহারী মুটের সঙ্গে যে উচ্চারণে হিন্দী কথা বলি, সেইটেই অতি বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ, এবং ক্লাসে মাস্টার মশাই যে ইংরিজি উচ্চারণে টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়েন সেই উচ্চারণই অক্সফর্ড কেম্ব্রিজে চালু!

পৃথিবীর সর্ব আর্য ভাষা, এমন কি সেমিতি ভাষাতেও একটি ধ্বনি কথায় কথায় আসে, কিন্তু বাঙলায় (এবং ওড়িয়া, আসামীতে) নেই। ইংরিজিতে 'the'-র 'ই' উচ্চারণ ; ফরাসীতে 'le'-এর 'e' ; জর্মানের 'gegeben'-এর তৃতীয় 'e'-র উচ্চারণ, আরবী, ফার্সী, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠিতে 'কলম' শব্দে 'ক' এবং 'ল'-এর মধ্যে, 'ল' এবং 'ম'-এর মধ্যে যে উচ্চারণ আছে, সেটি বাঙলাতে নেই।

সোজা কথায় হিন্দীর 'আমি' বা 'আমরা' বলতে যে হম শব্দটি আছে তার 'হ' এবং 'ম'-এর মাঝখানে যে ধ্বনিটি আছে সেটা আমাদের কেউ কেউ শুনেছেন 'অ' এবং তাই লিখেছেন 'হম্' এবং অধিকাংশই শুনেছেন 'আ' এবং তাই লিখেছেন 'হাম'। এ যুগে সচেতন হয়ে আমাদের অনেকেই লিখতে আরম্ভ করেছেন 'হ্যম'। (উপস্থিত আমরা এই ধ্বনিটির নাম দিলুম 'অস্পষ্ট স্বর')।

দৌলত কাজী, আলাওলের সামনে সর্বপ্রথম এই 'অস্পষ্ট ধ্বনি' নিয়েই এল সমস্যা। কলম, জবরদস্ত, মক্কা, মদিনা ধরনের অসংখ্য আরবী ফার্সী শব্দে আছে এই অস্পষ্ট ধ্বনিটি ; এটাকে প্রকাশ করেন কোন্ চিহ্ন দিয়ে ? 'কলম', না 'কালাম', না 'ক্যল্যম' (আজকে পূর্বোল্লিখিত 'হ্যম'-এর মত) ?

আলাওলরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন, এবং এটাও জানতেন যে, সংস্কৃতে এ ধ্বনিটি আছে বটে, কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে 'অ' রূপে। যেমন সংস্কৃতে 'কমল' শব্দের 'ক' এবং 'ম'-এর মাঝখানে, আছে সেই 'অস্পষ্ট স্বর', কিন্তু বাঙালী সেই অস্পষ্ট ধ্বনির পরিবর্তে 'কমল' উচ্চারণ করে 'অ' দিয়ে, অর্থাৎ বাঙলা শব্দ 'ঘর' উচ্চারণ করতে যে 'অ' উচ্চারণ করি সেই 'অ' দিয়ে।

তাই তাঁরা মনে মনে আন্দেশা করলেন, সংস্কৃতের 'কমল' এবং আরবী-ফার্সীর 'কলমে' যখন একই উচ্চারণ তখন এই ধ্বনি প্রকাশের সময় বাঙলায় কোনো পরিবর্তন না করাই ভাল। অবশ্য তাঁরা 'কলম' না লিখে 'কালাম' লিখতে পারতেন (আজকে যে রকম কেউ কেউ

'হুদিস' না লিখে 'হাদিস' লেখেন, 'বরকৎ' না লিখে 'বারাকৎ' লেখেন) কিন্তু তা হলে বিপদ হত যে, দীর্ঘ আ-কার-যুক্ত 'কালাম' নামক যে ভিন্ন শব্দ আছে (সেটার অর্থ 'বাণী'—আবুল কালাম আজাদ-এর অর্থ 'বাণীর পিতা, যিনি স্বাধীন') সেটাতে এবং 'লেখনী'-তে (অর্থাৎ 'কলম'-এ) যে পার্থক্য আছে সেটা আর লেখাতে দেখানো যাবে না।

অবশ্য তাঁরা 'ক্যল্যম' (কলমের জন্য, এবং 'কালাম', 'বাণী'র জন্য) লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করতে গেলে অন্যান্য নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়—এবং সে দীর্ঘ আলোচনার জন্য এ-স্থলে স্থানাভাব।

এই আইন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালী কি ভাবে 'অ' এবং 'আ' উচ্চারণের ভিতর পার্থক্য করে সে-সম্বন্ধেও বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন বলে একটি ব্যত্যয় তাঁরা করে দিয়েছিলেন। আরবী ফার্সী শব্দের আদ্যক্ষরে 'আলিফ', 'আইন' বা 'হে' থাকলে সেখানে 'আ' ব্যবহার করেছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই 'অল্লা' 'অহমদ' না লিখে লিখেছেন 'আল্লা', 'আহমদ'; 'অব্দুলের' বদলে 'আব্দুল'; এবং 'হমিদের', 'হসেনের' পরিবর্তে 'হামিদ', 'হাসন'।

দ্বিতীয় সমস্যা ছিল দীর্ঘ হ্রস্ব নিয়ে। সংস্কৃত 'দিন' এবং 'দীন' উচ্চারণে, 'কুল' এবং 'কূল' উচ্চারণে আমরা কোনো পার্থক্য করি না, এমন কি সংস্কৃত পড়ার সময়ও না। তাই তাঁরা স্থির করলেন যে, বাঙলাতে আরবী-ফার্সী শব্দ লেখার সময় তাঁরা সব শব্দই হ্রস্ববর্ণ দিয়ে লিখবেন। কাজেই আরবী 'ধর্ম' অর্থে 'দীন' শব্দ যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে আছে তবু তাঁরা বাঙলাতে দিন-ই লিখলেন, এবং ঠিক সেই মত 'নূর', 'রসূল' না লিখে 'নুর' এবং 'রসুল' লিখলেন।

তৃতীয় সমস্যা, সংস্কৃতে শ, ষ, স-এর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ। আমরা বাঙলাতে তিনটেকেই এক উচ্চারণ 'শ' অর্থাৎ 'sh'-এর মত করে থাকি। শুধু সংযুক্তের বেলা এবং অন্যান্য কোনো কোনো স্থলে

ইংরিজি s-এর উচ্চারণ, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত 'স'-এর উচ্চারণ করে থাকি। মস্তক, পুস্তক, আস্তে, শ্রাবণ, প্রশ্ন ইত্যাদিতে আমরা 'শ' উচ্চারণ না করে 'স', অর্থাৎ 'sh' না করে 's' করে থাকি। আরবী-ফার্সীতে আছে চার রকমের ঐ ধরনের উচ্চারণ। মুসলমান আদি লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণপদ্ধতি মেনে নিয়ে একটি 'স' দিয়েই সব কারবার চালাবার চেষ্টা করেছেন। তবে পূব বাঙলায় 'ছ' অক্ষর 'স'-এর মত উচ্চারিত হয় বলে মাঝে মাঝে (পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক কালে আকছারই) 'ছ' এসে 'স'-এর স্থান নিয়েছে।

এ আলোচনার সর্বশেষে কিন্তু নির্ভয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। মুসলমান আদি-লেখকেরা বাঙলা উচ্চারণকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে তারই রীতিনীতি মেনে নিয়েছিলেন। উদ্ভট বিদকুটে বানান লিখে নূতন নূতন ধ্বনি আমদানীর বন্ধ্যাগমন করেন নি। আরবী-ফার্সী শব্দের বাঙলা বানানে প্রথম ভূতের নৃত্য আরম্ভ হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ১৯৩৬ সালে বাঙলা বানান 'নিয়ন্ত্রণ ও সরল' করতে চাইলেন। কিন্তু সে আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হয়ে পড়বে, আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ এবং তদুপরি আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ আলোচনায় অধিকাংশ পাঠকেরই কোনো উৎসাহ নেই। তবু যে আমি করেছি, তার কারণ, বাঙলা বানানের অরাজকতার মাঝখানে একথাও সত্য যে, বাঙলার একাধিক তরুণ নানা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা শব্দ ও ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করছেন। তাঁরা যদি এসব বিষয়ে গবেষণা করেন তবে আমার 'নানা প্রশ্নের' কিছুটা উত্তর আমি হয়তো পাব।

এটা অবশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নূতন নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বানানের অরাজকতা দূর করার জন্য সাহিত্য-পরিষদ (?) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (?) অনুরোধ করেন, তিনি যেন ঐ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। আমার যতদূর জানা আছে, তিনি সে কার্য শেষ করে

উঠতে পারেন নি। আমার এ মন্তব্যে ভুল থাকতে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটা আমার আবছা-আবছা মনে আছে।

শেষ প্রশ্ন :—

বাঙলা বাক্যগঠন, পদবিন্যাস অর্থাৎ সিনটেক্স্ এল কার অনুকরণে?

ফার্সীতে বলি, চূন (যখন) পাদশা (বাদশা) মরা (আমাকে) দীদন্দ (দেখলেন) উনহা (উনি) মরা (আমাকে) গুফতন্দ (বললেন), তূ (তুই) কুজা (কোথায়) মীরওয়ী (যাচ্ছিস)?

হুবহু একই সিনটেক্স্?

ফার্সী থেকে?

এবং সর্বশেষ প্রশ্ন :—

আমরা যে গোটা গোটা বাঙলা লেখার সময় এবং সাইন-বোর্ডে বাঙলা অক্ষরের কোনো জায়গায় মোটা কোনো জায়গায় সরু করি সেটা এল কোথা থেকে? ফার্সী লেখার কলম (—আমাদের প্রাচীন লেখনী বা লোহার স্টিলো না—) ব্যবহার করেছিলুম বলে?

মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।

এই যে ফার্সী নামক ভাষা এটি সাত শ' বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল। যদিও পাঠান ও মোগল কারোরই মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। শেষ বাদশা বাহাদুর শা'-বাদশার অন্তঃপুরেও তুর্কী বলা হত। যদিও রাজদরবারে ফার্সী চলতো, কিন্তু কবি সম্মেলনে প্রধানত উর্দু।

ইংরেজও প্রথম এক শ বছর এ-দেশে ফার্সী দিয়েই কাজ চালায়। ১৮৪০-এর কাছাকাছি এক দিন তারা ফার্সী নাকচ করে দিয়ে ইংরিজি চালালে। যে হিন্দু কায়স্থরা একদা অত্যুত্তম ফার্সী শিখে পদস্থ রাজকর্মচারী হতেন, তাঁরা ৫০।৬০ বছরের ভিতর ফার্সী বেবাক ভুলে গিয়ে ইংরিজির মাধ্যমে রাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মুখে শুনি, কলকাতা হাইকোর্টে নাকি এখনো তাঁদের প্রাধান্য অতুলনীয়। বাদবাকি ভারতবর্ষে এখন কজন লোক ফার্সী জানেন সেটা বের করতে হলে দিনের বেলাও লণ্ঠন নিয়ে বেরতে হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা হচ্ছে—অবশ্য এই দুই সম্প্রদায়েরই যাঁরা উর্দুর শক্ত গোড়াপত্তন করতে চান তাঁরা ফার্সী শেখেন—বাঙালী যেমন আপন বাঙলাকে জোরদার করতে হলে সংস্কৃত শেখে।

যে ফার্সী প্রায় সাত শ' বৎসর ধরে ভারতবর্ষে দাবড়ে বেড়াল, হাজার বছর ধরে তুর্কীস্থান থেকে তাইগ্রীস নদ অবধি রাজত্ব করলো (লাতিনের মতই ফার্সীকে সে যুগের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলা যেতে পারে) সেই ফার্সীই পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতবর্ষে লোপ পেল!

ইংরিজি মাত্র এক শ বছর রাজত্ব করেছে। তার লোপ পেতে কত দিন লাগবে?

শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী সেদিন বলেছেন, 'ইংরিজী আমাদের লিগেসি, ওটা আমরা ছাড়ব কেন?' তাঁর পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় পিতা মোতীলাল ফার্সীকে তাঁর লিগেসি মনে করতেন। ইংরেজ আমলে একদা দিল্লীর বিধানসভায় তুই ইংরেজ একে অন্যকে প্রচুর অহেতুক প্রশংসা করলে পর মোতীলালজী বললেন, 'ফার্সীতে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে; "মন্ তোরা হাজী মীগোইম, তো মরা কাজী বগো!" অর্থাৎ আমি তোমাকে হাজী বলে সম্বোধন করবো, আর তুমি আমাকে কাজী বলে সম্বোধন ক'রো—অথচ ইনিও মক্কাতে গিয়ে হজ করেননি, উনিও কাজী বা ম্যাজিস্ট্রেট নন।' সেই ফার্সী ভাষার লিগেসি গেছে,—ইংরিজির কবে যাবে?

পাঠক ভাববেন না, আমি ইংরিজি তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। আদপেই না। নিজের স্বার্থেই আমি চাই, ইংরিজি থাকুক—এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায়, মশাই, হিন্দীর 'গাড়ী আতী হৈ, জহাজ জাতা হৈ' লিঙ্গ মুখস্থ করে করে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাব! যে কটা দিন বেঁচে থাকবো, ইরিজি ভাঙিয়েই খাব। সে-কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, আমি আপনি চাইলে না চাইলেও ইংরিজির ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

আরেকটি উদাহরণ নিন। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওকীবহাল নই—যা শুনেছি তাই বলছি। ইংলেণ্ডে নাকি নরমান বিজয়ের ফলে ফরাসী রাষ্ট্রভাষা হয়ে যায়, এবং তামাম ইংলণ্ডের লোক নাকি পড়িমরি হয়ে ফরাসী শেখে। কবি চসারের সামনে নাকি সমস্যার উদয় হয়, তিনি ফরাসী না ইংরিজিতে কাব্য রচনা করবেন? (ভাগ্যিস ইংরিজিতে করেছিলেন, কারণ ফরাসী লিখে কোনো ইংরেজ যশ অর্জন করেছেন বলে শুনিনি; এদেশে যেমন আট শ বছর ফার্সী চর্চার পর এক আমির খুসরৌই কিছুটা নাম করতে পেরেছেন—তাও তাঁর মাতৃভাষা ছিল ফার্সী)।

নরমান বিজয় খতম হওয়ার পরও ইংরেজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তার ফরাসী লিগেসি যেন মকুব না হয়ে যায়। কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ফরাসী শিখিয়েছে, কাচ্চা-বাচ্চার জন্য ফরাসী গভার্নেস রেখেছে, ছুটিছাটা পেলেই প্যারিস পানে ধাওয়া করেছে। আর তার ভাষার ভাই মার্কিনও ফরাসী মত্ততায় কিছুমাত্র কম নয়। শুনেছি, মার্কিনী ইংরিজিতে নাকি প্রবাদ আছে 'সাধু মার্কিনেরই মৃত্যুর পর প্যারিস-প্রাপ্তি হয়—' সেই তার স্বর্গপুরী, মুসলমানের বেহেশৎ, হিন্দুর কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির মত।

ফরাসী শেখানোর বাজে খর্চা যাঁরা কমাতে চান তাঁরা নাকি হালে হাতে-কলমে সপ্রমাণ করেছেন, যে লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ইংরেজকে ফরাসীতে প্রশ্ন শুধোলে শতেকে গোটেক ফরাসীতে উত্তর দিতে পারে, কি না পারে।

শুনছি, ব্রিজ দিয়ে নাকি ফ্রান্স-ইংলণ্ডে যোগ করে দেওয়া হবে। হায়রে কপাল! যখন ভাষার সেতু ছিল, তখন লোহার সেতু ছিল না, এখন লোহার সেতু হচ্ছে তো ভাষার সেতু নেই!

আরেকটি উদাহরণ দিই। খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবার পর খৃষ্টভক্তগণের বাসনা হলো, খৃষ্টধর্মের কল্যাণে সমস্ত ইয়োরোপে যে এক নবীন ঐক্য দেখা দিয়েছে, সেটা যেন লোপ না পায়। তাই তাঁরা আপ্রাণ লাতিন আঁকড়ে ধরে রইলেন। পাছে সেই ঐক্য লোপ পায়, তাই দেশজ অনুন্নত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না (মুসলমানরাও বহুকাল কোরানের ফার্সী কিংবা উর্দু, বাঙলা অনুবাদ করতে দিতে চাননি, ঐ একই কারণে)। লুথারের অন্যতম প্রধান সংস্কার ছিল জর্মন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রচার। ফলে শেষ পর্যন্ত ফরাসী লাতিনের স্থানটি কেড়ে নিল—এই সেদিন পর্যন্ত জর্মনভাষী ফিড্ররিক দি গ্রেট ফরাসী কবি ভলতেয়ারকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর অতি-কাঁচা ফরাসী কবিতা মেরামত করিয়ে নিতেন—এবং সর্বশেষে ইয়োরোপের সর্বভাষা আপন আপন

দেশে মাথা খাড়া করে দাঁড়ালো। ইস্তেক ডেনিশ, ফিনিশ পর্যন্ত। লাতিন-ফরাসী সংহতি গেল। অনেক পর্যটকের মুখে শুনতে পাবেন—সে আসন এখন ইংরিজি নিচ্ছে। শুনে হাসি পায়। হোটেল-বয়রা কিছুটা ইংরিজি বলতে পারে বইকি, যেমন মাদুরার হোটেল-বয়ও কিঞ্চিৎ হিন্দুস্তানী কপচায়, কিন্তু প্যারিস কিংবা ভিয়েনার রাস্তায় ঐসব দেশবাসীর সঙ্গে ইংরিজিতে দুদণ্ড রসালাপ করবার চেষ্টা দিন না, দেখুন না ফলটা কি হয়।

আমি যদি বলি, সমস্ত ইয়োরোপে যতখানি ইংরিজি বলা হয়, তার তুলনায় ভারত পাকে বেশী হিন্দুস্তানী বলা হয়, তবে ভুল বলা হবে না—অবশ্য বই পড়ার কথা হচ্ছে না, সেটা নির্ভর করে জনসাধারণে শিক্ষার বিস্তৃতির উপর!

অর্থাৎ ইংরিজিও লাতিন সংহতি এনে দিতে পারবে না।

কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ আরব-আফ্রিকা ভূখণ্ডে। ইরাক থেকে আরম্ভ করে সিরিয়া, লেবানন, মিশর, তুনিস, আলবজজরিয়া, মরক্কো, এদিকে কুয়েইত, বাহরেন, মক্কা-মদিনা, ইয়েমেন, জর্ডন, সর্বত্রই আরবী প্রচলিত। লেবানন বাদ দিলে এদের প্রতিটি রাষ্ট্রে চৌদ্দ আনা পরিমাণ লোক মুসলমান এবং উত্তর আফ্রিকার কিছুটা বের্‌বের্ কপ্তীক ও নিগ্রো রক্ত বাদ দিলে সকলের ধমনীতেই প্রায় অভেজাল সেমিতি রক্ত।

কিন্তু কোথায় সেই আরব সংহতি?

প্রাচীন দিনের কাহিনীতে ফিরে যাব না। এই আপনার আমার চোখের সামনেই দেখতে পেলুম, ইরাক সে-সংহতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো, কুয়েইত জাতভাই কাসেমের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিধর্মী (কারো কারো মতে 'কাফের') ইংরেজকে দাওয়াত করে খানা খাওয়ালে, এবং পরশু না তরশু দিন সিরিয়াও নাসেরের মিশরীদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে। এমন কি, সিরিয়ার মসজিদে মসজিদে নাকি মোল্লারা নাসেরকে অভিসম্পাত

দিচ্ছেন, নাসের নাস্তিক, টিটোর সঙ্গে কোলাকুলি করে, তারই আস্কারায় মিশরের টেলিভিশন অশ্লীল ছবি, অর্ধনগ্না রমণী দেখায়!

এক ধর্ম, এক রক্ত, এক ভাষা। এক ভাষা, বিশেষ করে বললুম, কারণ সিরিয়া, ইরাক, মিশরের কথ্য ভাষাতে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও ওসব জায়গায় কোনো উপভাষা সৃষ্টি হয়নি—সেই এক হাজার বছরের পুরোনো ক্লাসিকাল আরবীই সর্বত্র চলে। তবু আর মিলন হয়ে উঠছে না।

* * * *

কাজেই সংহতির সন্ধানে অন্যত্র যেতে হবে। গুজরাতী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, সবাই মিলে হিন্দী কপচালেই যে রাতারাতি আমাদের জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে, এ-দুরাশা যেন না করি।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বলেই বলছি তা নয়, আমার মনে হয়, তিনিই এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার চিন্তা করেছেন।

ভারতীয় সংহতি

ভারতীয় সংহতি তবে কোথায়?

এস্থলে নিবেদন করে রাখি যে আমার ধারণার সঙ্গে অল্প লোকেরই ধারণা মিলবে ও যাঁদের সঙ্গে মিলবে তাঁরা এবং আমিও এ দুরাশা পোষণ করি না যে বিংশ শতাব্দীর লোক আজ অথবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বক্তব্য কান দিয়ে শুনবে।

বেদ উপনিষদ নমস্য কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষেই এসবের চর্চা অতি কম। এমন কি পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি, গীতা পর্যন্ত এদেশে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

অপিচ ভারতবর্ষের যে কোনো গ্রামে যান না কেন, তা সে মালাবারে আসামে পাঞ্জাবেই হোক সেখানকার লোকনাট্য চারণ গানে সর্বত্রই মহাভারত, রামায়ণ বিরাজিত। জনপদবাসীর রসাস্বাদনের প্রধান উৎস রামায়ণ মহাভারত। আমি একবার মালাবারের গ্রাম্য কথকলি দেখতে এবং শুনতে গিয়ে তিন মিনিটেই বুঝে যাই, হনুমান সভাজনকে সালঙ্কার বর্ণন করছেন, তিনি কি করে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন, নগর পরিদর্শন করলেন, লঙ্কার কদলীবনে কি প্রকারে লঙ্কা-কাণ্ড ঘটালেন, অবশেষে রাবণের অনুচর তাঁর পুচ্ছটিতে অগ্নিসংযোগ করলে তিনি কি প্রকারে গৃহ থেকে গৃহান্তরে লম্ফ প্রদান করে নগরীতে ব্যাপকভাবে বহ্নি প্রজ্বলিত করলেন। মালায়ালম ভাষার এক বর্ণ না জেনেও আমি স্বচ্ছন্দে গল্পটি উপভোগ করলুম।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাঁরাই পরিভ্রমণ করেছেন তাঁরাই জানেন, রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় জীবনের কতখানি গভীর অতলে প্রবেশ করেছে।

এবং এই নাট্য নৃত্য উপভোগ করে শুধু হিন্দু না, মুসলমানও। কারণ ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মাতৃভাষা এক। বাঙ্গলার মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন বাঙলা, গুজরাতী মুসলমানের মাতৃভাষাও

গুজরাতী। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানের মাতৃভাষা যেমন উর্দু, হিন্দুরও তাই—এখন অবশ্য হিন্দী ক্রমে ক্রমে উর্দুর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। মাতৃভাষায় আমোদ আহ্লাদ করাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা—শুনেছি, দেশ বিভাগের পরও 'হরহর মহাদেব' ফিল্ম ঢাকাতে যে বক্স-আপিস ভরলে তাতে সিনেমার মালিকগণ বিস্মিত হন।

কিন্তু অমিলও আছে।

ধর্মজগতে হিন্দু ভীষ্ম, কর্ণকে আদর্শ বলে ধরে নেয়, মুসলমান নেয় না। গোব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করবার কোনো কারণও মুসলমানের নেই। অবশ্য আউল-বাউল মুর্শিদীয়া মিষ্টিকগণের গানে কিছুটা রামায়ণ প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ব্যাপকভাবে সেটা গ্রহণ করেনি।

* * * *

রামায়ণ মহাভারতের উৎস থেকে সঞ্জীবনী-সুধা আহরণ করে হিন্দু সংহতি পুনর্জীবিত করা যায়—অবশ্য যদি সাহিত্যিক, সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতাদের এ পন্থায় আস্থা থাকে এবং সেই কর্মে নিজেদের নিয়োগ করেন, বিনোবাজী যে রকম করেছেন, কিন্তু যদি ভারতীয় সংহতির কথা তোলা যায় তবে সমস্যাটা কঠিন হয়, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমান খৃষ্টান পার্শী গারো নাগা আদিবাসীও আছেন। জৈনদের কথা তুলছিনে, কারণ একমাত্র উপাসনা পদ্ধতি বাদ দিলে তাঁরা সর্বার্থে হিন্দু।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কোন জায়গায়? রসের ক্ষেত্রে যে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সে-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

এখন যা বলতে যাচ্ছি, সেটি আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে।

ছেলেবেলা থেকেই আরব দেশাগত দু'একটি আরব মুসলিমের জীবনযাত্রা ও চিন্তা পদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরবর্তী যুগে আরব দেশে থাকবার আমার সুযোগ হয়েছিল।

এঁদের ধর্মবিশ্বাস সরল। এঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাতালা এই বিশ্ব মানুষের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু পাছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে তাই তিনি ধর্মের সৃষ্টি করেছেন। সেই ধর্মে কতকগুলি বস্তু ও আচরণ আল্লা বেআইনী বলে হুকুম দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাতালা হুকুম দিয়েছেন, তুমি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো, যদি সকলকে সমান সম্মান সমান প্রেমের চোখে দেখতে পারো। না পারলে তোমার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অন্যায়।

আরব ভূমি তথা অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে তাই যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সেও পুনরায় ভার্যা গ্রহণ করে তবে তাই নিয়ে লোকনিন্দা হয় না। সমাজ ভাবে, সে একাধিক স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারবে কি না, সে দায়িত্ব তার স্কন্ধে।

কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান অর্থাগম হলেই দ্বিতীয় দারা গ্রহণ করে না। তার ভিতরে কেমন যেন একটা ত্যাগের আদর্শ আছে। তার বক্তব্য, 'আল্লাতালা আমাকে এটা সেটা অনেক কিছুই উপভোগ করতে দিয়েছেন সত্য কিন্তু আমি চেষ্টা করে দেখি না, আমার এগুলো না হলে চলে কি না?'

এ-কথা বলা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নয় যে কোরানে ত্যাগের আদর্শ নেই। বিস্তর আছে। বস্তুত জকাৎ (বাধ্যতামূলক দান-খয়রাত) ইসলাম সৌধের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং নিতান্ত দীন-দুঃখী ছাড়া সকলকেই কিছুটা দান করতে হয়। তদুপরি সুফী এবং সাধুসন্ত সম্প্রদায় তো চূড়ান্ত ত্যাগের আদর্শই বরণ করে নেন। উপস্থিত এঁদের কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য ভারতীয় মুসলিম যতখানি ত্যাগের আদর্শ বরণ করেছে—সে শুধু ধনদৌলতের বেলায়ই নয়, আমোদ-আহ্লাদ পরিতোষ-আনন্দের আভ্যন্তরীণ জগতেও—অন্যান্য মুসলিম ততখানি করেনি।

এই ত্যাগের মন্ত্র ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—অর্থাৎ তাকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করতে হবে।

* * * *

এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও ত্যাগ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

যার কিছু নেই, উপার্জন করার কোনো ক্ষমতা নেই, তার মুখে 'ত্যাগ ত্যাগ' শোভা পায় না। বিশেষত এই বিংশ শতাব্দীতে। যখন অক্ষম জন সর্বদায়িত্ব এড়িয়ে 'ত্যাগের' অছিলা ধরে সোশাল সার্ভিসের নাম করে আশা করেন, সমাজ তাঁকে পুষবে, এবং ভালো ভাবেই পুষবে, কারণ তিনি 'সর্বস্ব' (!) 'ত্যাগ' করেছেন তখন আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে (এরই অন্য উদাহরণে মহাত্মাজী বলেছেন 'শক্তিহীনের ক্ষমা ক্ষমা নয়')। সোজা কথা, বিড়লা টাটার দৌলত তাঁরাই ত্যাগ করতে পারেন,—আমি পারিনে, কারণ ও-দৌলত আমার নয়।

ওদিকে আবার উপনিষদ বলেছেন, 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্!' অন্যের ধনে লোভ করো না।

অর্থাৎ চাষা, মজুর, সাহিত্যিক মাস্টার আপন আপন পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে, অন্যের ধনের প্রতি লোভ না করেও।

সেই ধন অর্জন করে ত্যাগের মাধ্যমে তাকে উপভোগ করতে হবে।

এই আদর্শ হিন্দু-মুসলমান দুইয়ের আছে, এবং বহু যুগ ধরে জীবনে উপলব্ধি করেছে বলে এই দৃঢ়ভূমির উপর জাতীয় ঐক্য গঠিত হতে পারে। তাহলে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না।

শুধু তাই নয়, তা হলে ভারতবর্ষ যে শুধু শক্তিশালী রাষ্ট্র বলেই গণ্য হবে তা নয়, সে ভদ্রতম সম্ভ্রান্ততম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত হবে।

ভাষা

আমার আর একটি প্রশ্ন আছে :—

এই যে লাকসমবার্গের মত ক্ষুদে রাষ্ট্র কিংবা জনবিরল ফিনলাণ্ড, কিংবা ঐ ধরনের ছোট বড় নানারকমের রাষ্ট্র রয়েছে, কোন্‌খানে দেশটা সে দেশের আপন ভাষায় না চালিয়ে অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষায় চালানো হচ্ছে ?

সুইজারল্যাণ্ডের লোক তিন অঞ্চলের তিন ভাষায় কথা বলে। জর্মান, ফরাসী এবং ইতালীয়। রোমান্‌শ্‌ ভাষায় এত কম লোক কথা বলে যে সেটার কথা না হয় নাই তুললুম। এদের সকলের পক্ষে একটি ভাষা শিখে নিয়ে, সেটাকে 'রাষ্ট্রভাষার' সম্মান দিয়ে —তা সে ভাষা দিশীই হোক আর বিদেশীই হোক—কাজ চালাতে যে বিস্তর সুবিধা হত সে বিষয়ে কি সন্দেহ ? কত পয়সা খরচ করে তিন তিনটে ভাষায় সরকারী বেসরকারী বিস্তর জিনিস ছাপাতে হয়, তিন ভাষায় লোকে বক্তৃতা দেয় বলে পার্লামেন্টের কাজ দ্রুতগতিতে এগোয় না, এক অঞ্চলের জিনিস অন্য অঞ্চলে বেচতে হলে তার জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন, আলাদা এজেন্ট রাখতে হয়, এবং আরো কত যে ঝামেলা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ওরা হাসিমুখে সব-কিছুই মেনে নিয়েছে।

তার কারণ মাত্র একটি, এবং সে-কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযোজ্য।

মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কাজ চালানো যায় না।

অবশ্য আজ যদি বাঙলা দেশ চালানোর জন্য একজন রাজা, তাঁর জনা পাঁচশ মনসবদার এবং একটি পুরুষ্টু সৈন্যদল থাকলেই যথেষ্ট হত তাহলে ইংরিজী হিন্দী যে-কোনো ভাষা দিয়েই অল্পায়াসেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত। যেমন ধরুন একটা

চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজার, গুটিকয়েক কেরানীতে ইংরিজীর মারফতে দিব্য কাজ চালিয়ে নেয়। কিন্তু আজ পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আজ বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক গ্রামবাসীর যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি কতকগুলো হক্ক এবং দাবিও আছে। এরা প্রত্যেকেই যে শহরে এসে মন্ত্রী হতে চায় তা নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে গা-গতর খাটানোর পর যদি দু'মুঠো না খেতে পায় তবে রাষ্ট্র অবিচার করছে।

গণতন্ত্রের সামনে এই বড় পরীক্ষা।

এবং আমি এর উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে চাই।

গ্রামবাসীর সক্রিয়, সতেজ এবং দরদী সহযোগিতা না পেলে বাঙলার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, নেতারা, সমাজপতিরা এদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন কোন্ ভাষার মাধ্যমে? ইংরিজীর কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি; এইবার হিন্দীতে আসি।

প্রথমেই একটা সাফাই গেয়ে নিই। আমি হিন্দী-প্রেমী এবং ঐ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার বহু দিনের পরিচয়। হিন্দী বাঙলার বুকের উপর চেপে বসে একদিন 'হিন্দী ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম্' কায়েম করবে এ দুর্ভাবনা আমার মনের কোণেও আসে না। বস্তুত স্বরাজ-লাভের পর কলকাতা তথা বাঙলা দেশে হিন্দী প্রচারের যেটুকু ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমি আদৌ সন্তুষ্ট নই—এরচেয়ে ঢের ব্যাপকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে—কিন্তু সে-কথা পরে হবে, উপস্থিত ফের গ্রামে ফিরে যাই।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালে পাঠশালে হিন্দী শেখাতে হলে যে কতখানি রেস্তের প্রয়োজন হবে সেটা একবার শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এ নিয়ে দীর্ঘ বাগাড়ম্বর করতে চাইনে। জিনিসটা এতই সরল এবং স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, যে-দেশের লাখের মধ্যে একজন গ্রামবাসীও আপন প্রদেশের বাইরে যায় না তার পক্ষে ভিন্ন ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই।

সবস্থদ্ধ মিলিয়ে দেখা গেল, নেতারা তাহলে এঁদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন বাঙলার মারফতেই।

কিন্তু নেতারা যদি পরিপুষ্ট হন হিন্দী চর্চা করে, তাহলে ইংরেজ আমলে যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি হবে—তাঁরা জানতেন ইংরিজী, শ্রোতারা জানত বাঙলা, তুজনার চিন্তা-জগৎ, অনুভূতিক্ষেত্র ভিন্ন। শেষটায় নেতারা যে অতিকষ্টে বাঙলা শিখে কাজ চালালেন সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

ওদিকে ভারতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি তো চাই। এই যে প্রদেশে প্রদেশে দ্বন্দ্ব, একই প্রদেশের ভিতর সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অবিচার, এ তো ক্রমাগতই বেড়ে চলছে, এর বিরুদ্ধে তো কিছু-একটা করা চাই।

এর সরল সহজ রাস্তা নেই।

ভাষা এক না করেও সংহতি হয়—যেমন সুইজারল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে আছে—এবং ভাষা এক হলেও সংহতি না হতে পারে—যেমন নাসের, কাসেম, মক্কার বাদশা, কুয়েতের শেখ সক্কলেরই ভাষা আরবী কিন্তু এদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের অন্ত নেই। এই যে এত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সংযুক্ত-আরবরাষ্ট্র (UAR) করা হল তার সূতিকাগৃহ তো শ্মশান-শয্যায় পরিণত হতে চলল।

মহাত্মাজীকে এক ইংরেজ সাংবাদিক শুধিয়েছিল, 'তোমরা আপোসে এত লড়ো কেন?' মহাত্মাজী বলেন, 'ইংরেজ লড়ায় বলে।' ফের প্রশ্ন 'ইংরেজ লড়াতে চাইলেই তোমরা লড়ো কেন?' উত্তর হল, 'আমরা মূর্খ বলে।'

সেই হল মুখ্য কথা! আমরা মূর্খ!

এখন তো আর ইংরেজ নেই, কেউ ওস্কাচ্চে না, তবু আমরা লড়ে মরছি!

তাহলে প্রশ্ন এই মূর্খতা ঘুচাই কি করে ?

বিদ্যাদান করে, ধর্ম-বুদ্ধি জাগ্রত করে, রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে।

এই খানেই অধীনের সবিনয় নিবেদন—সেটি মাতৃভাষার মারফতেই করতে হবে, অন্য কোনো পন্থা নেই, নেই, নেই।

ধর্ম

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, আজকের দিনে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় কে, ওটার কী-ই বা প্রয়োজন? প্রশ্নটির ভিতর অনেকখানি সত্য লুকানো আছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম তাঁর রাজত্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত্রকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদা গঙ্গা-স্নান পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত বলে সেটি ধর্মের আদেশ রূপে মেনে নেওয়া হত, কিংবা বলা যায়, ধর্মের আদেশ বলে সেটি পুণ্য বলে বিবেচিত হত। এখন সেটা ডাক্তারই "স্ট্রংলি রেকমেণ্ড করেন", এবং অধুনা বিজ্ঞানও নাকি সপ্রমাণ করেছে, গঙ্গাজলে কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যেগুলো অন্য জলে নেই। ধর্ম এখানে বৈদ্যের হাতে এ পুণ্যকর্ম করার আদেশ ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা বলা যায়, বৈদ্য সেটা কেড়ে নিয়েছে। আর কিছুটা কেড়ে নিয়েছে ম্যুনিসিপ্যালিটি—কোনো কোনো দেশে ম্যুনিসিপ্যালিটিই ফরমান জারি করে, বাড়ি বানাবার সময় প্রতি কখানা ঘরপিছু একটি বাথরুম রাখতেই হবে। না হলে প্ল্যান মঞ্জুর হবে না। আহারাদিতেও তাই। ডাক্তারই বলে দেয় কোন্‌টা খাবে, কোন্‌টা খাবে না—অর্থাৎ কোন্‌টাতে পুণ্য আর কোন্‌টাতে পাপ। এবং আকছারই তিনি ধর্মের বিরুদ্ধ অনুশাসন দেন। যেমন খেতে বলেন চিকেন সুপ—হিন্দু ধর্মে, অন্তত বাঙলা দেশের হিন্দুধর্মে সেটা পাপ।

দান করা মহা পুণ্য। ধর্মের সনাতন আদেশ। কিন্তু আজকের দিন আপনি আমি এ-অনুশাসন মেনে চলি, আর নাই চলি, সরকার কান পকড়কে তার ইনকাম এবং অন্যান্য বহুবিধ ট্যাক্স তুলে নেবেই নেবে এবং সভ্যদেশে তার অধিকাংশই ব্যয় হয় দীন-দরিদ্রদের জন্য।

(আজ যে মুরারজী ভাই দিবারাত্র, "অস্তি নাস্তি ন জানতি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ" করছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি যদি সে পয়সা দুহাতে খরচা করে যুদ্ধের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী না বাড়ান—সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা অনেকখানি ঘুচবে, বেকার-সমস্যা ঘুচলো বলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে – তিনি যদি কঞ্জুসি করেন, তবেই হবে আমাদের চরম বিপদ —কিন্তু এটা অর্থনীতির একটা উৎকট সমস্যা এবং হিটলারই সর্বপ্রথম এর সমাধান করেন দুহাতে পয়সা খরচ করে, পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশের প্রাচীন-পন্থী অর্থমন্ত্রীরা তখন দেশের দুরবস্থা দেখে আকুল হয়ে, পাছে ভবিষ্যতে আরো কোনো নূতন বিপদে পড়তে হয় সেই ভয়ে সরকারের খরচা প্রাণপণ কমিয়ে "রিজার্ভ ফাণ্ড" নামক দানবের ভুঁড়ি মোটার চেয়ে আরো মোটা করতে থাকেন। তাঁদের দেখাদেখি ব্যাঙ্কার সাহুকাররাও ক্রেডিট দেওয়া বন্ধ করে কিংবা কমিয়ে দেয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো কমতে থাকে এবং সৃষ্ট হয় "দুষ্টচক্র"—ভিশাস্ সার্কল। সরকার ব্যাঙ্কার টাকা দেয় না বলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না, আর দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়ে না বলে সরকার খাজনা ট্যাক্সো পায় আরো কম এবং তারস্বরে চিৎকার করে, "আরো ছাঁটাই করো, আরো ছাঁটাই করো।") [১]

---

১ এরকম ক্রাইসিসের সময় আরো একটা মজার ব্যাপার ঘটে। ঐ সময় বড় বড় প্রাচীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাঙ্কের কাছে আরো ক্রেডিট চায়, তখন ব্যাঙ্ক ভাবে, "এদের বিস্তর টাকা দিয়েছি—আর কত দেব? এত কালের বড় ব্যবসা—নিশ্চয়ই টিকে যাবে।" ব্যাঙ্কার তখন ছোট ব্যবসাকে টাকা দেয়, পাছে তারা দেউলে হয়ে যায়, এবং ব্যাঙ্কের আগের দেওয়া সব টাকা মারা যায়। ফলে বিপদ কাটার পর দেখা যায় অনেক প্রাচীন, খানদানী ব্যবসা দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর ছোট ব্যবসাগুলো টিকে গেছে। অবশ্য এর একটা নৈসর্গিক—অতএব দুর্বোধ্য—কারণও থাকতে পারে। মহামারীতে বাড়ির রোগা-পটকাটাই যে মরে এমন কোনো কথা নয়। অনেক সময়ে তাগড়াটাই মরে। হয়তো মা রোগা-পটকাটারই যত্ন বেশী করেছিল বলে! ব্যাঙ্কার বড় ব্যবসাকে যে রকম যত্ন না করে করেছিল ছোটটার!

এই পরিস্থিতি হতে পারে বলেই ধর্ম প্রাচীন দিনে তার একটা ব্যবস্থা করেছিল।

দোল-দুর্গোৎসবে দান। এতে মহা পুণ্য।

বহুকাল পূর্বে আমি বাচ্চাদের মাসিকে একটি অনুপম প্রবন্ধ পড়ি। অসাধারণ এক পণ্ডিত সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমা নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে জমিদারকে অন্ন, বস্ত্র, ছত্র, তৈজস, পাদুকা, খট্ব, অলঙ্কার—দুনিয়ার কুল্লে জিনিস দান করতে হত। এতে করে চাষা, জোলা, ছাতাবানানেওলা, কাঁসারি, কামার, মুচি, মিস্ত্রি—বস্তুত গ্রামের যাবতীয় কুটিরশিল্প এক ধাক্কায় বহু-বিস্তর বিক্রী করে রীতিমত সচ্ছল হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, কাঁসারির দুপয়সা হয়ে যেত বলে সে ছাতা কিনত, ছাতাওলার চার পয়সা হল বলে সে শাঁখা কিনত—ইত্যাদি ইত্যাদি, আদ্ ইনফিনিতুম্। এবারে আর "নষ্টচক্র" বা "ভিশাস সাইক্ল" নয়—এখন যাকে বলে স্পায়ারেল মুভমেণ্ট—"চক্রাকারে স্বর্গ-বাগে!"

তার পর লেখক দুঃখ করেছিলেন, আজ যদি বা জমিদার পুণ্য সঞ্চয়ার্থে পূর্ববর্ণিত সর্বদানই যথারীতি করেন তবু মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। বস্ত্র এসেছে বিলেত থেকে (তখনকার দিনে দিশী কাপড় অল্পই পাওয়া যেত), ছত্র রেলি ব্রাদার্সের, বাসনকোসন অ্যালু-মিনিয়ামের এবং অন্যান্য আর সব জিনিসের পনেরো আনা এসেছে হয় বিদেশ থেকে, নয় দেশেরই বড় বড় শহর থেকে (শাঁখা জাতীয় মাত্র দু-একটি জিনিস আপন গ্রামের কিংবা গ্রামের বাইরের কুটিরশিল্প থেকে)। মোদ্দা মারাত্মক কথা—জমিদারের গ্রাম এবং/কিংবা আর পাঁচখানা গ্রাম নিয়ে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনগোষ্ঠী (ইউনিট) সে কোনো সাহায্যই পেল না। আখেরে দেখা যাবে কোনো কুটিরশিল্পই ফায়দাদার হল না, হল শিল্পপতিরা—দিশী এবং বিদেশী।

এবং লাওৎসে বলেছেন—অবশ্য বর্তমান চীনা সরকার সেটা

মানে না—যখনই দেখতে পাবে বড় শহরে বড় বড় ইরামত তখনই বুঝতে হবে, এগুলো গ্রামকে শুষে রক্ত সঞ্চয় করেছে। পতন অনিবার্য।

ধর্ম এখন পুণ্যের দোহাই দিয়ে দানের কথা জমিদারের সামনে তোলে না—আর জমিদারকে সে পাবেই বা কোথায়? হয়তো তিনি শহরে থাকেন, কিংবা সরকারের নূতন নীতির ফলে লোপ পেয়েছেন। তা সে যাই হোক, এ কথা তো ভুললে চলবে না, দানমাত্রই দান "পেরসে", পুণ্য নয়। গ্রাম পোড়াবার জন্য কেউ যদি দেশালাই চায় তবে আমি তো তাকে দেশালাই দান করে পুণ্য সঞ্চয় করি নে!

শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করলেই যে দান হত তা নয়। জামি মসজিদ নির্মাণ করে শাহ্-জাহান নিশ্চয়ই পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু তাজ বানাতে—অর্থাৎ খাসপেয়ারা বেগম সাহেবের জন্য গোর বানাতে—কোনো পুণ্য আছে বলে ইসলাম ফতোয়া দেয় না। তাই বোধ হয় পাশে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে একটুখানি পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু যে রাজা-বাদশা-জমিদারই এ সব পুণ্যকর্ম করতেন তাই নয়। বছর কুড়ি পূর্বে আমি মোটর-বাসে করে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে "পাগ্‌লা" গ্রামের কাছে এসে দেখি এক বিরাট মসজিদ। ড্রাইভার বললে, এক জেলে হাওর-বিলের ইজারা নিয়ে বিস্তর পয়সা জমানোর পর এ মসজিদ গড়িয়েছে।[২]

---

২ ঈষৎ অবান্তর হলেও এই নিয়ে একটি সমস্যার কথা তুলি। রোজার মাসে অসুস্থ ছিল বলে একজন লোক উপবাস করতে পারে নি। এখন ঈদ পরবের পর সে রোজা রাখতে যাবে, এমন সময় সে মসজিদ (কিংবা কুয়ো, কিংবা পান্থশালা—এ সবকে "সবীল-আল্লা" "ঐশ মার্গ", যে পথ আল্লার দিকে নিয়ে যায় বলা হয়) বানাতে চাইলে। তখন প্রশ্ন, সে উপবাস করা মুলতুবি রেখে মসজিদ বানাবে কি না? ভারতের মুসলমান যে "মানবধর্মশাস্ত্র" মানেন তাঁর মতে, রোজা পরে রাখবে। এ অনুশাসন যিনি দিয়েছেন, তিনি আসলে ইরানী।

এই বীরভূমে যে শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে তার পরোক্ষ কারণে কিছুটা পুণ্য কিছুটা স্বার্থ আছে। মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়ার সময় সর্বপ্রথম জলের চিন্তা করেছিলেন। কুয়ো তো খোঁড়াবেন, সে তো পাকা কথা, কিন্তু যদি সেটা শুকিয়ে যায়? শান্তিনিকেতনের অতি কাছে ভুবনডাঙা। রাইপুরের জমিদারবাবু ভুবনমোহন সিংহ সেখানে খাদের মাটি খনন করে নীচু জমির উপরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি উঁচু বাঁধ (দীঘি) পূর্বেই তৈরী করে দিয়েছিলেন। (মতান্তরে এটি রাইপুরের ঘোষালদের—এঁরা সিংহ পরিবারের পুরোহিত—ব্রহ্মত্র ছিল।) এই পুণ্য-স্বার্থে মেশানো বাঁধের উপর ভরসা রেখে মহর্ষিদেব এখানে আশ্রম গড়েন।৩

এখন আর কেউ বাঁধের জন্য ধর্মের দোহাই দেয় না। এখন অন্য পন্থা। গত নির্বাচনের সময় এই বীরভূমেরই একটি গ্রাম তিনজন প্রার্থীকে বলে, সরকারের সাহায্যে বা অন্য যে কোনো পন্থায় যে প্রার্থী তাদের গ্রামে ছটি টিউবওয়েল করে দেবে তাকে তারা একজোটে দেবে ভোট!

ভাবি, কোন্ শ্রাদ্ধের—না, কোন্ বাঁধের জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! ধর্ম তারই সঙ্গে ভেসে যায়॥

---

৩ অঘোর চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন আশ্রম, পৃঃ ৯ ও পরবর্তী।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয় সব দেশেই ধর্ম তার তালুক মুলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। আসলে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা 'সেকুলার' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি, এবং এই সেকুলার শব্দের অন্য এক অর্থ 'প্রোফেন'— 'হিরেটিক্যাল'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মবৈরী এমনকি ধর্মঘ্নও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। করলে বরঞ্চ ভালো হত। ধর্ম তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত। কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি, অত্যল্প হলেও। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। তার ভাবখানা অনেকটা এই :—ধর্ম বাদ দিয়ে যদি শিক্ষা দীক্ষা সবকিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাশের পর যদি কাজকর্ম করে দু'পয়সা কামাতে পারে—তবে ধর্ম অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালে, 'কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই।'—উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, 'ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল ত্রুটিহীন, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন?' কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, 'কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি।' সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি। সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মের সেই কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাটুকুও স্বীকার করে না।

বেদের বড় বড় দেবতা, ইন্দ্র বরুণ, এঁরা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ-নয় যে, কোনো বিশেষ যুগে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম-সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি বর্ষণ, ফসল-উৎপাদন, গোধনবৃদ্ধি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজন এঁদের না ডেকেও সমাধান হয়। তবে বিশ্বাসীজনের কথা স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিনব্যাপী অনাবৃষ্টি হলে তাঁরা এখনো হোমযজ্ঞাদি করে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনো মোকদ্দমা জেতার জন্য মৌলাআলীর দর্গায় গিয়ে ধর্না দেয়।[১] ভলটেয়ারকে কে যেন শুধিয়েছিল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না।'

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা মানুষকে তার ন্যায্য হক্কাহক্ক (হক্+না+হক, অ+হক্) ইন্সাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনো লাভ নেই, তখন মানুষ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্যদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্যরা অনুন্নত। তারা ঐসব দেবদেবীর সহায়তায় তখনো বিশ্বাস

---

১ দক্ষিণ মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক ঘুষখোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুক্‌রীয়া (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিম্বরে (পুল্‌পিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টীকাকার বলছেন, 'টিটকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।'

করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মৌলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্ষম 'যুক্তি'—পুরুত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ তো আর পূজাপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি-শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন —'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণী চড়ান না। তাই ঘেঁটু-মনসা মৌলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরো শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পুরুত দুজনারই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে, এস্থলে, আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনো প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরূপে বেদে যে মধুর এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বুদ্ধি দিয়ে যেটা বুঝেছি সেইটে কবির্মনীষীর প্রসাদাৎ তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

এরই তুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—একটি উদাহরণ দি। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুদ্ধি দিয়ে বুঝলুম, দুরাশা করে শুধু বঞ্চিত হতে হয়। তখন যদি কেউ এসে আবৃত্তি করে।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে।

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করি।

ফ্রান্স যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প তখন 'মার্সেইয়েজ' গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিল!

অনেকখানি দাগা খাওয়ার পর যখন মাইকেল 'আশার ছলনার' কথা ভাবছেন তখন যদি কুরান শরীফের 'উষস্' সুরা পড়তেন তবে কি অনেকখানি সান্ত্বনা পেতেন না ?

৯৩ অধ্যায়

উষস্

(অদ্—দুহা)

মক্কায় অবতীর্ণা

(একাদশ পংক্তি)

আল্লার নামে আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।

উষালগনের আলোর দোহাই,
নিশির দোহাই ওরে,
প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো
ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো
রয়েছে ভবিষ্যৎ
একদিন তুই হবি খুশী লভি
তাঁর কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়েছেন ঠাঁই
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ
দেখায়ে দেছেন তোরে॥
সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।
অসহায় জন, ওরে—
— দলিসনে কভু। ভিখারী-আতুর
বিমুখ যেন না হয়।

তাঁর করুণার বারতা যেন রে
ঘোষিস জগৎময়॥

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

সত্যেন দত্তের অনুবাদে আরম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।' অথচ আরবীতে 'অদ্-দুহা' অর্থ 'ঊষা।' ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আর্লি আওয়ার অব দি মর্নিং।' হয়তো সত্যেন দত্ত ভেবেছিলেন, আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনো নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন-সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় ঊষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে, রাত্রির অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য এবং নৈরাশ্য-জনক হ'ক না কেন, ঊষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এস্থলে বলছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যাঁরা কুরান শরীফকে 'মেটাফরিকালি' ও 'সিম্বলিকালি', (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে, ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎ-প্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশিকা 'কালী-পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন এখানে 'প্রভাতসূর্য' (ঊষস্, অদ্-দুহা) হজরৎ মুহম্মদের (দ) প্রেরিত-পুরুষ রূপে আগমনের সূচনা করছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু কুরান শরীফকে এ রকম রূপক অর্থে নেন না।

ধর্ম ও কম্যুনিজম্

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কর্মসূচী-এজেণ্ডাও বলতে পারেন—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হ'ক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাধিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন,—ভগবান অতিকষ্টে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট। ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট অতিশয় রদ্দী, তাঁর 'মাথুর' সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছেন, জীপ, মাইক ইত্যাদির সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না, তাঁর টাউটরা উভয় পক্ষের পয়সা খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডায় আণ্ডা ফেলে দুশমন কাফিরদের সঙ্গে। তবুও হয়তো তিনি আরও দু-চারখানা বেশী ভোট পেতেন, যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামুফ্লাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমরাজ ভদ্‌কার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কেনো তরীবৎ না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হুঁঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেস্টোতে ছিল তিনি ধর্মাচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্য দেবেন। অর্থাৎ পোষ্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিসটিং ব্যাঙ্ক! তবে এস্থলে নিছক সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে: গডের দুশমনরাই যে শুধু এই জিগির তুলেছিল, তা নয়, এর কম-সে-কম কুড়ি বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আস্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন, 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

তা সে যাই হোক, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রুশ থেকে বিদায় নিলেন।

'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!' পাঁড় আস্তিকরা অবশ্য বলবেন। 'ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তদ্বিপরীত প্রমাণ করার চেষ্টা বাতুলতা। এ সেই পুরনো লোক-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে
সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল
আ মরি আ মরি ॥

আত্মার উপলব্ধির চরম কাম্য ঈশ্বর। তিন কোটি গাধা-গরু-খচ্চর একজোট হয়ে ম্যাঁ, ম্যাঁ, না, না করলেই কি তিনি লোপ পেয়ে যাবেন!'

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রুশের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করি। সংগ্রামে পরাজিত, এমনকি, নিহত হলে আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিকজনের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাতে করে ধর্ম লোপ পান না। তাই যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন, 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল', কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন, 'ইসলাম ইন ডেনজার', তখন অধমের নিবেদন, পৃথিবীর তাবৎ হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না, তাবৎ মুসলমান মারা গেলেও ইসলাম শব্দার্থে লুপ্ত হবেন না। 'ইসলামের' শব্দার্থ, 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা।' শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আদেশ করছেন, তখন ঐ অর্থেই করছেন। 'সর্বধর্ম' বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি, different ideals, different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন 'আদর্শ' বুঝি-বা একে অন্যকে contradict করে ও সবাই সত্য। তা নয়। সত্য এক। সত্যে

দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণলাভ করে শ্রীরাধা বলছেন, 'দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা।'

তাই সত্য নিরূপণার্থে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়তো হয়। কিন্তু অবহেলা ভয়ঙ্কর জিনিস।

আমার মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে রোমকরা যদি প্রথম খ্রীষ্টানদের অত্যাচার না করে অবহেলা করতো, মক্কাবাসিগণ যদি মহাপুরুষ ও তাঁর সঙ্গীদের নির্যাতন না করতো তাহলে কি হ'ত?

উনবিংশ শতাব্দীর স্কুল-কলেজে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মকে অবহেলা করা হ'ল। গোড়ার দিকে যখন খ্রীষ্টানরা হিন্দুধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন বস্তুত হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভ হয়। ঐ চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দুদের ভিতর আরম্ভ হ'ল আত্মজিজ্ঞাসা—যে সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা নিয়ে হিন্দু শত শত বৎসর ধরে আপনমনে কোনো চিন্তাই করেনি, তাই নিয়ে আরম্ভ হ'ল তীব্র আলোড়ন আন্দোলন। আজকের দিনের ছেলে-ছোকরারা যে-রকম রাজনীতি, সাহিত্য ও ফুটবল-সিনেমা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে, ঠিক সেইরকম প্রায় একশ বছর ধরে চললো, ধর্ম এবং সমাজ নিয়ে আলোচনা। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, 'সমাজে যেসব অনাচার প্রচলিত আছে, এর পিছনে ধর্মের সম্মতি নেই।' তাই নিয়ে চললো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর আলোচনা, প্রচুর আন্দোলন।

পক্ষান্তরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয় এবং মন একত্র হয়, সেখানে যদি ধর্ম অবহেলিত হয়, সেখানে যদি ধর্ম নিয়ে তর্ক আলোচনা না হয়, তাহলে শহরের গলিতে গলিতে এবং গ্রামে-গ্রামে পুরুত-মোল্লারা পেয়ে যান প্রায় অবারিত রাজত্ব—উর্দুতে বলে, তখন তাদের 'দোনো হাত ঘি মে ঔর গর্দন ডেগ্ মে'—ডেগ্‌চির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে তারা তখন পোলাও খায়। ধর্মের নামে তখন সমাজে জমে ওঠে কুসংস্কারের স্তূপ।

বিবেকহীন রাজনৈতিকরা নেয় তার চরম সুযোগ। বারোয়ারি পূজার নাম করে তহবিল তছরুপাৎ, মা-দুর্গা চেহারা নেন ফিল্ম স্টারের কিংবা পূজা-কমিটি-সেক্রেটারির লেটেষ্ট গার্ল ফ্রেণ্ডের। আমার চোখের সামনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামলেন এক মহিলা। পেটকাটা ব্লাউজ, শাড়িখানি যেন রবারের তৈরি, সর্বাঙ্গে সেঁটে আছে—তাকাতে লজ্জা করে, লিপস্টিক-রুজের কথা বাদ দিন—কী আপদ, আপনারা জানেন, আমি কোন্ টাইপ মীন করছি—ইনি বাড়ির মহিলাদের নিয়ে মিলাদ শরীফ পরব করতে এসেছেন! পরে বন্ধুর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, দোয়াদরুদ পড়ার সময় মাথায় ঘোমটা টানার যে প্রয়োজন, সেটা নাকি ঐ মহিলা করে উঠতে পারছিলেন না, শাড়ি ছোট, বার বার খসে পড়ছিল, বার বার হাত ওঠাচ্ছিলেন বেয়াড়া ঘোমটা দুরস্ত করতে। শেষটায় নাকি সকলের দৃষ্টি পড়ে রইল মোল্লানীর হাত-কসরৎ দেখার দিকে।

শুনেছি রুশের সংবিধানে নাকি আছে, 'ধর্মনিরপেক্ষ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার অধিকার সর্ব কম্যুনিষ্টের আছে।' ফলে ঐ সময়কার একখানা রুশ ভাষায় লিখিত ইংরেজী শিক্ষার দ্বিতীয় সোপানের পাঠ্য-পুস্তকে নিম্নলিখিত কথোপকথন ঃ

প্রথম ছাত্র ঃ ঈশ্বর নেই।

দ্বিতীয় ছাত্র ঃ ওটা একটা বুর্জোয়া কুসংস্কার—ভূতেরই মত।

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাবুলে থাকাকালীন স্নিয়েশকফ নামক একটি পরিবার—বাপ, মা, ছেলে—তিনজনাই আমার কাছে ইংরেজী পড়ত। যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ জায়গাটি এল, তখন স্নিয়েশকফ একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'এটা থাক!' ব্যাপারটা ১৯২৭ সালের। তখনো কম্যুনিষ্ট রেভলুশন হার্ডবইলড এগ্ হয়নি। জোয়ানদের সকলেই 'ইকনে'র সামনে বিড়বিড় করে করে বড় হয়েছে। আমি বললুম,

'থাকবে কেন? আমি তো বৌদ্ধ ধর্মের বই পড়ি। সেখানেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়।'

তারপরে ১৯৪১।৪২ সনে রুশ যখন হিটলারের হামলায় যায়-যায়, তখন স্তালিন খুলে দিলেন বেবাক চার্চ, বিস্তর মঠ, নিমন্ত্রণ করলেন মিত্র ইংলণ্ডের ডাঙর পাদ্রীকে। আবার গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা উঠলো, 'হে ঈশ্বর, হোলি রাশাকে ('হোলি'? —তওবা, তওবা) বাঁচাও।'

সেই অরণ্যের মত জনসমাগম, ধর্মোচ্ছ্বাস দেখে স্তালিন খুশী হয়েছিলেন, না—পাঁড় কম্যুনিষ্টের যা হওয়া উচিত—ব্যাজার হয়েছিলেন, জানিনে। হয়তো বা বিষাদে হরিষ, কিংবা হরিষে বিষাদ। কে জানে।

আমার মনে হয়, ১৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত যদি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে তাকে অবহেলা করা হ'ত, তবে বোধহয় ঠিক এতটা হ'ত না।

এক ঝাণ্ডা

বহু শান্তিকামী জন, দেশ যখন স্বাধীন, তখন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন না। কারণ সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত, নানা পাণ্ডার নানা দল। এসব ঝামেলার ভিতর ঢুকতে হলে প্রথমত দরকার গণ্ডারের মত চামড়া, দ্বিতীয়ত, বিপক্ষকে নির্মমভাবে হানবার মত ক্ষমতা, তৃতীয়ত, দেশের নেতা হওয়ার মত এলেম এবং তাগদ আমার আছে—এই দম্ভ। যাঁদের এ-সব নেই, তাঁরা হয়তো আপন গণ্ডির লোককে তাঁদের মতামত জানান, বড়জোর কাগজে লিখে সেগুলো প্রকাশ করেন, কিন্তু দৈনন্দিন রাজনীতি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলেন।

কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন তাঁরা এক ঝাণ্ডার নিচে এসে দাঁড়ান। সেদিন এসেছে।

পরাধীন জাতের একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করা। স্বাধীন জাতি আক্রান্ত হলে তার একমাত্র রাজনীতি আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। সে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সে দেশের অন্য কোনো রাজনীতি থাকতে পারে না। বিধান সভা, রাজ্যসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, এমন কি, পাড়ার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানেও তখন বিরুদ্ধ পক্ষ বলে কিছু থাকতে পারে না। দেশের লোক যাকে নেতা বলে মেনে নিয়েছে তাকে তখন প্রশ্নজালে উদ্ব্যস্ত না করা, কিংবা গুরুগম্ভীর মাতব্বরী-ভর্তি 'উপদেশ' দিয়ে তাঁর একাগ্র মনকে অযথা চঞ্চল না করা। যদি সে নেতার প্রতি দেশের আস্থা চলে যায়, তবে তাঁকে তাড়াবার জন্য গোপনে দল পাকাতে হয় না। দেশের সর্বসাধারণ তখন চিৎকার করে ওঠে, ও সে সময় তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। ১৯৪০-এর চেম্বারলেন যেরকম মানে মানে সরে দাঁড়ালেন।

এটা শুধু সম্ভব, যেখানে গণতন্ত্র আছে। ডিক্টেটরদের স্বৈরতন্ত্রে এ-ব্যবস্থা নেই। সেখানে গেস্তাপো, ওগপু বজ্রহস্তে জনসাধারণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখে—যতদিন পারে। তারপর একদিন মুস্‌সলিনিকে মরতে হয় গুলি খেয়ে এবং মাথা নিচের দিকে করে ঝুলতে হয় ল্যাম্পপোস্ট থেকে, হিটলারকে মরতে হয় আত্মহত্যা করে।

রবীন্দ্রনাথ একস্থলে বলেছেন, 'আমি যে আমার ভগবানে বিশ্বাস করি তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছেন'—ঠিক-ঠিক কথাগুলো আমার মনে নেই বলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

আমি যে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস করি, তার কারণ তাঁকে অবিশ্বাস করার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলেই সে-স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন বলেই আপনাকে, আমাকে, আর পাঁচজনকে বিশ্বাস করেছেন—আমরা যে-রকম তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁর সে-বিশ্বাস ভঙ্গ না করি। শত্রু দেশ থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই ভাষায় বলি, "আরাম হারাম হ্যায়!"

* * * *

আমার দুঃখের অবধি নেই, শেষ পর্যন্ত চীনদেশ আমাদের আক্রমণ করল! প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে, তখন ভারতবাসীমাত্রেই মর্মাহত হয়েছিল। সদয় পাঠক এস্থলে আমাকে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করতে অনুমতি দিন। আমি তখন জর্মানীতে পড়াশুনা করি। সে সময় আমাকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে চীন-জাপানের কথা ওঠে। আমি বলেছিলুম, 'এই যে অর্বাচীন জাপান সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে তার পিতামহ চীনের বুকে বসে

তার দাড়ি ছিঁড়ছে, এর চেয়ে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে!' পরদিন দুই বয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত—এঁরা দুজনেই আপন দেশের অধ্যাপক। জর্মানী এসেছিলেন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জন আমার দু-হাত চেপে ধরে বললেন, 'জাপান শক্তিশালী জাতি। অক্ষম চীনের প্রতি দরদ দেখিয়ে তার বিরাগভাজন হতে যাবে কে? আপনি কাল সন্ধ্যায় যা বললেন, সে শুধু ভারতবাসীই বলতে পারে।' অন্য জনের চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এসেছে। আমি জানতুম, চীনা ভদ্রসন্তান অত্যন্ত সংযমী হয়, সহজে আপন অনুভূতি প্রকাশ করে না, কিন্তু এখানে এ কী করুণ দৃশ্য। আর আমি পেলুম নিদারুণ লজ্জা। আমি পরাধীন দেশের জীবন্মৃত অর্ধ-মনুষ্য। আমার কী হক্ক এসব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করবার।

আজ জানতে ইচ্ছা করে, এই দুই অধ্যাপক এখনো বেঁচে আছেন কি না? থাকলে তাঁরা কি ভাবছেন?

কিন্তু এ-সব কথা বলার প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের যে কত যুগের হার্দিক সম্পর্ক, সে তো ইস্কুলের পড়ুয়াও জানে। শুধু এ-দেশে নয়, চীন দেশেও। কারণ চীন দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি আছে; আজ যদি চীনের টুথব্রাশ-মুস্‌টাশ্‌হীন নয়া হিটলাররা সে-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বর্বর অভিযানই কাম্য মনে করেন, তবে যে-সব সভ্য-ভূমিতে এখনো ঐতিহ্য সংস্কৃতি মর্যাদা আছে, তারা চীনের এই অর্বাচীন আচরণ দেখে স্তম্ভিত হবে। অবশ্য এ-আচরণ সম্পূর্ণ নূতন নয়। রুশ দেশ যখন প্রথম কম্যুনিজম 'ধর্ম' গ্রহণ করে, তখন সে-দেশেও তার গগল, পুশকিন, তুর্গেনিয়েভ, চেখফকে 'বুর্জুয়া' 'শোষক', 'প্রগতি-পরিপন্থী' বলে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই দেখতে পেলে, কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে চাইলে অন্য কথা, কিন্তু—

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—মানবসভ্যতার যে চিরন্তন দেয়ালী উৎসব চলছে, তাতে যদি রুশ তার ঐতিহ্যের প্রদীপ নিভিয়ে বসে থাকে, তবে সে অন্ধকার কোণ থেকে কেউ তাকে টেনে বের করবে না। তাই আজ আবার রুশ দেশ বিনা বিচারে তার সাহিত্যিকদের পুস্তক ছাপে—সেগুলোতে সে যুগের অনাগত কমিউনিজমের জয়ধ্বনি থাক আর নাই থাক।

তাই যখন কম্যুনিজম গ্রহণ করার পর চীন বললে, পৃথিবীতে হাজার রকমের ফুল ফুটুক—তখন আমরা মনে করেছিলুম, অপরের প্রতি সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য স্মরণ করেই চীন এ-কথা বলেছে, কিয়ৎকালের জন্যে রুশ আপন ঐতিহ্য অস্বীকার করে যে মূর্খতা দেখিয়েছিল, তার থেকে সে শিক্ষালাভ করেছে, এবং এখন লাওৎসে কনফুৎস এবং বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সঙ্গে কম্যুনিজম মিশে গিয়ে এক অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা, ধন-বণ্টন-পদ্ধতি দেখা দেবে। তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা কম; কিন্তু সে এক্সপেরিমেন্ট যে বিশ্বজনের কৌতূহল আকর্ষণ করবে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই 'হাজার রকমের ফুল ফুটুক' যে নিতান্ত মুখের কথা, সেটা তিন দিনেই ধরা পড়ে গেল। আমরাই যে শুধু ধরতে পেরেছি তাই নয়, চীনা আক্রমণের পরের দিনই এক সুইস কাগজে একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরোয়। ছবিতে জনমানবহীন বিরাট বিস্তীর্ণ এক বরফে ঢাকা মাঠে মাত্র একটি ফুল ফুটেছে। তার নিচে লেখা 'ভারতবর্ষ'। তারই পাশে দাঁড়িয়ে চু এন-লাই। পাশে যে সখা দাঁড়িয়ে, তাকে বলছেন, 'এ-ফুলটি আমি তুলে নেব।'

অত সহজ নয়।

একদিন জাপান তার উত্তমর্ণ চীনকে আক্রমণ করেছিল। আজ চীন তার উত্তমর্ণ ভারতকে অক্রমণ করেছে।

চীন দেশ কখনো কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নি। লাওৎসে,

কনফুৎস যে জীবনদর্শন প্রচার করেছেন, তাতে আছে কি করে সাধু, সৎ জীবন যাপন করা যায়, কিন্তু ইহলোক পরলোকে মানুষের চরম কাম্য কি, এই পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয়াশ্রিত মরদেহ-চৈতন্যের ঊর্ধ্বলোকে কি আছে, কি করে সেখানে তথাগত হওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তাঁরা কোনো চিন্তা করেন নি।

অথচ বুদ্ধের বাণী যখন মৃদু কাকলি রবে চীনদেশে পৌঁছল, তখন থেকেই বহু চীনা এদেশে এসেছেন। ইৎসিং, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চাঙ, আরো সামান্য কয়েকটি নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এঁরা ছাড়া এসেছেন আরো বহু বহু চীনা শ্রমণ। বিশেষ করে য়ুয়ান চাঙের ভ্রমণ-কাহিনী পড়লে আজও মনে হয়, যেন পরশু দিনের লেখা! বৌদ্ধ শ্রমণ যেমন যেমন ভারতের নিকটবর্তী হতে লাগলেন, তখন তাঁর হৃদয়মনে কী উত্তেজনা, ভারতবর্ষে পৌঁছে তার প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে তিনি কী রকম রোমাঞ্চ কলেবর! কামরূপের রাজা যখন তাঁকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে পূবদিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন ঐ আপনার মাতৃভূমি, পাঁচশ মাইল হয় কি না হয়, তখন বৃদ্ধ শ্রমণ চিন্তা করেছিলেন, কত না বিপদের সম্মুখীন হয়ে, কত না ঘোরালো পথে তাঁকে তথাগতের জন্মভূমিতে আসতে হয়েছে।

ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন তাঁকে সসম্মানে সখারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

আজ যদি চীন সে সখ্য ভুলতে চায়, ভুলুক।

ভারতও তার রুদ্র রূপ দেখাতে জানে।

জয় হিন্দ।

"রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?"

চীনেদের ঠেঙিয়ে বের করতে হবে, এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু 'রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?' এর অর্থটি সরল। যে মেয়ে রাঁধছে তার যদি খোঁপাটি তখন ঢিলে হয়ে যায় তবে সে কি রাঁধতে রাঁধতেই চুল বাঁধে না? রান্না বড়ই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু চুল বাঁধাটা এমন কিছু মারাত্মক অপরিহার্য শুভকর্ম নয় যে, তদভাবে বাড়ীসুদ্ধ লোক মারমুখো হয়ে চেলি নিয়ে বাড়ির বউয়ের দিকে তাড়া লাগাবে। তবু বাড়ির বউ জানে, রাঁধতে হয়, চুলও বাঁধতে হয়।

অর্থাৎ চীনাকে ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচটা কাজ আছে। সেগুলো আপাত দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে না হলেও দেশসুদ্ধ লোকের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে লিপ্ত হয়ে শিবনেত্র হয়ে যাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। অবশ্য এ-কথা সত্য, যুদ্ধের বাজারে কোন্‌টা যে 'রাঁধা' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক আর কোন্‌টা যে 'চুল বাঁধা' অর্থাৎ দোহার এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে যায়। ধড়িবাজ মেয়ে যে চুল বাঁধার ছল করে রান্নায় গালিফি করে, এটা জানা কথা, এবং কট্টর গিন্নী যে বেধড়ক রান্নার তোড়ে খাটাশের মত চেহারা বানিয়ে তোলেন সেও জানা কথা।

এ দুটোর তফাত করবেন দেশের কর্তাব্যক্তিরা। আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। তবে কিঞ্চিৎ অতি সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। একবার আমি অতিশয় অনিচ্ছায় এক খণ্ড যুদ্ধের মাঝখানে তুচ্ছ উলুখড়েরও জীবন যে কী মর্মান্তিক নিদারুণ হতে পারে তার প্লীহাতঙ্কী—পীতাতঙ্কের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলবেন না, ওটা আমার নেই—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলুম। সে দুর্দিনে পেটের ভাত জুটছিল না বলে ভয়ের চোটে সেটা শুকিয়ে চাল হতে পারে নি।

তারই বর্ণনা পুস্তকাকারে ছাপিয়েও ছিলুম। তবে আপনারা সেটি পড়েছেন বলে মনে হয় না—বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট তো তাই বলে।

দ্বিতীয়বার আমি স্যানা হয়ে গিয়েছি—কথায় বলে, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' সন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত উভয়পক্ষের যুযুধানকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন আমার প্লীহা দ্বিতীয়বার উলুখড় হতে কবুল জবাব দিল তখন আমি নিরপেক্ষ স্থল অকুস্থলে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আমি আমার যুবতী স্ত্রী নিয়ে পলায়ন করি ('যঃ পলায়তি স জীবতি'—কে বলে আমি সংস্কৃত জানি নে!)।

দেশে ফিরেই কানটি সেঁটে দিলুম বেতারের লাউড্ স্পীকারের সঙ্গে। জর্মান কি বলছে না বলছে সে তো ইংরেজ এই কালা আদমীকে সদয় হয়ে শোনাবে না। তারপর মস্কো বেতার। সেটা যখন হিটলার গুঁড়িয়ে দিল তখন কুইবিশেফ। সেটাও যখন দাঁতমুখ খিঁচিয়েও শোনা যায় না তখন রুশদেরই ছোট্ট বেতার কেন্দ্র আজরবাইজান—ভাগ্যিস তারা ফার্সীতেও খবর প্রচার করত।

যুদ্ধের পর হালের বলদ নৌকার পাল বিক্রী করে যুদ্ধ বাবদে জর্মান এবং ফরাসী বই কিনেছি দেদার। ইংরিজী বই এদেশে পাওয়া যায়। চুরি করে চালিয়ে নি।

মোকা পাওয়া মাত্রই দু'বার জর্মনি ঘুরে এসেছি। ১৯৫৮ এবং এই গ্রীষ্মের ১৯৬২-এ। এবং জোর গলায় পরিষ্কার করে ফের বলতে হল, প্রধানত মিশেছি নিম্ন মধ্যশ্রেণী এবং ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে—তাদেরই মিলন কেন্দ্র ক্লাইপেতে, লকালে বা বিয়ারখানায়,—যা খুশি বলতে পারেন। বড়লোকদের সঙ্গে মিশেছি অল্পই। তবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কিছুটা ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় মিশতে হয়েছে খানিকটা। ক্রুপ্ স্টিনেসদের সঙ্গে

মেশবার কোনো সুযোগই হয় নি। আমার লেখা গোগ্রাসে না গিলে আস্তে আস্তে পড়লেই একথাটা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। জর্মনি সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান-গম্যি তার ৯০ নঃ পঃ বিয়ারখানা থেকে সংগৃহীত, বাকিটা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে। তাদের সক্কলেরই মোটরগাড়ি ছিল কিন্তু দামী, হাউস-টখটর, এমন কি হেল্পিংহ্যাণ্ডও ছিল না।

এর থেকে আমার যা সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই জোরে দু'একটি কথা নিবেদন করি।

এই 'চুল বাঁধার' কথাই ধরা যাক্।

১৯৩৯-এ হিটলার যখন লড়াইয়ের জিন্ বোতল থেকে বের করে আসমানে ছেড়ে দিলেন তখন যুদ্ধ বাবদে তাঁরও অভিজ্ঞতা ছিল কম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি করপরেলরূপে লড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাতে করে তো 'অল আউট ওয়োর' সম্বন্ধে ওকীব-হাল হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তাই তিনি ভাবলেন, সর্বপ্রথম উচিত কর্ম হচ্ছে, বিলাসব্যসন ত্যাগ করা। তাই বন্ধ করে দাও হেয়ার ড্রেসিং সলূনগুলো।

এ স্থলে একটুখানিক সবিস্তর বুঝিয়ে বলতে হয় জর্মনির শহুরে মেয়েরা এই ড্রেসিং সলূনের উপর কতখানি নির্ভর করে। এবং আজকের চেয়ে ১৯৩৯ সালে নির্ভর করত আরো অনেক বেশী। তখনো পার্মেনেন্ট ওয়েভ-এর জোর রেওয়াজ। সলূনওলী প্রথম চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে পেরিয়ে দিয়ে এক মুকুট, চালিয়ে দেয় ইলেক্‌টিরি যন্ত্র। এসবের মারপ্যাঁচ আমি বুঝি নে। তবে মুকুট খোলার পর দেখা যায়, দিব্য ঢেউ খেলানো চুল হয়ে গিয়েছে। নূতন করে গোড়ার দিকের চুল বেশ খানিকটে না গজানো পর্যন্ত এ ঢেউ লোপ পায় না।

যারা সলূনে ঢেউ-খেলানো চুলের মাথা বানিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মস্তকে হল বজ্রাঘাত—হিটলারের এই হুকুম শুনে।

শহরের বহু বহু মেয়ে আপন চুলের তদারকি নিজে করতে পারে না। এক মাসের ভিতরই দেখা গেল মাথায় মাথায় বাবুইয়ের বাসা। কিন্তু কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে হুজুর হিটলারের কাছে এর প্রতিবাদ জানায়। সবাই গিয়ে কেঁদে পড়লেন ফ্রাউ গ্যোবেল্‌সের পায়ে। এভা ব্রাউন, রীফেনটালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পূর্বে হিটলার প্রায় প্রতিদিন গ্যোবেল্‌স্‌দের বাড়ি যেতেন। শেষদিন পর্যন্ত হিটলারের উপর ছিল তার অসাধারণ প্রতিপত্তি— স্বৈরতন্ত্রের সর্বাধিনায়কের উপর যতখানি হতে পারে। (তাই ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ যখন জানতে পারলেন, হিটলার আত্মহত্যা করবেন, তখন তিনি বললেন, 'ফ্যুরারহীন পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কি লাভ, আমিও আত্মহত্যা করব', এবং তিনি তাই করেছিলেন)।

ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্‌ হিটলারের সামনে গিয়ে বললেন, 'মাইন ফুরার (প্রভু আমার)! আপনি কি চান যে আপনার জওয়ানরা রণক্ষেত্র থেকে ছুটিতে ফিরে এসে দেখুক কতকগুলো উস্কোখুস্কো চুলওলী খাটাশীদের?'

হিটলার আইন নাকচ করে দিলেন।

তাই বলছিলুম রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না?

*　　*　　*　　*

এখন প্রশ্ন, কোন্‌ কোন্‌ কর্ম স্থগিত রাখতে হবে, আর কোন্‌ কোন্‌ কর্ম আরো জোরসে চালাতে হবে। পূর্বেই এ-প্রশ্নের আভাস দিয়েছি এবং এখনো বলছি, আমি সমাজপতি নই, কাজেই আমি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তবে একটা কথা বলতে পারি, বুক ঠুকে বলতে পারি আমরা যেন হাসতে ভুলে না যাই। অর্বাচীন চীনের আচরণে ব্যথিত হয়ে আমাদের শিবুদা (শিবরাম চক্রবর্তী) যদি মস্করা করতে ভুলে যান তবে আমি হাসতে হাসতে তাঁকে জবাই করব।

এই হাসতে পারাটা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। পণ্ডিতজী চীনকে বিশ্বাস করে যে ঠকেছেন তাই নিয়ে সুবে বিলেত-মার্কিন পশ্চিম ইয়োরোপ হাসছে। কত না কার্টুন ব্যঙ্গচিত্র বেরচ্ছে। আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারছি নে সত্য, কিন্তু শীতকালে ঠোঁট ফেটে গেলে লোকে যে রকম হাসে সে রকম হাসছি তো সত্য। কারণ একা পণ্ডিতজী তো চীনকে বিশ্বাস করেন নি, আপনি আমি রামা-শ্যামারাও করেছিলুম। এখন সবাই আমাদের নিয়ে হাসছে। এ অবস্থায় আমাদের চটে যাওয়াটা অতিশয় অরসিকের কর্ম হবে। আমরাই শুধু দুনিয়ায় পাগলামী, দুষ্টোমি দেখে হাসব, আর আমাদের করলতা আমাদের ভালো-মানষামী দেখে অন্য লোকের হাসি আমরা সইব না, এটা কোনো ভালো কথা নয়।

এই তো সেদিন একটা রসিকতা পড়ছিলুম।

পূর্ব জর্মনীর এক কুকুর পশ্চিম জর্মনির মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছে। অতিথিবৎসল দাদা শুধোলে, 'তোকে কি খেতে দেব, বল দিকিনি, ভাইয়া! গুটিকয়েক সরেস, তাজা খাজা হাড্ডি চিবুবি?'

পূর্ব জর্মনির কুকুর বললে, 'না, থ্যাঙ্ক্! আমাদের ওদিকে মেলাই খাবার রয়েছে। তোদের চেয়ে অনেক ভালো!'

দাদা শুধোলে, 'তবে, তবে, কিছু একটা চাটবি? জল? শরবৎ? দুধ? মদ?'

'না ওসবে আমার দরকার নেই। বাড়িতে ঢের রয়েছে।'

'তাহলে চল, আমার ঘরে একটু জিরিয়ে নে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার দিব্য সুন্দর ঘর রয়েছে বাড়িতে।'

বড়দা তখন চটে গিয়েছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'তবে এখানে মরতে এসেছিস কেন? তোর যখন সবই রয়েছে।'

'ও দাদা! এখানে যে প্রাণভরে ঘেউ ঘেউ করা যায়। আমি ঘেউ ঘেউ করব।'

*　　　*　　　*

ঐ হল লৌহযবনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চেঁচিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইন কানুন সর্বনেশে। আমরা এদিকে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

ওয়ার এম্

রাজা প্রজাগণকে কহিবেন,

'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত১ বংশের২ ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ্ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।৩ আর শত্রুগণ যদি বলপূর্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে যার-পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থে তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন উৎপাদন-পূর্বক৪ রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদ্কালে ধনকে প্রিয় বোধ করা অত্যন্ত অকর্তব্য।'

১-২ ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়। অনুবাদকের টীকা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 'বসুমতী'।

৩ আজকের দিনের 'উয়োর-বন্ড্, ডিফেন্ সার্টিফিকেট্'।

৪ ধন উৎপাদনের একমাত্র পন্থা, প্রোডাক্শন বাড়ানো। অর্থাৎ ইন্ডাসট্রিয়াল ও এগ্রিকালচরল তৈজসপত্র বাড়ানো। না হলে শুধুমাত্র ধনে সর্ব সমস্যার সমাধান হয় না। কথিত আছে, বর্বর মঙ্গলরা যখন প্রবল প্রতাপশালী আব্বাসী খলিফার রাজধানী বাগ্দাদ দখল করে খলিফাকেও বন্দী করতে সক্ষম হল তখন মঙ্গলসেনাধ্যক্ষ খলিফাকে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনের জন্য খলিফার সামনে রাখলেন থালা থালা সোনা-জহর; নিজের সামনে রাখলেন উত্তম উত্তম

*　　　*　　　*

ঐ হল লৌহযবনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চেঁচিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইন কানুন সর্বনেশে। আমরা এদিকে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

ওয়ার এম্

রাজা প্রজাগণকে কহিবেন,

'দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ফলিত১ বংশের২ ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ্ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।৩ আর শত্রুগণ যদি বলপূর্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, আমি তোমাদের সমৃদ্ধি-দর্শনে যার-পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপৎকালে রাজ্যরক্ষার্থে তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন উৎপাদন-পূর্বক৪ রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদ্‌কালে ধনকে প্রিয় বোধ করা অত্যন্ত অকর্তব্য।'

১-২ ফলবান্ বংশের—বাঁশের ফল হইলে বাঁশ মরিয়া যায়। অনুবাদকের টীকা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 'বসুমতী'।

৩ আজকের দিনের 'উয়োর-বন্‌ড্, ডিফেন্ সার্টিফিকেট্'।

৪ ধন উৎপাদনের একমাত্র পন্থা, প্রোডাক্‌শন বাড়ানো। অর্থাৎ ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল ও এগ্রিকালচরল তৈজসপত্র বাড়ানো। না হলে শুধুমাত্র ধনে সর্ব সমস্যার সমাধান হয় না। কথিত আছে, বর্বর মঙ্গলরা যখন প্রবল প্রতাপশালী আব্বাসী খলিফার রাজধানী বাগ্‌দাদ দখল করে খলিফাকেও বন্দী করতে সক্ষম হল তখন মঙ্গলসেনাধ্যক্ষ খলিফাকে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনের জন্য খলিফার সামনে রাখলেন থালা থালা সোনা-জহর; নিজের সামনে রাখলেন উত্তম উত্তম

রাজ্যপালন সম্পর্কে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীষ্মকে প্রশ্ন করার উত্তরে ভীষ্মের উত্তর। মহাভারত, শান্তিপর্ব, সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে তৃতীয় খণ্ড, ৪৫০ পৃঃ॥

যুদ্ধ কাম্য নয়। একথা সত্য, যুদ্ধের সময় অনেকেই আপন শৌর্য, বীরত্ব দেখিয়ে আপন জাতকে গৌরবান্বিত করেন, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যায়, যুদ্ধে অমঙ্গলের অংশই বেশী।

তাই যখন কোনো জাতিকে বাধ্য হয়ে সংগ্রামে নামতে হয়—আজ আমরা যে-রকম নেমেছি—তখন তাকে খুব ভালো করে, অতিশয় সুস্থ মস্তিষ্কে আবেগ-উচ্ছ্বাসরহিত হৃদয়ে চিন্তা করে নিতে হয়, তার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায়? একে বলা হয়, ওয়ার এম্।

তার খানিকটে নির্ভর করে বিপক্ষের মতলবটা কি, সে কি চায়?

চীন প্রাচ্যদেশের জনবলে বলীয়ান মহারাষ্ট্র। কিন্তু জন

আহারাদি। খেতে খেতে খলিফাকে শুধোলেন, 'হুজুর, খাচ্ছেন না কেন?' হুজুর চুপ করে রইলেন। পুনরায় সেই প্রশ্ন। পুনরায় 'নো রিপ্লাই।' তৃতীয়-বারে নিরুপায় হয়ে খলিফা বললেন, 'এগুলো তো খাবার জিনিস নয়।' মঙ্গল বললে, 'সে কি হুজুর, আপনার রাজত্ব জয় করবার পর আপনার ধনাগারে পেলুম এই সব সোনা-জহর। ভাবলুম এগুলো বুঝি আপনি খান। অন্য কোনো কাজে লাগাননি তাই।'

অর্থাৎ, শুধু ধন দিয়ে সব-কিছু হয় না।

তা হলে ধনী লোকের বাড়িতে ডাকাতি হত না।

হিটলার কি আদর্শ নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সেটা জানবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ দেউলে রাষ্ট্রকে তিনি কি করে জোরদার করলেন সেটা জানা উচিত। তিনিও বলেছিলেন, 'আমার ব্যাঙ্কে সোনা-জহর নেই? বয়ে গেল! আমি চাই জোয়ান মেয়েমদ্দ। যারা উৎপাদন করতে পারে। আপন বাহুবলে। আমি রাজা, তখন সেগুলো কিনব।' তাই ভীষ্মদেব ধন উৎপাদনের আদেশ দিয়েছিলেন।

থাকলেই ধন হয় না। চীন গরীব দেশ। তাই গত দশ-বার বৎসর ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কি করে সে আপন ধনদৌলত বাড়াতে পারে। প্রধানত রুশের সাহায্যে।

ইতিমধ্যে এই নয়া কম্যুনিষ্ট জাত—অর্থাৎ চীন—খানদানি কম্যুনিষ্ট জাত—অর্থাৎ রুশকেও খানদানিত্বে এক কাঠি ছাড়িয়ে যেতে চাইল। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আকছারই হয়েছে। পূব-বাংলায় মুসলমানরা বলে, 'নয়া মুসলমান গোরু খাওয়ার যম হয়।' অর্থাৎ শ্মশানের চাঁড়াল যদি হঠাৎ দৈবযোগে পৈতে পেয়ে যায় তবে তার বাড়িতে যা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘটা লাগে তা দেখে জাত-ব্রাহ্মণ পরিত্রাহি রব ছাড়ে। চীন বেশ কড়া গলায় রাশাকে বললে, 'তুমি যেভাবে মার্কিনিংরেজের সঙ্গে দহরম-মহরম করছো সেটা মার্কস-লেনিনবাদের বিশ্ব-কম্যুনিজম আশু আনয়ন করার বিপক্ষে যায়। তুমি শান্তি চাইছ; এ করে এখনকার মত শান্তি পাচ্ছো বটে, কিন্তু চিরন্তন শান্তি আসবে একমাত্র বিশ্ব-কম্যুনিজমের ফলরূপে। তার জন্য দরকার আপন "ধর্মে"—অর্থাৎ কম্যুনিজমে—বিশ্বাস। তার অর্থ শান্তির মারফতে ইহসংসারে কোনো প্রকারের প্রগতি হয় না। সর্ব প্রগতি যুদ্ধের মাধ্যমে। অতএব মার্কিনিংরেজ যেখানে বলবে "শান্তি চাই", তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবে "যুদ্ধ চাই"। এই করে আসবে বিশ্ব-কম্যুনিজম।'

রুশ বললে, 'হক্ কথা। কিন্তু মার্কস-লেনিনের আমলে অ্যাটম্ বম্ ছিল না। এখন যদি যুদ্ধ চালাই তবে আখেরে যে সব-কুছ্ লণ্ডভণ্ড ছারখার হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে কে?'

এখানে এসে চীন কিছু বলে না। কারণ চীন জানে, রুশ ইংলণ্ড আমেরিকার জনসংখ্যা ৯৯ পার্সেন্ট মরে গেলেও তার আপন দেশে থাকবে লক্ষ লক্ষ লোক। কারণ তার জনসংখ্যা সক্কলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। তারাই তখন পৃথিবীর রাজত্ব করবে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। ১৯৩৮-এ ইংরেজ-ফরাসী চেয়েছিল হিটলারে-স্তালিনে লড়াই লাগিয়ে দুই ব্যাটাই মরে; তাঁরা পরমানন্দে বিশ্বসংসারটা চষে বেড়াবেন।

কট্টর কম্যুনিষ্ট বিশ্বাস করে যে, যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না তারা সবাই এক গোয়ালের গরু। তার কাছে মার্কিন যা ভারতবাসীও তা। ইংরিজীতে কথায় কথায় বলে যে আমার স্বপক্ষে নয় সে আমার শত্রু—নিরপেক্ষ বলে কোনো জিনিস নেই। কাজেই আমরা ভারতীয়েরা যে চীনের শত্রু-মিত্র কিছুই নই, আমরাও তার শত্রু—আমাদের একমাত্র 'অপরাধ' আমরা কম্যুনিষ্ট নই—অথচ ধর্ম জানেন, আমরা কম্যুনিষ্টদের প্রতি যতখানি সহনশীল, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা পোল্যাণ্ড অতখানি হবে না। যদি আজ পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তবে কম্যুনিষ্টদের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। এই যে পশ্চিম জার্মানী গণতান্ত্রিক দেশ, সেও কম্যুনিষ্টদের বরদাস্ত করে না।

খ্রুশ্চভ এ তত্ত্বটি ভালো করেই জানেন। তাই তিনি ভারতকে শত্রুর চোখে দেখেন না। তাঁর বিশ্বাস তিনি এবং অন্য কম্যুনিষ্টরা যদি আমাদের দিকে চোখ রাঙায়—আক্রমণ দূরে থাক—তবে আমরা পুরোপাক্কা ক্যাপিটালিষ্ট হয়ে গিয়ে মার্কিনকে আমাদের দেশে বিমানঘাঁটি বানাতে দেব, এবং শেষ হিসেবের দিনে তার হয়ে রুশের বিরুদ্ধে লড়ব।

চীন যখন রাশাকে আমাদের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন করতে পারলো না, এবং শুধু তাই নয়, রুশ যখন চীনের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত না করতে পেরে তার সর্বসাহায্য বন্ধ করে দিল—শুনতে পাই রাশানরা চীন ত্যাগ করার ফলে তাদের তৈরী কারখানাগুলো চালকের অভাবে খাঁ খাঁ করছে—তখন চীন বললে, 'এটার একটা ইস্‌পার-উস্‌পার করতে হবে। আমি ভারত আক্রমণ করে দেখি রুশ তখন কি করে? সে তো আর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র—অর্থাৎ ভারতকে সাহায্য করতে পারবে না।'

এইটে চীনের গৌণ ওয়ার এম্—যুদ্ধের উদ্দেশ্য।

মুখ্য ওয়ার এম্ তবে কি?

পোলাণ্ড-রুশের বিরুদ্ধে হিটলারের ওয়ার এম্ ছিল, (১) ওদের সৈন্য-বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করা, (২) ওদের নেতৃস্থানীয় কমিসারদের নিধন করা—তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক আর নাই করুক, অর্থাৎ কোল্ড্ ব্লাডেড মার্ডার। (৩) তাদের রাজত্বে জর্মনদের বসতি স্থাপনা করে তাদের দিয়ে দাসের কাজ করানো।

রুশভেল্ট ঠিক অতখানি চান নি। তবে তিনিও জর্মনদের কাছ থেকে শর্তহীন আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন—আন্‌কণ্ডিশনাল সারেণ্ডার। অর্থাৎ তিনি নাৎসি গুণ্ডা ও জর্মন জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন নি। চার্চিল এটা পছন্দ করেন নি—তিনি চেয়েছিলেন নাৎসি রাষ্ট্রের পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ঐ ছিল তাঁর ওয়ার এম্।

চীন আমাদের সমূলে ধ্বংস করে এ-দেশে চীনা চাষাভুষোর বসত করতে চায় নি, কিন্তু চীনের অন্যতম ওয়ার এম্ ছিল এ-দেশে কম্যুনিস্ট রাজ বসানো। চীন আশা করেছিল, সে ভারতে হামলা দেওয়া মাত্রই এ-দেশের কম্যুনিস্টরা দেশের জনসাধারণকে তাতিয়ে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বসাতে পারবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল না। এমন কি অনেক খাঁটি কম্যুনিস্ট চীনের এ আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছেন এবং অনেকেই পণ্ডিতজীর ঝাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন—আর খ্রুশ্চভ-পন্থীরা তো রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

স্মরণ রাখা উচিত, চীনাদের এ ওয়ার এম্ উপস্থিত মুলতবি থাকলেও সেটাকে সে কখনো বর্জন করবে না। আমাদের তার জন্য হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে—হয়তো বা বহু বৎসর ধরে।

আমার মনে হয়, চীন চায় আমাদের পঙ্গু করে রাখতে।

প্রাচ্য দেশের দুই বিরাট ভূখণ্ড চীন এবং ভারত। ভারত কম্যুনিস্ট না হয়েও দেশের ধনদৌলত বাড়াতে চেয়েছে, আর চীন কম্যুনিজমের মাধ্যমে। এবং চীন যে বিশেষ সফল হয় নি এ কথা বিশ্বসুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি সেও জানা কথা। আখেরে তা হলে আমরাই প্রাচ্য দেশগুলোর নেতৃ-স্থানীয় হব। চীনের কর্তারা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না।

তাই তাঁদের মতলব আমরা যেন আমাদের ধনদৌলত বাড়ানো বন্ধ করে বন্দুক-কামানের দিকে মন দিই। তাই নিয়ে চীনের কোনো আশঙ্কা নেই, কারণ চীন বিলক্ষণ জানে, আমাদের বন্দুক-কামান যতই বাড়ুক না কেন, আমরা কখনো চীন আক্রমণ করবো না। মাঝের থেকে বন্ধ্যা বন্দুক-কামানের সেবা করে আমাদের ধনদৌলত বৃদ্ধি ক্ষান্ত হবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বন্দুক-কামান বাড়াতে হবে।

কিন্তু আমাদের ওয়ার এম্ চীনার বিনাশ-সাধন নয়। আমাদের ওয়ার এম্ অত্যন্ত লিমিটেড—সঙ্কীর্ণ। আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়ন করা। এবং ভবিষ্যতে যেন সে দম্ভ-ভরে পুনরায় আক্রমণ করার সাহস না পায়। তার জন্য বেশ কয়েক বৎসর ধরে বন্দুক-কামান বানাতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরীব-দুঃখীর মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য আমাদের ধন-দৌলতও বাড়াতে হবে।

তাই বলছিলুম, রাঁধবো এবং চুলও বাঁধবো।

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'অহো হো! কী সুন্দর সূর্যোদয়।' বৈজ্ঞানিক গম্ভীর কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলেন, 'হস্তীমূর্খ! সূর্যের আবার উদয়, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে যাওয়াতে মনে হল সূর্যোদয় হয়েছে।'

কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উভয়েই একমত পোষণ করেন।

কবি গাইলেন,

'কে বলে সহজ, ফাঁকা যাহা তারে
সহজ কাঁধেতে সওয়া
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়
ততই কঠিন বওয়া॥'

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে'— 'নেচার এবরজ ভ্যাকিউয়াম।'

ধর্মের উচ্ছেদ যাঁরাই কামনা করেন তাঁরাই এ তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী-যুগের মক্কার কাফিরদের কথা হচ্ছে না। এ যুগের কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয়। এ যুগে ধর্মের প্রধান শত্রু টোটেলিটেরিয়ান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—'জগদ্দল রাষ্ট্র' বললে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিষ্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলার বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই: 'কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অন্য কার মুরদ যে আমার কথার উপর কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রের প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য

আখেরে সেটাও আমি দখল করবো—তোমার আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।' এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীব্র তীক্ষ্ণ আদেশ, 'আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনো উপাস্য দেবতা থাকবে না।'

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানত ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন নিয়ে চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাদের কারবার তারা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে, কিন্তু দেশের ডিক্টেটর একবার—জোর করে, ভয় দেখিয়ে যে করেই হোক—যদি 'আইনত' পাস করিয়ে নিতে পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূলাধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলাও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দি পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা ভঙ্গ করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্যন্ত যখন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগর্ভে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হন পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামে'র সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বৃহৎ এক অংশ জুড়ে বসেছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে-জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যায় কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যল্প (তাও ব্রাহ্মণের); তার বাধ্যবাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খৃস্টানের ঠিক তা উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন, কিন্তু ধর্মে প্রচুর

বাধ্যবাধকতা।১ ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনো চলছে সেটা প্রধানত খৃস্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এদেশের হিন্দু পাঠকেরা খৃস্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খৃস্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ইমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি ? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেব-দেবীও আছেন অসংখ্য, কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে তা হলে তুমি শুধু পাপী না, তুমি অখৃস্টান (খৃষ্টান দৃষ্টিবিন্দু থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবেতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন তা নয়, তাদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্তালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আমি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুর্জুয়ানির্মিত, প্রলেতারিয়া-শোষক গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্‌পফ্' কিংবা 'ডাস্ কাপিটাল।' বিশ্বাসী খৃষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনো ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিষ্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেলিন প্রচারিত ডাইলেক্টিকা ম্যেটিরিয়ালিজমে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ইমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছোঁয়ার

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খৃষ্টানের সমাজ নিয়ে নূতন হিন্দু-জীবন গড়তে হবে। বঙ্কিমও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহনিরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করেই বা লাভ কি ? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

বাইরে। ইমান চলে গিয়ে ভ্যাকিউয়াম সৃষ্ট হল, কি না, হলপ করে কিছু বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাকিউয়াম তৈরি হয় সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ-নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বুড়োরা যাক্— মরুকগে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচ-কাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পন্থীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে 'হাইল (জয়তু!)!' জোয়ানরা সমস্বরে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ফের 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ইত্যাদি। টকটকে লাল মুখ যতক্ষণ না নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেন দুই চারিটি শব্দে কিংবা শুধু 'আমেন' (তথাস্তু) বলে।

ক্রিসমাস, ঈষ্টারের উপাসনা জব্বর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে ন্যুরন্‌বের্গে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব! ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন বেদী—থ্যুড়ি—প্ল্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁর সামনে দিয়ে মার্চপাষ্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত 'কাফির' (অর্থাৎ এখনো যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) তো বে-এক্কেয়ার—ইস্তেক জর্মনীর দুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসন। অবশ্য পাঁড় কাফির এসব পরবে আসে না— যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মসিয়ে ফ্রাঁসোয়া পঁসে। তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারি তদারক করতে।....রুশ দেশেও এসব 'পরব' হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল 'আইন-টপ্‌ফ্‌-গেরিষ্ট'। সপ্তাহে একদিন খাবে শুধু এক পদের

খানা। মাংস, আলু, ফুলকপি, চর্বি সব-সুদ্ধ মিলিয়ে ঘ্যাঁট। 'অর দ্যভ্র্' দিয়ে আরম্ভ করে 'সেভরি' পর্যন্ত অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও, 'ডুবে ডুবে জল খাই' ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেশার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল— কারণ বলা হয়েছে, 'আইন টপ্ফ্'—অর্থাৎ 'এক হাঁড়িতে' রান্না খাদ্য—এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপত্তি আর কি? হিটলারের কর্তাভজা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার 'মীটলেস্', তিনি 'কাটলেস্'। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘ্যাঁট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে 'ধর্মরক্ষা' করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শূয়ারের 'কাটলেস্' (কটলেট্)!

খৃষ্টান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অস্থিদন্তের আধার দেখতে—(হিন্দুর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব তীর্থযাত্রায় প্রচুর পুণ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দুরন্ত শীতে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেনিন-স্তালিনের 'মামি' দেখবে বলে। আর 'মামি' যে কাস্কেট্ বা গোরস্তানের চেয়ে হৃদয়মনের উপর বেশী দাগ কাটবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিস্টরা আমাদের হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাগ্রণী:—

ক্যাথলিক তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্‌ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষাশেষের পর্যুষণে আপন আপন দুষ্কৃতি স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কনফেশনের ধুন্দুমার

লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সমস্বরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, 'না, না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বনিকৃষ্ট।'

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলাও হালে শুনেছি। রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁরা একটা 'মামি' পেয়ে গেলেন। খ্রুশচফ খুশী হয়ে শুধোলেন, 'ওটা কত দিনের পুরনো ?' পণ্ডিতেরা নিরুত্তর। খ্রুশচফ শাসালেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।' পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খ্রুশচফ বললেন, 'হুঁ ?' পণ্ডিতেরা সমস্বরে 'চার হাজার দু'শ বৎসর।' 'বেশ, কি করে জানলে ?' পণ্ডিতেরা ঐকতানে, 'মামি স্বীকার করেছে (কনফেশন) ।'

* * * *

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায় টায়, দফে দফে, প্রো ফর্মা দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন ঃ

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিস্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দি। কম্যুনিস্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের 'বিজ্ঞানসম্মত' 'র‍্যাশনাল' কর্মকাণ্ড 'ধর্মের আফিঙে' মাখানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এস্থলে সেই ফরাসী প্রবাদ বাক্য স্মরণ করি ঃ—'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম শোজ্।' 'যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।'

কিন্তু এই বাহ্য।

ধর্ম তবে কি ?

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জব্বর এক খানা ব্রেকফাষ্ট। শুধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠেই বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একখানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাষ্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-ঘেঁষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফ্রুট দিয়ে। তারপর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগ্ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি চাকতি কলা এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে টোষ্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সম পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তারপর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ) ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মত—তারপর খাবেন এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া দুটো আণ্ডা ফ্রাই (আকারে এ-দেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোষ্ট-মাখনের তবলা কখনো বন্ধ হবে না—এবং এর পর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরো খানচারেক টোষ্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্স্!

ফরাসী-জর্মন ব্রেকফাষ্টে খায় যৎসামান্য রুটি-মাখন আর কফি। খানদানী ফরাসী মাখনও খায় না—বলে, ফরাসী-রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চের বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসী-জর্মন করে গুরুভোজন।

রাত্রিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জর্মন খায় অত্যল্প। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠাণ্ডা, শুধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইরই কাণ্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সব-কিছুই ঠাণ্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য সে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ, তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবের খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যেরকম ট্যুব থেকে টুথপেষ্ট বের করি এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনো সস্ কোনটা থেকে মাছের পেষ্ট। শুনেছি, ট্যুব থেকে মাষ্টার্ড, কোনোটা থেকে টমাটো দেখিনি, মাংসের পেষ্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনো জিনিসের অভাব নেই। দামের পরোয়া ক'রো না, যত পারো খাও।

রাস্তাও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একখানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্‌স্ মিটেল গেশেফ্‌ট্‌—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারো বাড়িতে যাওয়া মাত্রই সে কোনো কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (হক্ রেনিশ) তাজা বিয়ার—ইস্তেক স্কচ্‌ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—খাক না বেচারীরা প্রাণভরে। এই যে সেভন ডেজ ওয়াণ্ডার—তিন দিনের ভেল্কিবাজি—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়।

এ তত্ত্বটি জর্মনরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে পাড়ায় থাকতুম সেটা শহরতলীতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাবটি' ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কি ভাবে, কি বলে, পাবে না গিয়ে জানার উপায় নেই। গুণীজ্ঞানীরা কি ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গুণী-জ্ঞানী নয় ; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কায়দামাফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর

দুই পূর্বে এসেছিলুম, মাত্র দু'দিনের তরে। কোনো একটা পাবে যাবার ফুরসত পর্যন্ত হয় নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুধোল, 'কিরকম লাগছে পরিবর্তনটা ?'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য ! এত ধন-দৌলত যে কোনো জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখছিলুম। তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিষ্ট তার স্ত্রীকে বলছে, ফ্যানসি ! এসব জিনিস তারা এমেরিকান "এড্" ছাড়া তৈরী করেছিল।'

আমি বললুম, 'রাজরাজড়ারা ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেরকম সউদী আরব, কুয়েৎ বাহরেনে শেখরা জলের মত টাকা ওড়ায়, কিন্তু আর পাঁচজনের সচ্ছলতা কিরকম ছিল অতখানি আমি জানিনে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরণে মোটামুটি ভালো স্যুটই, তবে ফিটফাট বলা চলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনো বুঝি নাৎসি যুগের গেস্তাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাঃ, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কি জানি কি করে তার গলার সুর বদলে যায়। এ তত্ত্বটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচাটন মন্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুধোলে, 'কি দেখছ ?'

আমি বললুম, 'এন্তের মোটরগাড়ি।'

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের ক'জন সত্যি সত্যি

মোটর পুষতে পারে জানো? শতেকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজরাজড়ারা ধনী ছিলেন বাদবাকিদের কথা বলতে পারছো না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাবড়ে বেড়াচ্ছেন বাবুরা, এদের ক'জন মোটরের পুরো দাম শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইন্‌স্‌টলমেণ্টের ব্যাপার। জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্ট-নিসে—দে আর লিভিং বিঅণ্ড দেয়ার মীন্‌স্—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।'

আমি বললুম, 'সে-কথা বললে চলবে কেন? কট্টর অবজেক্‌টিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।'

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কে বলছে ধনদৌলত বাড়েনি! বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনায় খরচ করছে অনেক বেশী। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিয়াদ।'

আমি বললুম, 'তাতেই বা কি ফয়দা হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিয়াদও তো ঝুরঝুরে করে দিয়ে চলে গেল।'

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বার বার বলে, 'জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে, জী লেবেন য়্যুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোলো খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করেছিলুম, সে এতক্ষণ হাঁ না কিছুই বলেনি। এবারে নিচের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়োর কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইনফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সব-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়,

তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দু'হাতে। এমন কি, যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।'

আমি বললুম, 'যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কি করে?' তারপর বললুম, 'ওঃ! বুঝেছি। ধার করে।'

বললে, 'ঠিক ধার করে নয়। কারণ, ধার করলে সে পয়সা একদিন না একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্রোক করে। কিন্তু ইন্‌স্টল্‌মেণ্টের কেনা জিনিসে সে ভয়ও নেই। বড় জোর যে জিনিসটা কিনেছ সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যে সেই ফিসফিস-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, 'টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোক্কা টাকার কথা বলছি, ইন্‌স্টল্‌মেণ্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্রোক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কি? বাড়ির তাবৎ জিনিসই তো ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে কেনা। সেগুলো তো ক্রোক করা যায় না।'

আমি বুড়োকে বললুম, 'আপনি সবকিছু বড্ড বেশী কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।'

বুড়ো বললে, 'আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আ্ডেন-ওয়ারও তো ঐ পরশু দিন দেশের লোককে সাবধান করে দিয়েছেন, "এ সুদিন বেশীদিন থাকবে না। হুঁশিয়ার, সাবধান!" পড়োনি কাগজে?'

আমি বললুম, 'অতশত বুঝিনে। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফুর্তিতে আছে। ঐটেই হ'ল বড় কথা।' তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম তাকে শুধালুম, 'তোমাদের শহরের মধ্যিখানে যে হাজারখানেক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কার্ ফর সেল্ দেখলুম, সেগুলো কি ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে কেনা ছিল, আর, কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পৌঁছেছে?'

বললে, 'নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ।' বুড়ো আবার মাথা

দোলাতে দোলাতে বললে, 'তোমাকে বলিনি, জী লেবেন য়ুবার ঈরে ফেরহেন্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

* * * *

সুবুদ্ধিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানিনে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারবো না। আমি যা শুনেছি, সেইটেই রিপোর্ট করলুম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব 'পাবে' শুম্‌পেটার, কেইনস্, শাখ্‌ট্ আসেন না। আসে যেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দশের মুখ খুদার তবল।

দ্য গল্

একপাল কাকের মধ্যিখানে ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারলে যা হয়, কয়েক দিন পূর্বে ইউরোপামেরিকায় তাই হয়ে গেল। বারোয়ারি বাজার, বারোর হাট, যুক্তহট্ট—যা খুশি বলুন—তারই দিকে তাগ করে জেনেরাল শার্ল দ্য গল ইংরেজকে জল-চল করার বিরুদ্ধে যে ডাণ্ডাখানি হালে ছুঁড়লেন তারই ফলে ইউরোপামেরিকায় তো কা-কা রব উঠেছেই, এদেশেও কা কা রব ছাড়িয়ে উঠছে স্বস্তির প্রশ্বাস। এ-অধম অর্থনীতির খবর রাখে যতখানি নিতান্ত না রাখলেই নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সবিনয়ে বলবো, যত দিন যাচ্ছে ততই অর্থবিদ 'পান্ডিট'-দের প্রতি ভক্তি আমার কমছে।১ মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি, তবু এই সুবাদে নিবেদন, এদেশের কর্তারা যে ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন, ব্রিটন্ বারোর বাজারে ঢুকে পড়লে ভারতীয় মাল অনায়াসে ব্রিটেনে ঢুকতে পারবে না, আমার হৃদয় সে ভয়ে কম্পিত নয়। বস্তুত আমি কাফেরের মত বলবো, এই বিলিতী তথা-কথিত সুখ-সুবিধেই আমাদের সর্বনাশ করছে। দুনিয়ার সর্বত্র আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের মাল চালাবার চেষ্টা করছিনে। আমাদের লক্ষীছাড়া ক্যাপিটালিষ্টরা ইংরেজের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে লক্ষীলাভ করছেন। কিন্তু ওদেরই বা দোষ দি কেন? স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বার বার এ নির্জন

---

১ হিটলার এঁদের নিয়ে বড় মস্করা করতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন দেশের ভার কাঁধে নিয়ে বেকার-সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজ আরম্ভ করলুম তখন দাড়িওলা অর্থবিদ অধ্যাপকরা ভল্যুম ভল্যুম কেতাব লিখে সপ্রমাণ করলেন, দেশের সর্বনাশ হবে। যখন সমাধান করে ফেললুম, তখন ফের ভল্যুম ভল্যুম কেতাব বেরলো যাদের মূল বক্তব্য, "বলেছিলুম, তখনই বলেছিলুম, এই সমস্যার এই সমাধানই বটে"।' কেইনস্, শাখ্ট্, শুম্পেটার কজন?

প্রান্তরে আমি চিন্তা করছিলুম, তাঁর সব-কিছুই তো অল্পস্বল্প বুঝি, তাঁর 'রাজযোগ' আমার নিত্যপথপ্রদর্শক,—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কথা, বড় কাজ কি ছিল? যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, সেটি জড়ত্ব-নাশ। চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং কর্মে আমরা জড় হয়ে গিয়েছি। বিশেষ করে কর্মে। গীতায় আছে, কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নেই। আমরা গীতার উপর আরেক কাঠি সরেস হয়ে গেলুম। বললুম, 'কর্মেও আমাদের অধিকার নেই।'

'এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁস২ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার৩ এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, বেহুঁশ৪ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, "প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ"।'

সুপ্তি তবু ভালো। তার থেকে জাগ্রতী আছে। কিন্তু জড়ত্বের কোনো ম্যাদ নেই।

এই জড়ত্বেরই অন্য শব্দ ক্লৈব্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।"

পণ্ডিতজীও তাই উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার বলছেন 'আমরা যেন কমপ্লেসেন্সের স্রোতে গা ঢেলে না দি—ক্ষণতরে চীন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে। কমপ্লেসেনস্ জড়ত্বেরই ভদ্র নাম।

আমাদের ছাত্রেরা গাইডবুক মুখস্থ করে পাশ করে, আমরা—

২, ৩, ৪ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষড়বিংশ খণ্ডের ১৩১ পৃঃ থেকে আমি উদ্ধৃত করছি। কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ 'হুঁস', সঙ্গে সঙ্গে 'হুঁশিয়ার' এবং 'বেহুঁশ' লিখলেন কেন? খনে 'স' খনে 'শ'? স্পষ্টত একই মূল থেকে তিনটি শব্দই তো এসেছে।

অধ্যাপকরা—ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলেজে যা শিখেছিলুম তাই পড়িয়ে কর্তব্য সমাধান করি, আমাদের ধার্মিকজন কোনো এক গুরুতে আত্মসমর্পণ করে ধর্মজীবন পালন হলো বলে আশ্বস্ত হন, যে-বই লিখে আমাদের সাহিত্যিক বিখ্যাত হন তিনি বার বার সেইটেরই পুনরাবৃত্তি করেন, আমাদের ফিল্ম-পরিচালকরা একই প্লট সাতান্ন বার দেখান, এবং—যে ব্যবসায়ীদের কথা নিয়ে এ-অনুচ্ছেদ আরম্ভ করেছিলুম—একই বাজারে বছরের পর বছর মাল পাঠিয়ে পরমানন্দে শয্যায় গা এলিয়ে দেন। 'নব নব সঙ্কটের অভিযানে' পদক্ষেপ করার জন্য যে বিধিদত্ত প্রাণশক্তি আমাদের রয়েছে সেটা জড়ত্বের বল্মীকে আচ্ছাদিত।

আমাদের 'জীর্ণ আবেশ' 'সুকঠোর ঘাতে' কাটবার জন্য স্বামীজী এনেছিলেন 'জড়ত্ব-নাশা মৃত্যুঞ্জয় আশা।'

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীর উদ্দাম অফুরন্ত স্বতশ্চল প্রাণশক্তি দেখে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভয় পেয়ে বললেন, 'এ আমি কি গড়লুম!' তাই সে 'ভুল শোধরাবার' জন্য তাঁকে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে টেনে নিলেন। শঙ্করাচার্যকে যে-রকম টেনে নিয়েছিলেন, চৈতন্যকে যে-রকম।

* * * *

আশা করি কেউ ভাববেন না দ্য গলকে আমি চৈতন্য স্বামীজীর পর্যায়ে তুলছি; কিংবা আমি দ্য গলের গলে মালা পরাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। স্বল্পবিস্তর নিবেদন করি।

ইংরেজের যে-রকম রাজকীয় সেণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়, ফরাসীর তেমনি স্যাঁ সীর। দ্য গল সেখানে শিক্ষালাভ করেন। ছাব্বিশ বছর বয়েসে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জর্মনদের কাছে বন্দী হন। এইসময় বন্দী অবস্থায় তিনি জর্মন ভাষা শিখে নেন। হালে তিনি জর্মনগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ দেশ ভ্রমণের সময় একাধিক

শহরে জর্মন ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের কোনো রাষ্ট্রপতি জর্মনীতে যাননি—নেপোলিয়নের কথা বাদ দিন, তিনি গিয়েছিলেন বিজেতারূপে—তার উপর ইনি বলছেন তাদেরই মাতৃভাষা, জর্মনরাতর্। তাদের হর্ষধ্বনি বেতারে শুনেছি।

কিন্তু পুরানো কথায় ফিরে যাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিন ফরাসী বীর দেশের সম্মান পেতেন। ফক্, জফ্র্ এবং পেতাঁ। প্রথম দুজন মারা যাবার পর পেতাঁই ফ্রান্সের রক্ষণবিভাগের সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উত্তম অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত প্রাকার নির্মাণই ফ্রান্স সংরক্ষণের জন্য প্রশস্ততম—ফলে কোটি কোটি টাকা খরচা করে তৈরী হল মাজিনো লাইন—বহু শত বৎসর পূর্বে চীনারা যে-রকম দেয়াল গড়েছিল।

দ্য গল ছিলেন পেতাঁর সহকর্মী। কিন্তু পদে পদে তিনি পেতাঁর সঙ্গে দ্বিমত। তিনি বার বার বলেছেন, এরকম পাঁচিল তুলে, জড়ভরতের মত পিছনে বসে থাকলে আত্মরক্ষা হয় না। পেঁতা তাঁর কথায় কান দেননি।

তারপর যখন ১৯৪০-এ ফ্রান্স নির্মমভাবে পরাজিত হল তখন সবাই বুঝলো প্রাচীন যুগের দেয়াল-বাঁধার জড়ত্ব সত্য সংরক্ষণ নয়।

এইখানেই দ্য গলের মাহাত্ম্য!

॥ ২ ॥

ফরাসী বিদ্রোহ শেষ হলে পর এক ফরাসী নাগরিক জনৈক নামজাদা জাঁদরেলকে শুধোয়, 'মসিয়ো ল্য জেনেরাল, এই যুগান্ত-কারী বিদ্রোহে আপনার কঁত্রিবিউসিয়োঁ—"অবদান"—কি ছিল?' মসিয়ো ল্য জেনেরাল গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে সপ্রতিভ মৃদুহাস্য হেসে বলেছিলেন, 'পৈতৃক প্রাণটি বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।'

বাস্তবিকই তখন ঘড়ি ঘড়ি কর্ণধার বদল, এবং এক কর্ণধার

প্রাক্তন অন্য কর্ণধারের কর্ণকর্তন করেই সন্তুষ্ট নন, কানের সঙ্গে মাথাও চান।১ হালে ইরাকে যা।

১৯১৮ এবং ১৯৪০-এর মাঝখানের সময়টাতে একই ধুন্দুমার। তবে মাথা-কাটাকাটি আর হত না। শুধু 'মন্ত্রিসভার পতন' নিয়েই উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হতেন। এবং এ-সব পতন সর্বক্ষণ লেগে থাকত বলে ১৯৩৮-এ এক ফরাসী কাফেতে চুকুশ চুকুশ করতে করতে বলেছিল, 'এই প্যারিসেই অন্তত হাজার খানেক প্রাক্তন মন্ত্রী আছেন। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে, পাশের টেবিলে কেউ বলেছে; "ক'ং জেতে ল্য মিনিস্ৎর্"— আমি যখন মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' তারপর সেই ফরাসী আমাকে সাবধান করে দেয়, আমি যেন বেশী দিন ফ্রান্সে না থাকি ; বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ হয়তো একদিন ক্যাক করে পাকড়ে নিয়ে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে। তাঁর উপদেশ আমি পুরোপুরি নিইনি। তবে কাফেতে বসে প্রায়ই অজানা জনকে বলতুম, 'ক'ং জেতে ল্য মিনিস্ৎর্—আমি যখন মন্ত্রী ছিলুম—ইত্যাদি।' আশ্চর্য, কারো চোখে 'অবিশ্বাসের আমেজ দেখিনি। ফরাসী কলনী আলজেরিয়া থেকে কালা আদমী ভী মসিয়ো ল্য মিনিস্ৎর্ হতে আপত্তি কি ?

তা সে কথা থাক্।

আসল কথা হচ্ছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ানে বিস্তর বই বেরোয়, ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ কি তাই নিয়ে। এতদিন পরে আমার আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় মাদাম তাবুই লিখিত একখানা বই বাজারে বেশ নাম কেনে।

---

৫ ম্যাট্রিকের বাঙ্গলা পরীক্ষায় একটি ছেলে লিখেছেন,

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া যুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পদ নাক কান তাঁর।

ইংরিজী অনুবাদে তার নাম ছিল, 'পেরফিডিয়াস আলবিয়েন অর্ আঁতাঁৎ কর্দিয়াল ?'—'বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ কিংবা তার সঙ্গে দোস্তী ?'

বৈঠে মেরেছি সমস্ত রাত ; ভোরবেলা দেখি, বাড়ির ঘাটেই নৌকা বাঁধা। ব্যাপার কি ? যে-দড়িতে নৌকা বাঁধা ছিল সেটা খুলিনি।

এও তাই। দ্য গল আবার ফিরে এসেছেন যেখানে মাদাম তাবুই আপন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই লক্ষ্মীছাড়া ইংরেজকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে পাকাপাকি কোনো দোস্তী করা যায় কি না ? পূর্বেই বলেছি, দুই যুদ্ধের মাঝখানে ফ্রান্সে এতই ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হত যে, ভেবেচিন্তে ইংরেজের সঙ্গে কোনো একটা চুক্তি—আঁতাঁৎ—করা, কিংবা আরো মনস্থির করে না-করা, কোনোটাই করা যেত না। মাদাম তাবুইয়ের বিশ্লেষণ—যতদূর মনে পড়ছে—একটু অন্য ধরনের ছিল। তিনি বলেছিলেন, উভয় দেশেরই দুর্ভাগ্য যে আমরা কোনো পাকাপাকি সমঝাওতায় আসতে পারছি না। তার কারণ, আমাদের এখানে যখন গরম-পন্থীরা (কনজারভেটিভ) মন্ত্রিসভা গড়েচেন, তখন বিলেতে নরম-পন্থীরা (লিবরেল অথবা লেবার) এবং আমরা যখন নরম তখন ওরা গরম।

তা সে যে কোনো কারণেই হ'ক দুই যুদ্ধের মাঝখানে কোথায় না ফরাসী-ইংরেজ একজোট হয়ে বিশ্বশান্তির জন্য লীগ অব নেশন্স্ হ'ক, কিংবা অন্যত্রই হ'ক, পাকা বুনিয়াদ গড়ে তুলবে, না, আরম্ভ হল দু-জনাতে খ্যাচাখেঁউ। এর উদাহরণ তো মাদাম তাবুই প্রচুর দিয়েছেন। তাঁর বই বেরনোর পরের শেষ উদাহরণ আমরা দিই। হের হিটলার যখন সগর্বে সদম্ভে রাইনল্যাণ্ডকে সমরসজ্জায় সাজাতে আরম্ভ করলেন তখন ফ্রান্স আর্তকণ্ঠে সেদিকে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ভের্সাইয়ের চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, জর্মন এ কর্মটি করতে পারবে না, এবং সে চুক্তির বরাত ফরাসী ইংরেজ দুজনের উপরই ছিল। ইংরেজ সে আর্তরব শুনে সাড়া তো দিলই

না, উল্টে দেখা গেল, সে গোপনে গোপনে হিটলারের সঙ্গে একটা নৌ-চুক্তি করে বসে আছে। ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গী এ-স্থলে বোঝা কঠিন নয়—তা আপনারা সেটাতে 'বিশ্বাসঘাতকতা' 'পারফিডি' বলুন আর নাই বলুন। তার শক্তি জলে। হিটলার যদি তাকে কথা দেয়, সে সেখানে লড়ালড়ি করবে না, তবে চুলোয় যাক রাইনল্যাণ্ডের সমরসজ্জা।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল। ফ্রান্স গেল। ব্রিটন যায় যায়। প্রথমবারের মত এবারও মুশকিল-আসান মার্কিন সবাইকে বাঁচালে।

কোথায় না এখন এ-তুজাত শিখবে একজোটে কাজ করতে, যাতে করে ফের না একটা লড়াই লাগে, উল্টে দ্য গল লেগে গেলেন ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইয়োরোপের উপর সর্দারী করতে!

দ্য গলের বিশ্বাস, ইংরেজ তার সর্বস্ব বেচে দিয়েছে মার্কিনের কাছে। তাই মার্কিন ইংরেজের কাঁধে ভর করে ইয়োরোপে নেবে সেখানে সর্দারী করতে চায়। পক্ষান্তরে, ফ্রাঁস, লা ফ্রাঁস, তুজুর লা ফ্রাঁস। বাঙলা কথায়, সভ্যতা-ঐতিহ্য-বৈদগ্ধ্যের মক্কামদিনা ফ্রাঁস। ইয়োরোপ তথা তাবত দুনিয়ায় কেউ যদি সর্দারী করার হক্ক ধরে তবে সে ফ্রাঁস!

তাই তিনি করতে চাইলেন জর্মনির সঙ্গে দোস্তী। তা তিনি করুন। খুব ভালো কথা। দোস্তী ভালো জিনিস।

তারপর তিনি হাত বাড়ালেন খ্রুশফের দিকে। সেও ভালো কথা। আমরা—অন্তত আমি—রাশার শত্রু নই।

ইংরেজ চাইলে, চতুর্দিকে এত সব দেদার দোস্তী হচ্ছে, সে-ই বা বাদ যায় কেন? বারোয়ারী বাজারে সে-ই বা ঢুকবে না কেন?

দ্য গল মারলেন ইংরেজের গালে চড়।

এখন কি হবে?

আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ফ্রান্স যে সর্দারী করতে চাইছে

তার মত কোমরের জোর তার নেই। জর্মনির সঙ্গে তার দোস্তীও বেশী দিন টিকবে না। কারণ জর্মনি চায়, পূর্ব পশ্চিম জর্মনির সম্মেলন। রাশা তার প্রতিবন্ধক। দ্য গলকে একদিন তার বোঝাপড়া করতে হবে। তখন হয় জর্মনি না হয় রাশাকে হারাতে হবে। তখন কোথায় রইল ইয়োরোপের উপর সর্দারী ?

তলস্তয়

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" রবীন্দ্রজীবনের সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হলে শরৎচন্দ্র এ কথাটি বলেছিলেন। সমস্ত বাঙলা দেশ তখন জয়ধ্বনি করে এই বিস্ময়ে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।

কবিগুরু তলস্তয়ের মৃত্যু সংবাদ যখন রুশ সাহিত্যের তখনকার দিনের শরৎচন্দ্র গর্কির কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর শোকলিপি শেষ করার সময় লিখেছিলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে যে-আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করিনে মনে মনে বলেছিলুম "এই লোকটি ঈশ্বরের মত (গড-লাইক)।"

প্রতি ধর্মেই একটি প্রশ্ন বার বার উঠেছে। ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে চান, তখন তা করেন কোন পদ্ধতিতে। ভারতীয় আর্যরা উত্তরে বলেছেন, স্বয়ং ভগবান তখন মানুষের মূর্তি ধরে অবতাররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ এবং মহাবীর হয়তো নিজেরা এই মতবাদে স্বীকৃতি দিতেন না, কিন্তু বহু বৌদ্ধ এবং জৈন ওঁদের পূজা করেন অবতাররূপে এবং হিন্দুরাও বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসাতে কুণ্ঠিত হননি।

সেমিতি জগতে বিশ্বাস, ভগবান তখন মানুষের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তাঁকে তাঁর 'প্রফেট', 'পয়গম্বর', 'রসূল', 'প্রেরিত পুরুষ' নাম দিয়ে নবধর্ম প্রচার করতে আদেশ দেন। ইহুদী এবং মুসলমানদের বিশ্বাস, এঁরা কখনো কখনো অলৌকিক দৈবশক্তির আধার হন, কখনো হন না।

---

* লেয়ো নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। জন্ম—ইয়াস্নায়া পলিয়ানা (তুলা) ৯-৯-২৮; মৃত্যু আস্তাপভো (তামবভ) ২০-১১-১০।

খৃষ্টের আসন মাঝখানে। তিনি কখনো বা ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কখনো ঈশ্বররূপে, কখনো বা শুদ্ধমাত্র 'প্রেরিত পুরুষ'রূপে অর্ঘ্য পেয়ে থাকেন। ইসলাম তাঁকে অলৌকিক শক্তিধারী ('মুআজিজা' বা 'মিরাকল' করার অধিকারী) পয়গম্বররূপে স্বীকার করে। খৃষ্ট যে অবতাররূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার পিছনে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ধর্মের প্রভাব আছে।

এ তথ্য প্রমাণ করা সহজ নয়, কিন্তু হিটাইটদের আমল থেকেই পূর্ব ভূমধ্যসাগর তটাঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষে যে দুজন অবতার সর্বজননমস্য, তাঁরা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ।

রামচন্দ্র রাবণকে শাসন করে দুষ্কৃতির বিনাশ করেন ও পুণ্যাত্মা জনের মনে সাহস বাড়িয়ে দেন। এবং এই সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হননি। পরবর্তী যুগে বোধ করি প্রশ্ন উঠেছিল যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাণনাশ কি নিতান্তই অপরিহার্য? এযুগে তাই দেখতে পাই মাইকেল যখন সীতাকে দিয়ে রামের বর্ণনা করাচ্ছেন তখন বলছেন, 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে সতত বিরত।'

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হয়তো প্রশ্নটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্য বা আদর্শ (এণ্ড) মহান হলেই কি যা খুশী সে পন্থা (মীন্‌স্) অবলম্বন করা যায়? মহাভারতে তাই কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করছেন না, কিন্তু অবশ অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন?

এরপর বুদ্ধদেব। তিনি সর্ব অবস্থাতেই জীবনাশ করতে মানা করেছেন। কিন্তু রামকে যেরকম এক রাষ্ট্রের অধিপতিরূপে অন্য রাষ্ট্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কৃষ্ণকে যেরকম অধর্মচারী রাষ্ট্ররাজ দুর্যোধনের মোকাবেলা করতে হয়েছিল, বুদ্ধদেবকে সেরকম কোনো

রাষ্ট্রের বৈরীভাবের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হতে হয়নি। সমাজের ভিতর ব্যক্তিগত জীবনে প্রাণনাশ না করেও প্রাণধারণ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যদি বর্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এসে লুণ্ঠন, নরহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে কি আক্রান্ত নৃপতি ক্ষমা ও মৈত্রী নীতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রিয় তূষ্ণীভাব দ্বারা রাজধর্ম প্রতিপালন করবেন ?

বুদ্ধদেবের পর খৃষ্ট যখন সে যুগের অধর্মাশ্রিত রাষ্ট্র গঠন প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাইলেন, তখন দ্বন্দ্ব বাধলো সে রাষ্ট্রের স্তম্ভদ্বয় ধনপতি ও ধর্মাধিকারীদের সঙ্গে। তিনি অস্ত্র ধারণ করতে অসম্মত হন। ক্রুশের উপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। (পাঠক কিন্তু ভাবলেন না, তাই বলে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা পড়ে গেল— বস্তুত খৃষ্টান মাত্রেরই বিশ্বাস, প্রভু যীশু ক্রুশে জীবন দেওয়াতেই তাঁর বাণী জনগণের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হল, তাঁর জীবনদানের ফলেই আমরা জীবন লাভ করলুম, কিন্তু এ প্রস্তাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবান্তর)।

এরপর ঐ সেমিতি জগতেই হজরৎ মুহম্মদ। মক্কাতে যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করেননি। মক্কার রাষ্ট্রপতিরা যখন তাঁকে মেরে ফেলা সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি মদিনার নাগরিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তাদের দলপতি হলেন—তারা অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ ছিল না।*

---

* বার্নাড শ খৃষ্ট ও মুহম্মদের এক কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে।

"Who is to be the judge of our fitness to live ?" said Christ. "The highest authorities, the imperial governors, and the high priests find that I am unfit to live. Perhaps they are right."

"Precisely the same conclusion was reached concerning myself", said Muhammad. "I had to run away and hide until I had convinced a sufficent number of athletic young men that their elders were mistaken about me : that, in fact, the boot was on the other leg."

Bernard Shaw, The Black Girl in Search of God, p. 57.

আপন ধর্মকে উচ্চতর আসনে বসানোর জন্য কোনো কোনো অমুসলমান ধর্মযাজক হজরৎ মুহম্মদকে রক্তলোলুপ উৎপীড়করূপে অঙ্কিত করেছেন (যেন অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করে আপন জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না।) কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে লুণ্ঠনকারী বর্বর নামে মুসলমানরা তুর্ক অভিযানকারীরা (এস্থলে ফিরোজ, আকবরের কথা হচ্ছে না)। বার্নাড শ মুহম্মদ চরিত মন দিয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর এক কাল্পনিক কথোপকথনে এসম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদকে দিয়ে বলাচ্ছেন, "I have suffered & sinned all my life through an infirmity of spirit which renders me incapable of slaying."

বস্তুত নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে হজরৎ মুহম্মদ শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে আসন নেন (এঁরা গীতা ও কুরান দিয়ে গিয়েছেন) এবং মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে, রাষ্ট্র যখন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন তিনি যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ না হয়ে 'শর সংহরণে' প্রস্তুত রইলেন। মহাপুরুষ মুহম্মদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ দেখতে পাই বিরুদ্ধাচরণকারীর সম্মুখে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়।

এরপর তেরশত বৎসর ধরে কেউ আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। পাণ্ডা পুরোহিতদের টীকা-টিপ্পনির ভিতর খৃষ্টের বাণী নানা বিকৃতিরূপ ধারণ করল—পাদ্রী সায়েবরা প্রতি যুদ্ধে পরমোৎসাহে বন্দুক কামান মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূত পবিত্র করে যুদ্ধে পাঠালেন।

এযুগে তলস্তয়ই পুনরায় খৃষ্টকে আবিষ্কার করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমাজে তথা সাহিত্যে * সম্পূর্ণতম খ্যাতি অর্জন

* যাঁরা নোবেল প্রাইজের নাম শুনলেই চৈতন্য হারান তাঁদের বলে দেওয়া ভালো যে, ঐ প্রাইজ যদিও ১৯০১ খৃঃ থেকে দেওয়া আরম্ভ হয়, ও তলস্তয় ১৯১০-এ গত হন, তিনি এটি পাননি।

করার পর তিনি করলেন উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত ইয়োরোপীয় সভ্যতা-বৈদগ্ধ্যের মূলে কুঠারঘাত। তার অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ এবং বিশেষ করে ধর্ম—এগুলোর পিছনে যে কত বড় ভণ্ডামি লুকানো রয়েছে, সেটা দেখাতে গিয়ে তিনি যে দার্ঢ্য, মেধা ও কঠোর সত্যনিষ্ঠা দেখালেন, তার সামান্যতম বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। 'ওয়র এণ্ড পীস' তিনি লিখেছিলেন হীরার কলম দিয়ে সোনার কালি দিয়ে—আর তাঁর জীবনের এই চরম উপলব্ধি তিনি লিখলেন দধীচির অস্ত্র নির্মিত দমশ্‌কী তলওয়ার দিয়ে আপন বুকের রক্ত মাখিয়ে।

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ মহাপাপ' তাঁর এ-বাণী 'তুখবর' সম্প্রদায় মেনে নিয়েছিল এবং বহু দুখ বরণ করার পর তলস্তয়েরই সাহায্যে নির্বাসন স্বীকার করে মাতৃভূমি ত্যাগ করে। শেষ পরীক্ষা সেখানে হয়নি।

রুশ রাষ্ট্র তলস্তয়কে কখনো সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেনি ব'লে বলা অসম্ভব, তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশ বরণ করতে হত কিনা। তবে একথাও ঠিক আপন আদর্শের চরম মূল্য দেবার জন্য তিনি আত্মজন পরিত্যাগ করে পথপ্রান্তের অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন।

তলস্তয় কাহিনী এখানেই হয়তো শেষ, কিন্তু সেই চিরন্তন কাহিনী আরো এগিয়ে গিয়েছে এবং কখনো শেষ হবে কিনা জানিনে।

গাঁধীকে বহু অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তলস্তয়। তিনিই এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম, যিনি বিদেশী পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে জয়লাভ করেন।

আবার এটম বোমা তৈরী হচ্ছে।

প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দ'আন্ন্‌দ্‌জিয়ো

গ্রীকের উত্তরাধিকারী লাতিন। লাতিন তার অনুপ্রেরণা, প্রাণরস, কলা সৃষ্টির আদর্শ ও তাকে মৃন্ময় করার পদ্ধতি সব কিছুই নিয়েছে গ্রীক থেকে। বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যও সংস্কৃতের এতখানি পদাঙ্ক অনুগমন করেনি। বরঞ্চ বলবো, উর্দুর সঙ্গে ফার্সীর যে সম্পর্ক লাতিনের সঙ্গে গ্রীকের তাই। অহমিয়ারা যদি রাগ না করেন তবে বলবো, বাঙলা ও অহমিয়ার মধ্যে ঐ সম্পর্কই বিদ্যমান, যদিও বাঙলার মৃত্যু হওয়ার পর অহমিয়া তার উত্তরাধিকারী হয়নি— বাঙলা তার উৎকর্ষের এক বিশেষ চরম স্তরে পৌঁছনর পর অহমিয়া তার রস-সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যকে তার আদর্শরূপে ধরে নেয় (এখানে বুরুঞ্জী বা দলিলদস্তাবেজের গদ্যের কথা হচ্ছে না)।

বহুশত বৎসর ধরে লাতিন পাশ্চাত্ত্য ভূমির সর্ব চিন্তা সর্ব অনুভূতির মাধ্যম ছিল। এমন কি লাতিনের উত্তরাধিকারী ইতালীয়, ফরাসী, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা পূর্ণ সমৃদ্ধি পাওয়ার পরও—এমন কি গত শতাব্দীতেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা যখনই চেয়েছেন যে তাবৎ ইয়োরোপ তাঁদের রচনার ফললাভ করুক তখনই তাঁরা আপন আপন মাতৃভাষা—জর্মন, ফরাসী ইত্যাদিতে না লিখে লিখেছেন লাতিনে। ইবন খলদূনের (ইনি মার্কসের বহু পূর্বে ইতিহাসের অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন।) আরবী পুস্তকের অনুবাদক মাতৃভাষা ব্যবহার না করে খলদূনের 'মোকদ্দমা'—'প্রলেগমেনন' অনুবাদ করেছেন লাতিনে। এ শতাব্দীতেও জলালউদ্দীন রুমীর ফার্সী থেকে ইংরিজীতে তর্জমা করার সময় ইংরেজ তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো অনুবাদ করেছেন লাতিনে—উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল অপ্রাপ্ত-বয়স্কের হাতে এ-বই পড়লে তারা যেন বুঝতে না পারে।

খাস লাতিনের জন্মভূমি ও লীলাস্থল যদিও ইতালীতে এবং ইতালীয় সাহিত্যের অতি শৈশবাবস্থায়ই দান্তের মত অতুলনীয় মহাকবির আবির্ভাব, তবু কার্যত দেখা গেল লাতিনের অন্য উত্তরাধিকারী ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য যেন তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে, ইতালীয়রা তখন শুধু সাহিত্য নয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারুশিল্পেও আপন সৃজনী শক্তির বিকাশ করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্যারিস ক্রমে ইয়োরোপের কলাকারদের মক্কা হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় রুশের তুর্গেনিয়েফ, জর্মনির হাইনে, পোলাণ্ডের শপাঁ, এমন কি ইতালীর রস্‌সীনি—এঁরা সকলেই প্যারিসে বসবাস করতেন।

এর পরই ফরাসীতে যাকে বলা হয় ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল্—'শতাব্দীর সূর্যাস্ত'।

দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো খ্যাতি লাভ করেন ঐ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে—কবি, ঔপন্যাসিক নাট্যকাররূপে এবং কর্মযোগী ফিউমের 'রাজা'রূপে তিনি খ্যাতির চূড়ান্তে ওঠেন ১৯১৯এ, অর্থাৎ আমাদের শতাব্দীতে। আরবী ভাষায় এঁদের বলা হয় 'জু অল্ করনেন'—'দুই শতাব্দীর অধিপতি'।

বহু রাগরঙ্গে রঞ্জিত বৈচিত্রপূর্ণ এঁর জীবন। ইস্কুলে থাকাকালীনই তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে রোমে এসে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য তিন ক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি পদাতিক, নৌবাহিনী ও বিমানবহরে সর্বত্রই সমান খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষ করে বিমান চালনায়। আজ যেটাকে স্টান্ট্ ফ্লাইং বলা হয়, তার প্রধান পথপ্রদর্শক দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো। অমর খ্যাতির জন্য তাঁর এমনই অদম্য প্রলোভন ছিল যে, তার জন্য তিনি সর্বদাই প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তারপর মিত্রশক্তি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিউমে বন্দরকে ইতালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে

চাইলেন, তখন কবি দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর রুদ্রতম রূপ ধারণ করলেন। ফিউমে বন্দর দখল করে তিনি সেখানে এক রাজ্য স্থাপনা করে নিজেকে 'অধিপতি'রূপে ঘোষণা করলেন। কবি, সৈনিক, নেতা তিনরূপেই তিনি স্বপ্রকাশ হলেন। মাত্র ১৫ মাস তিনি সেখানে 'রাজত্ব' করেছিলেন বটে, কিন্তু ইতালীর লোক আজও তাঁকে 'ফিউমের বীর', জাতির গর্বরূপে স্বীকার করে।

প্রেমের জগতেও দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো অভূতপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একসঙ্গে পাঁচটি রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে পারতেন। একই সঙ্গে পাঁচ সেট প্রেমপত্র লিখেছেন (কু-লোকে বলে, সেক্রেটারীকে ডিক্‌টেট করতেন) এবং প্রত্যেক সেটই একেবারে অরিজিনল, অন্যান্য সেট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'লে ভের্জীনি দেল্লে রক্কে' 'গিরিকুমারীত্রয়'-এ। সেখানে উপন্যাসের নায়ক কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না, তিন নায়িকা, আনাতোলিয়া, ভিয়োলান্তে, মাস্‌সিমিল্লা, কাকে তিনি বরণ করবেন। এ উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পক্ষে একই সময়ে এই তিনজনকে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ এই তিন বোনের চরিত্র তিনি এমনই অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, দৃঢ় রেখায় অঙ্কন করেছেন যে, প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় স্বপ্রকাশ। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিন ধরনের প্রেমপত্র লেখা চারুশিল্পী দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়োর পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই, খুবই সহজ বলতে হবে।

দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো চরিত্র বুঝতে ভারতবাসীর খুব অসুবিধা হয় না। কিছুদিন পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলুম। আমরা যদি হটেনটট বা বন্টুর মত ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতিহীন জাত হতুম, তা হলে আমাদের অপমানবোধের বেদনা এতখানি নির্মম হত না। ফ্যা ত্ব সিয়েক্‌লে ইতালী স্বাধীন বটে, কিন্তু সে তখন তার গৌরবময় নেতার আসন ছেড়ে দিয়েছে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলণ্ডকে।

এমন কি যে অন্নবস্ত্র সমস্যা তাকে তখনো (এখনো) কাতর করে রেখেছে সেটাকে ঐতিহ্যহীন সুইটজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ততদিনে সমাধান করে ফেলেছে। জাত্যভিমানী স্পর্শকাতর ইতালীয় মাত্রই যখন দেখত প্রতিবৎসর হাজার হাজার ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন তার প্রাচীন কীর্তিকলা দেখবার জন্য রোম নেপল্‌স্ ভেনিস পরিক্রমা করে, গ্যোটে বায়রন কেউই বাদ যান না[১] এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখে ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ আপন ইতালীয় ভ্রাতা এঁদের কাছে ভিক্ষা চাইছে, তখন ঐতিহ্যচেতন ইতালিয়ার মরমে মরাটা হৃদয়ঙ্গম করাটা কি আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন? দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন শুধু তার পূর্ব গৌরব, প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্যই নয়, তাঁর সদাজাগ্রত পঞ্চেন্দ্রিয় অহরহ তাঁকে সচেতন রাখতো দেশের অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে। ভেনিস দেখে বহু দেশের বহু কবি আপন মাতৃভাষায় তার প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়োর উপন্যাস 'ইল্ ফুয়োকো'—'অগ্নিশিখা', 'ফ্লেম অব লাইফে'—তাঁর যে বর্ণনা

---

১ এবং এ যুগে—

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"

রবীন্দ্রনাথ, পূরবী।

পক্ষান্তরে ইতালীয় কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন—

ইতালি, ইতালি! এত রূপ তুমি
কেন ধরেছিলে, হায়!
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে
নিরাশার কালিমায়।

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

(Italia, Italia, o tu cui feo la sorte).

এবং দরদবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সে জিনিস ইতালীয় সাহিত্যে অতুলনীয় তো বটেই, অন্য সাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ—অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

ইয়োরোপে রেনেসাঁস যাঁরা আনয়ন করেন, তাঁদের শেষ প্রতিভূ দ'আন্নুন্‌দ্‌জিয়ো। মাঝখানে কত শত বৎসরের ব্যবধান, তবু তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়—এবং যাঁরা তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাঁরা বলেছেন তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হত—তিনি কি স্বচ্ছন্দে রেনেসাঁস স্বষ্টিকর্তা অতিমানবদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। ওদিকে তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ক্লাসিক্‌সের পরবর্তী পুরুষমাত্র। একটি ফোয়ারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দ'আন্নুন্‌দ্‌জিয়ো সে ফোয়ারার পাথরে খোদাই কতকগুলি লাতিন প্রবাদ তুলে দিয়েছেন। লাতিন অনেকখানি পড়া না থাকলে এরকম একটি অনবদ্য সঙ্কলন অসম্ভব।

কর ত্বরা, ওগো,
তোল ফুলগুলো
ভরা মধু গন্ধে।
পলাতকা ঐ
মুহূর্তগুলির
পরা নীবিবন্ধে॥

PRAECIPITATE MORAS,
VOLUCRES CINGATIS.
UT HORAS NECTITE FORMOSAS, MOLLIA SERTA, ROSAS.

Hasten, hasten! Weave garland of fair roses to girdle the passing hours.

সেই ফোয়ারার জল নিচের আধারে জমেছে; সে বলছে :—

জীবন সলিল
পান করিবে কি?
এ যে বড় মধুভরা—

আঁখিজলে করো
লবণসিক্ত
তবে হবে তৃষা-হরা ॥

FLETE HIC OPTANTES, NIMIS EST ACQUA DULCIS, AMANTES SALSUS, UT APTA VEHAM, TEMPERE HUMOR EAM.

Weep here, ye lovers who come to slake your thirst. Too sweet is the water. Season it with the salt of your tears.

গ্রীক এবং লাতিন থেকে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ভাষার অলঙ্কার। আজ যদি বাঙলাতে কেউ পদে পদে কালিদাস আর শূদ্রকের মত উপমা ব্যবহার করতে পারেন এবং সে তুলনাগুলো এযুগের বাতাবরণেরই—কারণ দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো ক্লাসিক্‌সে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নিঃশ্বাস নিতেন বর্তমান যুগের আবহাওয়া থেকে—তা হলে তাঁর সঙ্গে দা'ন্নুন্‌দ্‌জিয়োর তুলনা করা যাবে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে মধ্যে প্রধানত নীচ্‌শে, শোপেনহাওয়ার, দস্তেয়ফেস্কি এবং সুরকারদের মধ্যে ভাক্‌নার তাঁর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'অতিমানব', 'সুপারম্যান' বা 'য়্যুবারমেনশের' যে ধারণা ফিষটে দিয়ে আরম্ভ হয় এবং কার্লাইল মাদ্‌জীনি হয়ে নীচ্‌শেতে পৌঁছয়—যার সাহায্যকারী ছিলেন ট্রাইশকে, কিপলিং, হাউস্টন চেম্বারলেন এবং বের্গসোঁ—দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো এঁদেরই একজন। এঁরা সকলেই যে সুপারম্যান চেয়েচেন তা নয়, কেউ কেউ চেয়েছেন, সুপাররেস—শ্রেষ্ঠ জাতি, যেমন হিটলার চেয়েছিলেন 'হেরেন-ফল্‌ক্‌' 'প্রভুর জাত'—কেউ কেউ চেয়েছেন সুপারস্টেট।

রাসল্‌ বলেন, 'তবু ফিষটে, কার্লাইল, মাদ্‌জীনিতে মুখের মিষ্টি কথায় কিছুটা নীতির দোহাই আছে, কিন্তু নীচ্‌শেতে এসে

তাও নেই।' ২ সেখানে উলঙ্গ রুদ্ররূপে 'সুপারম্যানে'র আপন শক্তি সঞ্চয়ই সর্বপ্রধান কর্তব্য, 'স্বধর্ম'। হিটলারের গ্যাস চেম্বার তারই এক কদম পরে।

আমার মনে হয়, দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো এসব কট্টরের সমধর্মী নন। তাঁর ভিতরকার আর্টিস্টই বোধহয় তাঁকে সে বর্বরতা, নৃশংসতা থেকে বাঁচিয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে রসিক প্রতি মুহূর্তে পঞ্চভূতকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, যার রচনার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি শব্দে রূপরসগন্ধ-স্পর্শধ্বনির সমাবেশ, তুলনাব্যঞ্জনা মধুরতম সামঞ্জস্য যার অব্রণ-নিটোল সুডৌল নির্মাণ পদ্ধতিতে—সে সৃষ্টিকর্তাকে কোনো বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না।

দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়োর সৃষ্টিতে আমি যদি কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকি, তবে সেটা মাধুর্যের অতিরিক্ততায়—'কাদম্বরীতে' যে-রকম। ৩

---

২ বার্ট্রাণ্ড রাসল্—দি এনসেস্ট্রী অব ফ্যাসিজ্‌ম্।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, 'দেবপ্রিয়, বিধিদত্ত' 'সকলের সেরা জাতের' ধারণা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহুদিরাই সৃষ্টি করে। সে ধারণার দলিলে বাইবেল ভর্তি। খৃষ্ট তার প্রতিবাদ করেন।

৩ প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দ'ান্নুন্‌দ্‌জিয়ো—১২ই মার্চ, ১৮৬৩—১লা মার্চ, ১৯৩৮

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ

গিয়াস উদ্-দীন আবু-ল্ ফৎহ্ ওমর ইব্‌ন্ ইব্রাহীম অল খৈয়াম প্রাচ্যে-পাশ্চাত্ত্যে সুপরিচিত। তাঁকে নিয়ে ইরানের ভিতরে বাইরে সর্বত্র আজও পূর্ণোদ্যমে নানাপ্রকারের গবেষণা চলছে। এবং অত্যধিক গবেষণার মন্থনে যে বিষ ওঠে, তাও দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো জর্মন গবেষক বলেন, 'খৈয়াম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে খৈয়াম কোনো কবিতা রচনা করেননি।' জনৈক রুশ গবেষক বলেন, 'কিন্তু খৈয়ামের ঠিক পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যে এই বাক্যটি পাচ্ছি—"তিনি খুরাসানের কবিদের অন্যতম"—এটার অর্থ কি?' তাই বোধ হয় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত—তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র নয়টি রুবাইয়াৎ১ (চতুষ্পদী) ওমরের বলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন। অথচ পার্টিশনের পূর্বেও কলকাতার তালতলায় যে বটতলা সংস্করণ খৈয়ামের পাওয়া যেত তাতে থাকতো প্রায় বারো শ'টি।২ তবে অতিশয় এক-নজর ফেললেও ধরা পড়ে, এর শত শত রুবাইয়াৎ ইরানের একাধিক কবির কাব্যসঙ্কলনে—বিশেষত হাফিজের—ওঁদেরই নামে চলেচে। কোনো কোনো রুবাঈ (রুবাইয়াতের একবচন) তো পাওয়া যায় দু' তিন চার কিংবা ততোধিক কবির কাব্যে। এক জর্মন পণ্ডিত তাই এক বিরাট নিঘণ্টু (কনকরডেন্স, ক্রস্‌রেফ্‌রেন্স সম্বলিত কার্ড-ইনডেক্স—যা খুশী বলুন)

---

১ তাপসী রাবেয়া নাম এদেশে অজানা নয়। তার অর্থ 'চতুর্থ কন্যা'। 'রুবাইয়াৎ,' 'রাবেয়া' ইত্যাদি শব্দ আরবী 'আরবাৎ' অর্থাৎ 'চার' থেকে এসেছে।

২ ইরানে ১৪০১ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১২০৮ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ৮৮ বৎসর পরে লিখিত এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় ২৫১টি—এটি এখন অক্সফর্ডে।

নির্মাণ করেছেন। খৈয়ামের নামে প্রচলিত প্রত্যেকটি রুবাঈ কোন্ কোন্ কবির কাব্যেও আছে তারই পরিপূর্ণ ফিরিস্তি। টাইমটেবিলের মত কলামের পর কলাম গেঁথে গেঁথে পাতার পর পাতা।

আমাদের মত সাধারণ পাঠক ভীত হয়ে সে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, খুদ খৈয়ামের দেশে ইরানেও আমাদের মত বিস্তর নিরীহ পাঠক আছেন, যাঁরা কোন্ রুবাঈটি খাঁটি আর কোন্টা মেকী তাই নিয়ে কালক্ষেপ করতে চান না।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড যে কটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেছেন তার কতকগুলো ওমরের নয়। তৎসত্ত্বেও ইরানে তাঁরই উপর নির্ভর একটি খৈয়াম সংস্করণ বেরিয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণের আরো বৈশিষ্ট্য আছে।

এদেশে ফরাসী জর্মন শেখার প্রতি অনেকেরই উৎসাহ দেখা দিয়েছে। খৈয়ামের এই ইরানী সংস্করণে আছে ১) ফিটস্‌জেরাল্ডের ইংরিজি অনুবাদ, ২) সেই অনুবাদের যতটা কাছাকাছি পাওয়া যায় তারই ফার্সী মূল (ফিটস্‌জেরাল্ড অনেক সময় ভাবানুবাদ করেছেন বলে বলা কঠিন, ঠিক কোন্ ফার্সী রুবাঈটি অনুবাদ করেছেন, আবার এমনও দেখা যায়, একাধিক রুবাইয়াৎ থেকে তিনি চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়ারট্রেন 'সৃষ্টি' করেছেন), ৩) ফরাসী অনুবাদ —কখনো মূল ফার্সীর অনুবাদ অর্থাৎ ফিটস্‌জেরাল্ডের যে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেন নি, আর কখনো বা ফিটস্‌জেরাল্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জর্মন অনুবাদ—একাধিক জর্মন অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সংকলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জর্মন ফার্সীবিদ্ রোজেন, ফিট্স্‌জেরাল্ড, আরব পণ্ডিত আদীব অলতুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়াম-প্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিটস্‌জেরাল্ডের অবতরণিকা পড়া হয় 'পুরাতত্ত্ব' হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জর্মন কোনো নূতন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন, টিকিট, প্ল্যাটফর্ম, খাদ্যাদি, বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়া—এবং আমরা সচরাচর একটু বয়েস হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা আরম্ভ করি—পায় অল্পই মনের খোরাক। লাগে একঘেয়ে—শিখে যাই গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকেই মন এবং হৃদয়ের খাদ্য দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা শেখার পরই তো মৃন্ময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিদেশে আমি দু'একখানা দেখেছি। এ-স্থলে আমার মূল বক্তব্য এই, আট বছরের বাঙালী ছেলে ফরাসী শিখতে চাইলে তার পাঠ্যপুস্তক হবে এক রকম, আঠারো বছরের কিশোর শিখতে চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জর্মন, অথবা উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তাঁরা এই সঙ্কলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই, ভাষা-শিক্ষার কাজও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ওমরের সবচেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি :—

ফার্সীতে আছে—

গর দস্ত দহদ জ্‌ মগজে গন্দুমে নানী
ওজ্‌ মৈ দোমনী জ্‌ গুসফন্দী রানী
ও আনগে মন ও তো নিশসস্তে দর ওয়রানী
এয়েশী বুদ ওয়া আন ন্‌হদ-ই-হর সুলতানী

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

Pour celui qui possede un morceau de bon pain,
Un gigot de mouton, un grand flacon de vin.
Vivre avec une belle au milieu des ruines,
Vaut mieux que d'un Empire etre le souverain.

Wein, Brot, ein gutes Buch der Lieder :
Liess ich damit selbst unter Truemmern
mich nieder,
Den Menschen fern, bei Dir allein,
Wuerd' ich gluecklicher als ein Koenig sein. ৩

---

৩ বাঙলায় :

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা আর যদি তুমি রাণী,
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ ॥

সত্যেন দত্ত

মূল ফার্সীতে আছে ঃ

হাতে (দস্ত) যদি থাকে
গমের মগজের (মগ্‌জ্‌) রুটি (নান)
দুই মনী (দো মনী) মদ ও
ভেড়ার একখানা ঠ্যাঙ (রান্‌),
তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
সেটা যদি ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণও হয়
(তবুও) আনন্দ (আয়েশ) যা হবে
সে সুলতানের রাজত্বের (হদ্‌) চেয়েও বেশী।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে, ভেড়ার ঠ্যাঙ বাদ পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বড্ড গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে। সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গপুরী। কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রথম ছত্রে আছে, 'বিনীৎ দ্য বাও'—পরে আবার সেটাই 'উইলডারনিস' হয় কি করে? (সত্যেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত 'বিজন' ব্যবহার করেছেন, 'উইলডারনিস' ও 'বনচ্ছায়া' দুই-ই বিজন। কান্তি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছেন)।

ফরাসীটিতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাঙও, তবে মদের পাত্রকে গ্রাঁ (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, 'দু' মনী বাদ পড়েছে এবং ফার্সীতে যেখানে সুদ্ধ 'তুমি' আছে, সেটা

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার সেই বনানী স্বর্গপুর।

কান্তি ঘোষ

ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক।

জর্মনে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch)। তুম্বা বাদ পড়েছে, তবে 'বাও' নেই—আছে ফার্সীর সরল অনুবাদ 'ভগ্নাবশেষ মধ্যে' (Truemmen)।

ইরানী চিত্রকর চতুষ্পদীটি বর্ণে অলঙ্কৃত (ইলাস্‌ট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ভাঙা-চোরার মাঝখানে বিধ্বস্ত প্রাসাদের অবশিষ্ট একটি দেউড়ির কাছে। দূরের পটভূমিতে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে, সপারিষদ সুলতান বসেছেন সিংহাসনে, সম্মুখে গায়িকা—কিন্তু সমস্তটাই যেন কোন প্রেতলোকের আবহাওয়াতে ভাসছে।

চিত্রকর ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের প্রভাবে পড়েছেন—কিঞ্চিৎ। যুবক-যুবতীর সম্মুখে তুম্বার ঠ্যাঙ আছে, মদের পাত্রও আছে, তবে সেটা বিরাট নয়, 'তু মনী' তো নয়ই এবং সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে প্যাঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ফিরিস্তি-মাফিক—তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না। পায়ের কাছে আমাদের খোঁয়াই-ডাঙার বনো ফুল। তেরঙা ছবি, রেজিস্ট্রেশন খারাপ।

আমাদের কৈশোর যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌সজেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। সে রেওয়াজ এযুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী জর্মন অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন। হয়তো বা তারই ফলে আমরা আরেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো।

পুস্তকে পঁচাত্তরটি চতুষ্পদীর জন্য পঁচাত্তরখানা তিনরঙা ছবি তো আছেই, তার উপর এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে

কারুকার্য, আবছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অর্ধসুপ্ত চৈতন্যের স্বল্পপ্রকাশ—কাব্য পড়ে চিত্রকরের প্রতিক্রিয়ারূপ। ছবিগুলি রবি বর্মা স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে ঢের ঢের কাঁচা। একটি ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন—জামাকাপড়, বাড়িঘর, গাছপালা আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয়, তবে সে সামান্য। বিদেশী—বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর—যেরকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিম্ভূত বদখৎ 'হাঁসজারু' তৈরী করেন, তিনি তার থেকে স্বভাবতই মুক্ত। এবং তাঁর ছবিতে যে এক নূতন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে উপক্রমণিকায় লিখছেন :

"At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing, and this could be an ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic). I wish they call them to my attention. I 'll be most grateful"—Akbar Tajvidi.

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[৪]

The Quatrains of Abolfat'h Ghiat-e-Din Ebrahim KHAYYAM of Nishabur. Published by Tahir Iran Co., "Kashani Bros", Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

---

৪ খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম কৃত তাঁর অনুবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

ওঘাটে যেও না বেউলো

আমার 'উল্টা-রথ' তৈরী হচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন। পাকা লোক লাগিয়েছি। খাস মার্কিন। ওরা গ্রেতাগার্বো থেকে আরম্ভ করে জ্যাক্ অব উইনজার—আলকাপোনে থেকে শুরু করে আর্চবিশপ অব নটিংহাম সক্কলেরই কোরা কাপড় ধুয়ে কেচে মলমল করে তুলতে জানে। ওটা বেরলে আর কেউ 'জীবনস্মৃতি' পড়বে না।

ইতিমধ্যে—ইতিমধ্যে কেন—বহুদিন ধরেই আমি বহুলোকের কাছ থেকে বহু পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। প্রেরকদের কেউ কেউ চান, আমি যেন তাবৎ বস্তু পড়ে সেটি মেরামত করে দি। কেউ কেউ অল্পেতেই সন্তুষ্ট। বলেন, আমার মতামত জানাতে। আর কেউ বা সরাসরি শুধান, সার্থক সাহিত্য কি প্রকারে সৃষ্টি করতে হয়?

উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, রিপুকর্ম-মেরামতী করে যদি লেখক গড়া যেত তাহলে এই যে শান্তিনিকেতন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশ বৎসর ঐ সব কর্ম লেখক এবং শিক্ষক উভয়রূপেই করে গেলেন, এখান থেকে বেরিয়েছেন ক'টি সার্থক সাহিত্যিক? আমি তো একমাত্র প্রমথনাথ বিশীর নাম জানি। পক্ষান্তরে শরৎ চাটুয্যে তো কারো কাছ থেকে এক রত্তি সাহায্য পাননি। ওঁর মত সার্থক লেখক ক'জন? উত্তরে সবাই বলবেন, উনি এক্সেপশন—ব্যত্যয়। আমি বলবো, সার্থক সাহিত্যিক হওয়া মানেই ব্যত্যয়।

কিন্তু তৎপূর্বে প্রশ্ন, আপনি সাহিত্যিক হতে চান কেন?

টাকা রোজগার করতে? হয় না। এদেশে হয় না।

অনুসন্ধান করে দেখুন, এই বাঙলা দেশে ক'জন লোক একমাত্র কলমের জোরে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থায় আছেন। অধিকাংশই কোনো না কোনো ধান্দায় নিযুক্ত থেকে মাসের শেষে পাকা মাইনে

পান। লেখার আমদানি ঘুষের মত। কখন আসে কত আসে তার উপর কণামাত্র নির্ভর করা যায় না। ঘুষের টাকা থাকেও না।

অর্থাৎ, কপালজোরে হয়তো মাস তিনেক আপনি প্রায় পাঁচশ' টাকা করে মাসে কামালেন—এর বেশী এদেশে আশা করবেন না—কিন্তু তার উপর নির্ভর করা চলবে না। পাঠকের মতিগতি কোন্‌দিন কোন্‌ দিকে মোড় নেবে তার কোনো স্থিরতা নেই। আপনাকে তবু লিখে যেতে হবে, নূতন বই তৈরী করতে হবে, ঐ দিয়ে যদি ভাঁটার টান ঠেকাতে পারেন। ইতিমধ্যে আপনার পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতার 'মূলধন' নিয়ে লেখার 'ব্যবসা' আরম্ভ করেছিলেন সেটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন কি করে? বয়েস হয়ে গিয়েছে—বন্ধ প্রেমের হাট। লোটাকম্বল নিয়ে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন না—কোমরে বাত।

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস মনে পড়লো—সে বড় মজার। ইয়োরোপে যে কোনও চিত্রকরের বাড়িতে নিত্যি নূতন রমণী মডেল হয়ে আসছে। তারা বিবসনা হয়ে 'পোজ্‌' দেয়। কেউ কিচ্ছু বলে না। ওটা নাকি ওদের দরকার। চিত্রকরদের সবাই যে ভীষ্মদেব, শুকদেব ঠাকুর নন সে-কথাও সবাই জানে। বস্তুত কোনো চিত্রকর যদি একটুখানি শুকদেবীয় হন তবে তাঁর তাবৎ জীবনীকার সেটা চিৎকার করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে দিয়ে আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দেন। বাদবাকিদের কেউ গাল-মন্দ করে না। ঐ যে বললুম, ওটা নাকি ওদের দরকার।

এদেশে গুরুমহারাজদের এ-অধিকার আছে। ভৈরবী, নর্মসখীরূপে এরা গুরুমহারাজদের সাধন-সঙ্গিনী হন। এ প্রথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত।

কিন্তু যদি ইয়োরোপের পাদ্রীসাহেব ভৈরবী ধরেন তবে তাঁকে তিনদিনও সমাজে টিঁকতে হবে না। এদেশের গেরস্তপাড়ায় কোনো আর্টিস্টকে মডেলসহ বাস করতে দেবে না।

আমি কোনো ব্যবস্থার নিন্দা বা প্রশংসা করছিনে। সাহিত্যিক হিসেবে সে অধিকার আমার নেই। এর বিচার করবে সমাজ। সমাজ গুরু চায়, চিত্রকর চায়, সাহিত্যিক চায়। সমাজই স্থির করবে, কার কোন্‌টাতে অধিকার। সমাজ ভুলও করে। সোক্রাতেসকে বিষ, খৃস্টকে ক্রুশ দেয়।

এটা কিছু নূতন কথা নয়। সামান্য একটি আলাদা উদাহরণ দি। বৈজ্ঞানিকদের সাধ্যি নেই জাহাজ জাহাজ টাকা যোগাড় করে এটমবম বানাবার। মার্কিন সমাজের সর্বপ্রধান মুখপাত্র রোজোভেল্ট দেশের টাকা বৈজ্ঞানিকদের পায়ে ঢেলে দিয়ে বললেন, ওটা আমার চাই। বৈজ্ঞানিকরা তৈরী করে দিলেন। ওটা জাপানে ফেলা হবে কি না, সেটা স্থির করলেন ট্রুমান—বৈজ্ঞানিকদের হাতে সে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করার ভার দেওয়া হয়নি। তাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছিল মাত্র। এবং শুনলে আশ্চর্য হবেন, বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

দার্শানকদের বেলাও তাই। কেউ হয়তো প্রামাণিক বই লিখে প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর নেই। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি, সে বই ইস্কুলে ইস্কুলে কলেজে কলেজে পড়ান। সেটা স্থির করবে সমাজ। কিংবা মনে করুন, বুদ্ধদেব বলেছেন, ঈশ্বর নেই। সেটা সিংহল বর্মার ইস্কুলে পড়ানো হয়। এদেশে পড়াতে গেলে সমাজ আপত্তি করবে।

কিংবা এই ফিল্মের কথাই নিন। প্রডুসার ডিরেক্টর দর্শক তো স্থির করেন না, কোন্ ফিল্ম দেখানো চলবে আর কোন্‌টা চলবে না। স্থির করে সমাজ—সেন্সার বোর্ডের মারফতে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক। আপনি কেন সাহিত্যিক হতে চান, সেই কথায় ফিরে যাই।

তা হলে কি আপনি সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে চান?

প্রতিপত্তি হবে না। সে-কথা গোড়া থেকেই বলে রাখি।

আমি সামান্য লেখক। 'দেশে-বিদেশে' বইখানা প্রাইজ পেয়েছে। আমি তাই নিয়ে গর্ব করছিনে, ঈশ্বর আমার সাক্ষী। নিতান্ত এই প্রতিপত্তির কথা উঠলো বলে সে-কথাটা বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমার বন্ধুবান্ধব এবং আপনাদের মত সহৃদয় পাঠক কেউ কেউ বলেন, 'কাবুলে তো ছিলে মাত্র দু'বছর। তবু বইখানা মন্দ হয়নি। জর্মনিতে তো ছিলে অনেক বেশী। সে-দেশ সম্বন্ধে ঐ রকম একখানা বই লেখ না কেন?' আমি ভাবলুম, প্রস্তাবটা খুব মন্দ নয়। মোটামুটি একটা খসড়াও তৈরী করলুম। কিন্তু বিপদ হল হিটলারকে নিয়ে। বিপদ হল ১৯৩৯-৪৫এর যুদ্ধ নিয়ে। আমি ১৯৩৮-এর পর সেখানে আর যাইনি। আর আজ হিটলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাদ দিয়ে জর্মনি সম্বন্ধে লেখা, এ যেন মুরারজী দেশাইকে বাদ দিয়ে চোদ্দ ক্যারেট গোল্ডের কথা লেখা।

তাই মনে করলুম, আরেকবার না হয় হয়েই আসি। কুড়ি বছরের বেশী হতে চললো, বিদেশ যাইনি। হার্টও ট্রবল দিচ্ছে। জর্মন ডাক্তাররা যদি কিছু একটা ভালো ব্যবস্থা করে দেয়। পাবলিশারদের বললুম, কিছু টাকা আগাম দিতে। যাঁদের অনুরোধ করলুম তাঁরা সোল্লাসে টাকা পাঠালেন—এঁরা সজ্জন।

এবারে ফরেন্ একস্‌চেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রার পালা।

উত্তর এল, ফেলেট্ 'নো'—তিন না চার লাইনে, ঠিক মনে নেই।

কোথায় রইল প্রতিপত্তি? কোথায় রইল খ্যাতির মূল্য? আমি যেতে চাইছিলুম নিজের টাকায়—সরকারের টাকায় নয়। বলুন তো, ক'জন বাঙালী লেখক নিজের টাকায় (অবশ্য সেই আগাম টাকা নেওয়ার ফলে নির্ভর করতে হবে আমার চাকরী মাইনের উপর) বিদেশ যেতে পারে? যে পারলো সেও সুযোগ পেল না।

পাঠক ভাববেন না, আমি কর্তৃপক্ষকে দোষ দিচ্ছি। মোটেই না। তাঁরা তো আমার দুশমন নন। তাঁরা যা ন্যায্য মনে করেছেন তাই করেছেন।

আমি বলতে চাই, কোথায় রইল লেখকের প্রতিপত্তি! আমি চেয়েছিলুম, কুল্লে দু হাজার টাকার বিদেশী মুদ্রা। আমার প্রতিপত্তির মূল্য তা হলে দু'হাজার টাকাও নয়। অবশ্য এতে আমার দুঃখিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত। স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তার শিষ্য জুডাস্ ত্রিশটি মুদ্রার বিনিময়ে!

ঈষৎ অবান্তর হলেও বলি, তবু আমি গিয়েছিলুম। জানেন তো, নেড়ের গোঁ। পকেটে ছিল পঞ্চাশ না ষাটটি জর্মন মুদ্রা। সেখানে চললো কি করে? ওঃ! সেখানে আমার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। তবে কি জর্মনরা খুব বাঙলা বই পড়ে? মোটেই না। তবে? আমার প্রতিপত্তি অন্য বাবদে—এবং সেটা এ-স্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর। ধরে নিন, আমি সার্কাসের দড়ির উপর নাচতে পারি—না, সেটা বিশ্বেস হল না, আমার কোমরে বাত বলে?—তা হলে ধরুন, আমি চিত্তনের পঞ্জাকে হত্তনের গোলাম বানাতে পারি।

এই তো গেল প্রতিপত্তির কথা। এবারে খ্যাতি। আমার খ্যাতি অত্যল্প, তাই আমার কথা তুলবো না। আমার ইয়ার পাহাড়ী সান্ন্যালের (ওঃ! বলতে গর্বে বুকটা কি রকম ফুলে উঠছে!) খ্যাতি সম্বন্ধে তো আপনাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে গিয়ে শুধোন, সে কি আরামে আছে। অত্যন্ত গোবেচারী লোক—অন্তত আমার যদ্দূর জানা—দুটি পয়সা কামিয়ে, কোনো ভালো হোটেলে ইয়ার বক্সীসহ একটুখানি মুর্গী-কারি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে—তার পানের ঝাঁপিটি দেখেছেন তো—বাড়ি যাবে। শুধোন গিয়ে তাকে, হোটেলে বসা মাত্রই আকছারই তার কি অবস্থা হয়।

অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, গুষ্টির পিণ্ডি-গ্রাফ কি চায় না লোকে তার কাছ থেকে! গোড়ায় আমি জানতুম না। আমার এক ভাগ্নের জন্য চাইলুম অটোগ্রাফ। সে যা করুণ নয়নে তাকালে—ভাবখানা

'এট্ টু ব্রুটি' !—যে আমার দয়া হল। তাড়াতাড়ি বললুম, না, না থাক।

বেশ কিছুদিন তাকে দেখিনি। তার কারণ অবশ্য, আমার নিবাস মফস্বলে। শহরে গিয়েছি। রেস্ত কম। তাই বসেছি তন্দুরী মুর্গীর হোটেলে একলা-একলি। মুর্গীটা খেয়ে প্রায় শেষ করেছি, এমন সময় গলকম্বল মানমুনিয়া দাড়ি সমেত সম্মুখে দাঁড়ালেন এক মহারাজ। আমার মুখে বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। লোকটাও রাষ্টিক,—হোটেলে এত টেবিল খালি থাকতে আমার সামনের চেয়ারখানায় ধপ করে বসে পড়বে কেন ?

শুধোলে, 'কেমন আছ, ভাই ?'

আরে ! এ যে পাহাড়ী। দাড়ি ফাড়ি নিয়ে এ্যাদ্দিন বাদে খাঁটি পাহাড়ী বনলো। বললুম, 'খুলে কও।'

কাতর কণ্ঠে বললে, 'আর কি উপায়, বলো।'

আমি দরদী গলায় বললুম, 'বড্ড পাওনাদার লেগেছে বুঝি ?'

পাহাড়ী খাসা উর্দু বলে। সেও বলে বেড়ায়, আমি ভালো উর্দু বলতে পারি। এই করে আমরা নিজেদের জন্য বেশ একটা সুনাম কিনে ফিলেছি।

পাহাড়ী বললে, 'তওবা, তওবা। ওয়াস্তাগ্‌ফিরুল্লা। পাওনাদার হলেও না হয় বুঝতুম। আর সে কি আমার নেই ? এন্তের। কিন্তু তারা ভদ্রলোক। খাবার সময় উৎপাত করে না।'

বুঝলুম, মামেলা ঝামেলাময়। বললুম, 'তা তুমি, এক কাজ করো না কেন ? এডমায়ারদের কেউ ধরলে বলো না কেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মিলটা ধরেছেন ঠিকই। তবে আমি পাহাড়ী সান্যাল নই, আমি তার ছোট ভাই, আমার নাম জংগলী সান্যাল।" দাড়িটাই অবশ্য 'জংগলী'র ইন্সপিরিশন জুটিয়েছিল।

ঠাণ্ডী সাঁস লেকর—অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে—পাহাড়ী ফরাসীতে বললে, 'সা ন্ ভা পা, শের—না, ডিয়ার সে হয় না।'

আমি বললুম, 'কেন? তুমি কি আডোনিসের মত খাবসুরৎ।'

তেড়ে বললে, 'কামাল কীয়া, ইয়ার। নামে কি আপত্তি? তা নয়। একবার তাই করেছিলুম। ফল কি হল, শোনো। এই হোটেলেই, হ্যাঁ, এই হোটেলেই এক দিন বসে আছি একলা। এমন সময় কে এক অচেনা লোক এসে শুধালে, "আপনি কি পাহাড়ী সান্ন্যাল?" আমিও তোমারই মত—গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক্—এক গাল হেসে বললুম, "আজ্ঞে, মিলটা ধরেছেন ঠিকই, তবে আমি পাহাড়ী সান্ন্যাল নই, আমি তাঁর ছোট ভাই।" লোকটা খানিকক্ষণ ইতিউতি করে বললে, "কি করি বলুন তো। ম্যানেজারবাবু আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তিন শ' টাকা দিয়ে যেতে। তাঁকে পাই কোথায়?" তারপর আমি তাকে যতই বোঝাই আমিই পাহাড়ী সান্ন্যাল, সে আর মানতে চায় না।'

আমি ভেবে বললুম, 'তা তো বটেই। আমিই সে অবস্থায় মানতুম না।'

সোৎসাহে বললে, 'ইয়েহ্।' তারপর আরো ঠাণ্ডী সাঁস লেকর বললে, 'ভাই, সে টাকাটা আর কখনো পাইনি। ম্যানেজার লোকটি ছিল ভালো। অন্তত আমার টাকাটা শোধ করে লাটে উঠতে চেয়েছিল—আমি কি আর জানি। পরদিন সেখানে গিয়ে দেখি সব ফর্সা।'

হ্যাঁ! একটা কথা বলতে ভুলে গেলুম। আমার মুর্গীর বিলটা পাহাড়ীই দিয়েছিল। কিন্তু এটা বলে কি পাহাড়ীর দুশমনী করলুম না? এ যাবত তো লোকে শুধু অটোগ্রাফ চাইত, এখন যদি—?

আরেকটি কথা। আমাদের এত দোস্তী কেন? সে আমার বই পড়ে না, আমি তার অভিনয় দেখি না। একেবারে খাঁটি হল না কথাটা। আমি 'বড়দিদি' দেখেছি—সে বোধ হয় 'দেশে-বিদেশে'র পাঁচ পাতা পড়েছে।

পাঠক সর্বশেষে অবশ্য শুধোবেন, আমি এত বাখানিয়া আপনাদের সাহিত্যিক হতে বারণ করছি কেন। তার কারণ সোজা। আমার

বিশ্বাস, একমাত্র জিনিয়াসরাই আমার লেখা পড়ে। অর্থাৎ আপনারা। আপনারা বাজারে নামলে আমার রুটি মারা যাবে বলে।

আচ্ছা, আমার কথা ছাড়ুন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র কি বলেছেন,

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥

ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
বাঁদরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে॥

(লেখকের অনুবাদ)

পেটের জন্যই হোক, আর খ্যাতির জন্যই হোক সরস্বতীকে বানরীর মত নাচাবেন না। আপনারা বলবেন, 'এটা তো বড় সিরিয়াস কথা হয়ে গেল।' সে-ই তো চেষ্টা করেছি গত চৌদ্দ বছর ধরে। সিরিয়াস কথা হেসে হেসে বলার।

কিন্তু পারলুম কই? এখন আবার বৃদ্ধ বয়সে ধাতই বা যায় কি করে?

উম্র সারী তো কটী ইশকে বুতাঁ মে, মোমিন!
আখেরী ওয়ক্ত মেঁ ক্যা খাক মুসলমাঁ হোংগে?
'সমস্ত জীবন তো কাটালে মিথ্যা প্রতিমার প্রেমে,
হে মোমিন!
এই শেষ সময়ে আর কি ছাই মুসলমান হব?'

বরঞ্চ লেখা বন্ধ করাই ভালো। উৎসও শুকিয়ে এসেছে।

“ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার
সম্মুখে ঘন আঁধার—”

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনো হতাশ হয়, কখনো বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে ব্যাজার ভাব, এমন সময়ে চ্যারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোঁকটে পাওয়াতে সে বেদনা না-পাত্তা ঘুচে গেল—এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য, সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ মুনিঋষি পীর-প্যাকম্বর বলেন, ‘তোমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতের সন্ধান করো।’ একফোঁটা একটি মেয়েও নাকি বিস্তর ধনদৌলত পাবার পর বলেছিল, ‘যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তাতে আমার কি প্রয়োজন!’

চাকরি বজায় রাখার জন্য আমাকে সমস্ত জীবন ধরে দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের (বেশী না, আল্লার দয়ায় মাত্র সাতটি) বিস্তর বই পড়তে হয়েছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, এই আমরা সাধারণ পাঁচজন তো অমৃত না পেয়েও দিব্য বেঁচে আছি, ওর পিছনে ছুটোছুটি করার আমাদের কী প্রয়োজন! আর বাঙলা কথা বলতে কি, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মত, তখন ঐ অমৃতটা আমাদের ঘাড়ে চাপানোই অন্যায়। অন্তত একটি মহাপুরুষ—আমাদের মতে—এ খাতায় একটি মুক্তো জমা রেখে গেছেন; তিনি বলেছেন, ‘শুয়োরের সামনে মুক্তো ছড়িয়ো না।’ তাই সই। গালাগালটা বরদাস্ত করে নিলুম। আর, মহাপুরুষ এ-কথাটা বলার সময় ক্ষণেকের তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছিলেন তো? —তাতেই হয়ে যাবে। ‘মোক্ষ’ নামক ‘অমৃত’ বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে তবে ঐ একটি চাউনিতেই সকলং হস্ততলং। অবশ্য সে

'অমৃতে'র জন্য কোনো অসম্ভব ভবিষ্যতে যদি আমার প্রাণ আদৌ কাঁদে!

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এঁরা দেখতে মানুষের মত বটেন, কিন্তু আসলে এঁরা মানুষ নন। নইলে বলুন দেখি, তুমি কবি, দু পয়সা তোমার আছে, পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো, কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খাঁই মেটাবার জন্য বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লি, বোম্বাই চষার? কিংবা বিবেকানন্দ। অসাধারণ জিনিয়স। পঁচিশ হতে না হতেই প্রাচীন অর্বাচীন দিশী-বিদিশী সর্বশাস্ত্র নখাগ্রদর্পণে! কী দরকার ছিল সেই সুদূর আমেরিকায় গিয়ে—শেকস্‌পীয়রের ভাষায়—টু টেক আর্মস্ এগেন্‌সট্ এ সী অব ট্রাবল্‌স্?[১] কি দরকার ছিল অরবিন্দের নির্জনে ধ্যানে ধ্যানান্তরে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর লোকে ব্রহ্মের কাছ থেকে অমৃতবারি আহরণ করে নিয়ে, তারো নিয়ে এসে এই ভস্মীভূত ভারতসন্তানকে পুনর্জীবিত করার?

এঁদের কথা বাদ দিলুম। এরা আমাদের মত নন।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু।

এই যে আমরা রামাশামা, আমাদের ভিতর বিবেকরবি নেই, কিন্তু তাই বলে আমাদের সক্কলেরই কি ওঁদের চেয়ে স্পর্শকাতরতা কম? ওঁদের মত কীর্তি আমরা রেখে যাই না, তাই বলে বেদনা-বোধ কি আমাদের সক্কলেরই ওঁদের চেয়ে কম? বরঞ্চ বলবো, বিধিপ্রসাদাৎ, কিংবা আপন সাধন বলে তাঁরা চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনা-বোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু

---

১ ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ নিয়ে তুলনাত্মক আলোচনা হচ্ছে। অন্য কেউ দেখিয়ে না দিয়ে থাকলে আমি একটি মিল দেখাই। দুজনেই প্রথমেই আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারত-সেবার জন্য অর্থ আনতে। দুজনাই নিরাশ হয়েছিলেন।

আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবন্ত অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিবে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব-বাড়ি আধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমরা যে ক'টি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক অতি দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ছিল। ডিগডিগে লম্বা পাতলা, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভারী লাজুক। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর মানা না শুনে পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। সে-গাঁয়ের আর কোনো ছেলে কখনো বাইরে যায়নি। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলেটি কিন্তু তোৎলা। হয়তো সেই কারণেই বেশী লাজুক।

এক মাসও যায়নি। ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছেন ইস্কুল দেখতে। তাকে শুধিয়েছেন কি একটা প্রশ্ন। উত্তরটা সে খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু একে তো তোৎলা, তার-উপর উত্তর জানে বলেই হয়ে গেছে বেজায় নার্ভাস্। 'তোৎ তোৎ' করে আরম্ভ করতে না করতেই ইন্‌স্‌পেক্টর তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটেয়।

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাশ। গাছ থেকে ঝুলছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে, সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল ? অপমানের কালনাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও

ভাবেনি ? কিন্তু, দয়াময়, আমাকে মাফ করো আমি বিচারকের আসনে বসবার কে ?

অতি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের' ঘোষ —বিনা পণে। ছেলেটি গরীব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দুমুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যাণ্ড-বিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনো বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, ছুই ছুপুরই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হ'য়ে এল।' অর্থাৎ শিগ্‌গিরিই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাকে বলতো, 'মাকে নিয়ে আসছি।' গরীব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে ছুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বৎসর পর দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার পূর্বেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না, এখন বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে। পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছন্নের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগরেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোট-বোনের ক্লাসফ্রেণ্ড। আমি তার মুরুব্বী। সিগরেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়! এক গাল হেসে বললে, 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে ?

বোন বললে, 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ

করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায়? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনো তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যে-রকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধবী? আমার বোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না, পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো তেতলার একটি মেয়ের। আমরা যৌবনে যে সুযোগ পেলুম না তা যদি ঐ মেয়েটি পেয়ে থাকে তবে, আহা, ভোগ করুক না সে আনন্দ—তার ইয়ংম্যান প্রায়ই তাকে ফোন করে।

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনো ফোন নেই। ভাবলুম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে —ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সন্ধ্যাবেলা আমার লোকটা বললো, 'ভিরমি কাটতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতো বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনো কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খবরটা কানে এসে পৌঁছল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভালো করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন,

'He walked out on her to another girl!'

কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, ঐ ভিরমি-যাওয়া মেয়েটার উপর পা দিয়ে যেন সেই ছেলেটা পার হয়ে আরেকটা মেয়ের হাত ধরে চলে গেল। Walk on তো তাই মানে হয়। না?

আজ আর মনে নেই কতদিন ধরে মেয়েটা কিছু খেলেই বমি করতো।

দু বছর তাকে দেখিনি। তারপর একদিন সিঁড়িতে দেখা। আগেকার মতই সেই সাজগোজ করেছে। মনে হল চীনে ফানুস দেখছি, কিন্তু প্রদীপটি নিবে গেছে।

ঐ বেদনাই তো সবচেয়ে বড় বেদনা।

মা যখন বাচ্চাকে মারে তখন সে বার বার ঐ মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয়ের জন্য—যেখান থেকে আঘাত আসছে সেখানেই। আশ্চর্য, কিন্তু আশ্চর্য হবার কীই বা আছে, কারণ মারুক আর যাই করুক অজানার মাঝেও অবুঝ জানে সে তার মা-ই। কিন্তু যখন দয়িত walks out on her তখন বেচারী আশ্রয় খুঁজবে কোথায়? সে দয়িত তো এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। এতদিন ধরে তার সামান্যতম বেদনা যখনই কোনো জায়গা থেকে এসেছে—বাপ, মা, সমাজ যেখান থেকেই হোক—তখনই ছুটে গিয়ে বলেছে তার দয়িতকে। ঐ বলা-টুকুতেই পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা। আর আজ? আজ তার সেই শেষ নির্ভর গেল। বরঞ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর বল ছুঁড়লেও সেটা ফিরে আসে। কথা বললেও প্রতিধ্বনি আসে। কিন্তু এখন শূন্যে, মহাশূন্যে সব বিলীন।....(অবশ্য মডার্নরা বলবেন, 'ওসব রোমান্টিক প্রেম আজ আর নেই। আজ একমাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায়।' তাই হোক্, আমি তাই কামনা করি। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর)।

ধর্মের সমুখে উপস্থিত হলুম এই তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে।

কেউ বলেন, 'এসব মায়া। তুমিও নেই, আমিও নেই, এই পৃথিবীও নেই, তদপি কেন শোকাতুর হও।' কেউ বলেন, 'লীলা। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো। সান্ত্বনা পাবে।' কেউ বলেন, 'মনই সর্ব-দুঃখের উৎপত্তিস্থল। সেই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করো। তাতেই শান্তি।' আরো অনেক মত আছে।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মা-ঠাকুমারা এসবে বিশ্বাস করতেন, কিংবা আরো ভাল হয় যদি বলি, ধর্ম তখন সজীব ছিল, সে তখন সে-বিশ্বাস জাগাতে পারতো—তাই তাঁরা শান্তি পেয়েছেন।

ধর্ম কেন আমার সেই ভাগ্নেকে চিত্তবল দিল না আত্মহত্যা না করার জন্য, প্রেসের পাগলকে রুকলো না সেই দারুণ দুর্দৈব থেকে, প্রতিবেশীর মেয়েকে দিল না শক্তি সইবার—ফের স্বাভাবিক সুস্থ সবল হওয়ার? শুধু তাদেরই দোষ? ধর্মের আত্মশক্তি কমে যায় নি কি? কিংবা দোষ উভয়ের?

কম্যুনিজম তাই বুঝি। সে বলে রাষ্ট্রই সব। তোমার ব্যক্তিগত শোক কিছুই না। তুমি বেশী গম ফলাও, বেশী কামান বানাও রাষ্ট্ররক্ষার জন্য। সব ভুলে যাবে। কম্যুনিষ্টরা এ 'ধর্মে' বিশ্বাস করেন কি না, তা জানিনে কিন্তু এ-কথা জানি, রাষ্ট্র এ বিশ্বাস তাদের হৃদয় মনে দৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অন্য ধর্মেরা করে?

* * * *

আমরা কয়েকজন মিলে চা খাচ্ছিলুম। নানা রকম দুঃখ সুখের কথা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সী বড্ডই স্পর্শকাতর ডাক্তার। হঠাৎ বললে, 'জানেন, আলী সাহেব, আমাদের হাস-পাতালে একটি চার বছরের ছেলে বড্ড ভুগে খানিকটা সেরে, বাড়ি গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে। ও সারবে না।

আমি যখন ইনজেকশন তৈরী করছিলুম তখন আমার গা ঘেঁষে যেন করুণা জাগাবার জন্য বললে, “দাক্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে।”

হে ধর্মরাজগণ, এ শিশুকে কি দিয়ে কে বোঝাবে ?

দুপুর রাতে যখন তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, ইনজেক্‌শনের ভয়ে শিউরে উঠে—চেয়ে দেখে, এই বিশাল পুরীতে কেউ নেই, তার কেউ নেই—তখন ?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সারিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো বা তাকে কোনো প্রদোষ নিদ্রায় (আমি এসব জিনিস জানি না, তবে Twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরো উন্নতি করবে) ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, পুতুলটি বুকে চেপে ঘুমিয়ে আছে, নন্দনকাননের অপ্সরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের !

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনো comprehensive philosophy নেই যা ভাগ্নেকে রুকবে, প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে, তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন আত্মশক্তি দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি, আমার জীবনে সেদিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নির্জন প্রান্তরে এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থেকে থেকে ‘নিশির ডাকে’র মত শুনতে পাবো, ‘দাক্তার, দিয়ো না, বদ্দো লাগে—’, দেখতে পাবো সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস॥

———

